ম্যাকসিম গর্কী

গল্প সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

গল্প সংগ্রহ

প্রখ্যাত রুশ ভাস্কর আই শাদ্‌র্‌-এর ম্যাকসিম গর্কীর প্রস্তর মূর্তির প্রতিরূপ অবলম্বনে শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী প্রচ্ছদপট এঁকেছেন।

ম্যাক্সিম গর্কী

গল্প সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

সূচীপত্র

'গল্প সংগ্রহ'-এর প্রথম খণ্ডে গর্কীর যেসব লেখার অনুবাদ প্রকাশিত হ'ল, তার সময়কাল এবং যতটুকু জানা যায়, তার পরিপ্রেক্ষিত এইখানে দেওয়া হ'ল।

গর্কী-সাহিত্যের, বিশেষ ক'রে, রুশ ছোট গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে গর্কীর ছোট গল্পের একটি সাহিত্যালোচনা শেষ খণ্ডে জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছা রইল।

ম্যাকসিম গর্কীর 'গল্প-সংগ্রহ'-এর প্রথম খণ্ড সুরু হয়েছে 'ঝড়ের পাখীর গান' দিয়ে, তারপর 'কমরেড' এবং '৯ই জানুয়ারী'।

'ঝড়ের পাখীর গান' ম্যাকসিম গর্কী লিখেছিলেন ১৯০১ সনে। সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে তখন তিনি এসেছিলেন। একদিন রাস্তায় তিনি দেখলেন এক বিপ্লবী ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশের নৃশংস বর্বর আক্রমণ। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রত্যুত্তরে তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত 'ঝড়ের পাখীর গান।' লিখলেন : 'ঝড়, ঝড় আগতপ্রায় !' আহ্বান জানালেন : 'আসুক ঝঞ্ঝা, সমস্ত ভীষণতা নিয়ে নেমে আসুক প্রমত্ত প্রভঞ্জন !' ঝড়ের পাখীর সেই চারণ গানের উদাত্ত আহ্বান শুনে হৃৎকম্প সুরু হয় যাদের তারা ছোটে প্রতিক্রিয়ার কালোসমুদ্রের বুকে মুখ লুকিয়ে বাঁচতে, সমাজের বোকা পেঙ্গুইনরা লুকোয় পাহাড়ের কোণা-ঘুপচিতে ; কিন্তু সে-অগ্নিক্ষরা আহ্বানে সাড়া দেয় যারা তারা সমস্ত প্রতিক্রিয়ার কালো সমুদ্রকে ঘিরে ফেলে বজ্রের অট্টহাস্যে বিদ্যুৎ-এর শল্য ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসে। ঝড়ের পাখীর আবাহন, বিপ্লবের চারণ ম্যাকসিম গর্কীর আবাহন সেই প্রমত্ত প্রভঞ্জন-কেই। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই এই গীতি-কাব্যের আহ্বান সমগ্র রুশ দেশের বুকে আলোড়ন জাগায়। আর প্রতিক্রিয়াও নিশ্চুপ হ'য়ে বসে থাকে না, সুরু করে আক্রমণ। বিপ্লবী চারণ গর্কী বন্দী হলেন। তাঁর মুক্তির দাবী উঠল রুশদেশের সর্বস্থানে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক-সম্রাট বৃদ্ধ লিও টলষ্টয়, চেকভ, কোরোলেংকো অগ্রণী

হলেন সেই মুক্তি-আন্দোলনের। জার সরকার গর্কীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হ'ল, কিন্তু তিনি নির্বাসিত হলেন। ক্ষুব্ধ লেনিন 'য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের' এই বিনা বিচারে নির্বাসনের প্রতিবাদ জানালেন। রুশ একাডেমীর নির্বাচিত সভ্য ছিলেন গর্কী, সরকারী আদেশে সে-সভ্য পদও তাঁর খারিজ হয়ে গেল।

'ঝড়ের পাখীর গান'-এ যে 'প্রমত্ত প্রভঞ্জনের' প্রতি আহ্বান ছিল, তা সত্যি সত্যিই সুরু হ'ল ১৯০৫-এর ৯-ই জানুয়ারী। ১৯০৫-এর বিক্ষুব্ধ রুশ দেশ। রুশ বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে তখনও রুশদেশের সমস্ত শ্রমিক এসে দাঁড়ায় নি। বিক্ষুব্ধ কিন্তু অসংগঠিত জনতাকে আগেই আঘাত করার জন্য ষড়যন্ত্র ফাঁদল প্রতিক্রিয়া শক্তি। পূর্বকল্পিত চক্রান্ত অনুযায়ী পুলিশের গুপ্তচর পাদ্রী গাপন সুরু করল তার কাজ। তার প্ররোচনায় প'ড়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকরা এক বিরাট মিছিল বের করল। তাদের হাতে ছিল দুঃখদুর্দশার প্রতিকার চেয়ে 'মহামতি' জারের কাছে লেখা আবেদন-পত্র। সেই মিছিলের মধ্যে শ্রমিকদের পাশে সেদিন গর্কীও ছিলেন। সেণ্টপিটার্সবার্গের রাজপথে যা ঘটল তাকে সুপরিকল্পিত নরহত্যা ব'লে আখ্যা দিয়ে গর্কী প্রকাশ্য সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে আবেদন পাঠালেন। ১১ই জুন গর্কী বন্দী হলেন। এবারে শুধু রুশ দেশ নয়, সারা য়ুরোপ থেকে তাঁর গ্রেফতারের প্রতিবাদ এল। জার সরকার তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। গর্কী মস্কোয় বসে বিপ্লবের কাজে মনোনিবেশ করলেন। গ্রেফতারী পরোয়ানা বের হ'ল তাঁর নামে। বন্ধুদের পরামর্শে গর্কী দেশ ছেড়ে বিদেশে রওনা হলেন। এই সময় লেনিনের সঙ্গে তাঁর গভীর হৃদ্যতা জমে ওঠে। লেনিনের পরামর্শানুযায়ী গর্কী লিখলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মা' এবং বিপ্লবের প্রথম দিনের রিপোর্ট '৯ই জানুয়ারী'। এ দুটোর রচনাকাল ১৯০৭।

'৯-ই জানুয়ারী' বিপ্লবের একদিনের রিপোর্ট এবং 'ঝড়ের পাখীর গান' বিপ্লবের প্রতি আবাহন। আর এরই মধ্যে আছে 'কমরেড'—'সাথী', একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাঁরা লড়াই করেন তাঁরা। 'কমরেড' লিখেছিলেন গর্কী ১৮৯৭ সনে।

য়ুরোপের কয়েকটি দেশ ঘুরে গর্কী এলেন নিউইয়র্কে। বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিয়ে এবং পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে বিশ্বের জনসাধারণের কাছে তিনি আবেদন জানালেন রুশ দেশের শ্রমিকদের পক্ষ হয়ে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের ব্যাঙ্কারদের পৃষ্ঠপোষকতায় রুশদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করবার জন্য জারের যে আক্রমণ চলছিল, গর্কী সেইসব প্রকাশ ক'রে দিয়ে দাবী জানালেন এই পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করতে।

এই সময়ে ধনতান্ত্রিক সমাজকে নগ্নভাবে দেখিয়ে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী থেকে যেসব বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্য থেকে এই সংগ্রহে নেওয়া হয়েছে তিনটি: 'রাজাধিরাজ দর্শন', 'আর একজন রাজার সঙ্গে' এবং 'জীবনের অধিদেবতারা।' এগুলোর রচনাকাল ১৯০৬।

গর্কীর বিখ্যাত গল্প 'চেলকাশ'-এর রচনাকাল ১৮৯৫। 'একটি শরৎ-সন্ধ্যা'-র রচনাকাল আমাদের ঠিক জানা নেই। কেউ জানালে পরবর্তী সংস্করণে যোগ ক'রে দেওয়া হবে। 'নবজাতক' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সনে।

'মাকার চুদ্রা' গর্কীর প্রথম গল্প। তিফলিসের 'কাভকাজ' সংবাদপত্রে এই গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সনে।

'গল্প-সংগ্রহ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে যে সব গল্প প্রকাশিত হবে সেগুলো হল: মালভা, ছাব্বিশ জন পুরুষ ও একজন মেয়ে, ইতালীর গল্প, মোর্দভিনিয়ার মেয়ে, উপন্যাসের গল্প, কেইন ও আরিস্তিয়ম, বুড়ী ইজেরগিল, রেড ভাস্কা।

তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদের কাজ চলেছে।

—সম্পাদক

ঝড়ের পাখীর গান

দিগন্ত বিসারী রূপালি সমুদ্র, তারই ওপর জড়ো হচ্ছে ঝ'ড়ো মেঘ··· আর এই দু'য়ের মাঝখানে পাক মেরে মেরে উড়ছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঝড়ের পাখী—যেন বিদ্যুতের কালো ঝলকানি···

এই তার পাখায় সমুদ্রের ঢেউয়ের ছোঁয়া লাগে, এই তীরবেগে সে ওপরে ওঠে, মেঘের বুক বিদীর্ণ ক'রে সে চিৎকার দিয়ে ডাক দেয়···

সে-ভয়শূন্য ডাকে মেঘেরা শুনতে পায় আনন্দের গীতি।

সে-ডাকে গর্জিয়ে ওঠে ঝড়ের প্রতি আবাহন! সে-আবাহনে ফুলে ফুঁসে ওঠে অগ্নিক্ষরা আবেগ ও দুর্জয় ক্রোধ, নিশ্চিত বিজয়ের স্থির-বিশ্বাস উপচে ওঠে সে-ডাকে।

আর,

গাঙচিলেরা গোঙায় ভয়ে, পাখা ঝাপটিয়ে ছোটে সমুদ্রের বিস্তৃতির ওপর দিয়ে···মসীকৃষ্ণ সমুদ্রের গভীরে লুকিয়ে রাখতে চায় তাদের সমস্ত ভয় শঙ্কা।

গোঙায় ডাহুকও···

এদের জন্য সংগ্রামের অনামী উল্লাস নয়। সংঘাতের বজ্রনিনাদে এরা থর থর কাঁপে।

বোকা পেঙ্গুইনও সভয়ে লুকোয় পাহাড়ের কোণা-ঘুপচিতে···

শুধু ঝড়ের পাখী দৃপ্ত ভঙ্গিতে পাক মেরে মেরে উড়ে চলেছে সমুদ্রের উত্তাল রজত ঊর্মির চূড়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে···!

ঘনঘোর ঝ'ড়ো মেঘ নিচে নামে, আরও নিচে, সমুদ্রের ওপরে···আর গীতি-মুখর উত্তাল ঊর্মিমালা ফুলে ফুঁসে উঠে ধেয়ে যায় বজ্রের দিকে।

বজ্র পড়ে। হিংস্র সংঘাতে আছড়ে পড়ে জলরাশি বাতাসের গায়ে···। দুরন্ত ক্রোধে বাতাস দৃঢ় আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধ'রে ছুঁড়ে দেয় মরকত মণির রঙের সেই জলরাশিকে পাহাড়ের চূড়ায়, চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ে তারা সহস্র কণায়···

কৃষ্ণকালো নীলাঞ্জনার ঝিলিকের মত পাক মেরে মেরে উড়ছে ঝড়ের পাখী, ডাকছে, ঝ'ড়ো মেঘকে বিদীর্ণ ক'রে তীরের মত ছুটে চলেছে, জলের তোড় কেটে সে ছুটছে।

সে ছুটছে দৈত্যের মত, কৃষ্ণকালো ঝঞ্ঝা-দানবের মত—এই হাসছে, এই কাঁদছে। ঝ'ড়ো মেঘের প্রতি তার অট্টহাসি, তার নিজের উল্লাসের প্রতি গুমরনো কান্না।

বজ্র-নির্ঘোষের মধ্যে শুনতে পায় বিজ্ঞ ঝঞ্ঝা-দানব অবসাদের চাপা গোঙানি। বুঝতে পারে, নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারে, মেঘেরা পারবে না সূর্যকে বিলুপ্ত করতে ; পারবে না, পারবে না কখনো ঝ'ড়ো মেঘ সূর্যকে মুছে ফেলতে···

সমুদ্র গর্জিয়ে ওঠে···বজ্র ভেঙ্গে পড়ে···

আদিগন্ত নীলাম্বুর বিস্তৃতির ওপরে, ঝ'ড়ো মেঘের বুক চিরে কৃষ্ণনীল বিদ্যুত জ্বলে ওঠে। বিদ্যুতের প্রজ্বলিত তীর ধ'রে ফেলে নিবিয়ে দেয় সমুদ্র, কিন্তু তার সর্পিল প্রতিচ্ছবি যন্ত্রণায় পাক খেতে খেতে ডুবে যায় সমুদ্রের অতল গভীরে···

ঝড়! ঝড় আগতপ্রায়!

তবুও নির্ভীক ঝড়ের পাখী সদর্পে উড়ে চলে বিদ্যুত ঝলকানির ফাঁকে ফাঁকে, ফুঁসে-ওঠা সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের ওপর দিয়ে, জয়োল্লাসের প্রতিধ্বনি ওঠে তার ডাকে, অনাগত বিজয়ের আবাহনী—

আসুক ঝড়, আসুক ঝঞ্ঝা, সমস্ত ভীষণতা নিয়ে নেমে আসুক প্রমত্ত প্রভঞ্জন!

[অনুবাদ : লীলা মিত্র

কমরেড

॥ ১ ॥

এই শহরটায় সবই অদ্ভুত আর দুর্বোধ্য। গির্জাগুলো তুলে ধরেছে তাদের রং-বেরঙের গম্বুজগুলো আকাশের দিকে, কিন্তু ঘণ্টা বাজাবার বুরুজগুলোকে ছাড়িয়ে উঠেছে কারখানার দেওয়াল আর চিম্‌নি, গির্জাগুলো চাপা পড়ে গেছে গুরুগম্ভীর চেহারার ব্যবসা-বাড়িগুলোর পেছনে, তলিয়ে গেছে পাথরের দেওয়ালের প্রাণহীন গোলকধাঁধায়—স্তূপীকৃত ধুলো আর ভাঙাচোরা জিনিসের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া রূপকথার ফুলের মতো। আর যখন গির্জার ঘণ্টাগুলো প্রার্থনার আহ্বান জানায়, তখন তাদের খ্যান্‌খেনে আওয়াজ আছাড় খেয়ে পড়ে লোহার ছাদে ছাদে, হারিয়ে যায় বাড়িগুলোর ফাঁকে সংকীর্ণ গলিপথে।

বাড়িগুলো বিরাট আর প্রায়ই দেখতে সুন্দর, কিন্তু মানুষগুলো সব কুৎসিত আর অমানুষ; সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শহরের আঁকাবাঁকা সরু রাস্তায় এরা নেংটি-ইঁদুরের মতো হুড়োহুড়ি করে, লোভার্ত চোখে তাকিয়ে ফেরে কেউ বা খাবারের খোঁজে, কেউ-বা আমোদের সন্ধানে। আরও কেউ কেউ চৌমাথায় দাঁড়িয়ে শত্রুতা-ভরা সতর্ক দৃষ্টি জাগিয়ে রাখে দুর্বলের ওপর—যাতে তারা সবলের কাছে বিনম্র বশ্যতা মেনে চলে। ধনীরাই শক্তিমান এবং সকলেরই বিশ্বাস—একমাত্র টাকাই মানুষকে ক্ষমতা আর স্বাধীনতা দিতে পারে। প্রত্যেকেই ক্ষমতা কামনা করে, কারণ প্রত্যেকেই ক্রীতদাস, ধনীদের বিলাস-ব্যসন গরীবের মনে জাগায় ঈর্ষা আর ঘৃণা, প্রত্যেকের কাছেই—সোনার ঝন্‌ঝনানির চেয়ে মিষ্টি গান আর কিছু নেই, আর তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শত্রু আর সকলেই নৃশংসতার শাসনে শাসিত।

মাঝে মাঝে উজ্জ্বল সূর্য জাগে শহরের ওপর, কিন্তু জীবন সেখানে সব সময় অন্ধকার আর মানুষগুলো যেন ছায়া। রাত্রিতে জলে ওঠে অগণ্য উজ্জ্বল আলো, আর তখন ক্ষুধার্ত মেয়েরা রাস্তায় এসে দাঁড়ায় অর্থের বিনিময়ে তাদের সোহাগ

বিকিয়ে দেবার জন্যে, বিচিত্র সুস্বাদু আহার্যের সুগন্ধ এসে নাকে ঢোকে আর চারিদিকে জ্বলজ্বল্ করতে থাকে অনাহারী মানুষগুলোর নিঃশব্দ ঘৃণায় ভরা ক্ষুধার্ত চোখগুলি, আর শহরের বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে নিদারুণ দুঃখভরা এক চাপা কান্নার ক্ষীণ রেশ—যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠার মতো শক্তিটুকুও যে-কান্নার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই।

উদ্বেগে ভরা রুদ্ধশ্বাস জীবন, সকলেই পরস্পরের শত্রু, সকলেই ভ্রান্ত, মাত্র কয়েকজন যারা নিজেদের ন্যায়পরায়ণ বলে ভাবে তারা জানোয়ারের মতো স্থূল, অন্যদের চেয়েও নিষ্ঠুর।…

প্রত্যেকই বাঁচতে চায়—কিন্তু জানে না কি ভাবে বাঁচতে হয়. নিজের কামনার পথে স্বাধীনভাবে চলতে পারে না কেউ, ভবিষ্যতের দিকে চলতে গিয়ে প্রতিপদক্ষেপে দৃষ্টি আপনা থেকেই পেছনে ফিরে আসে বর্তমানের দিকে—যে-বর্তমান লোলুপ দৈত্যের মতো নির্মম ক্ষমতার হাত বাড়িয়ে মানুষকে থামিয়ে দিয়েছে তার গতিপথে, আঁকড়ে ধরেছে তার ক্লেদাক্ত আলিঙ্গনের মধ্যে। জীবনের এই কুৎসিত মুখ-ভেঙ্‌চানির দিকে তাকিয়ে মানুষ যন্ত্রণায় আর বিহ্বলতায় দাঁড়িয়ে থাকে অসহায়ের মতো। জীবন নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে তার অন্তরের দিকে হাজার হাজার বিষণ্ণ অসহায় চোখ মেলে, অনুনয় জানায় নির্বাক ভাষায় যেখানে তার হৃদয়ের মধ্যে মরে মরে যাচ্ছে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবিগুলি আর মানুষের অসার্থকতার গোঙানি চাপা পড়ে যাচ্ছে জীবনের জাঁতিকলে নিষ্পেষিত অসহায় হতভাগ্য জনতার এলোমেলো গোঙানির ঐকতানে।

সর্বদাই বিষণ্ণতা আর উৎকণ্ঠা, মাঝে মাঝে আতঙ্ক, আর তারই মধ্যে অন্ধকার নিরানন্দ এই শহরের অচলায়তন দাঁড়িয়ে আছে তার মন্দির-আড়াল-করা অসহ্য রকম জ্যামিতিক ধাঁচে গড়া পাথরের স্তূপ নিয়ে, বন্দীশালার মতো ঘিরে রেখেছে মানুষকে, প্রতিহত করছে সূর্যের আলো।

জীবনের গান এখানে এক রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণা আর আক্রোশে ভরা আর্তনাদ, অবদমিত ঘৃণার অস্ফুট সাপের শিস, নিষ্ঠুরতার উৎকট গর্জন, বীভৎসতার স্নায়ুভেদী চিৎকার…

॥ ২ ॥

দুঃখ আর দুর্দশার এই বিষণ্ণ একটানা ক্লেশের মধ্যে, লোভ আর অভাবের এই দমবন্ধ হাতড়ানির মধ্যে, করুণ আত্মাভিমানের এই আবিলতার মধ্যে দু-চারজন নিঃসঙ্গ স্বপ্নদ্রষ্টা সকলের অলক্ষ্যে রয়েছে নিচের তলায় যেখানে থাকে গরীবরা—যারা সৃষ্টি করেছে শহরের এই ঐশ্বর্য ; লোকের এদের অবজ্ঞা করে, বিদ্রূপ করে, কিন্তু তবু মানুষের প্রতি অবিচল বিশ্বাস নিয়ে এরা বিদ্রোহের বাণী শোনায়—সত্যের সুদূর অগ্নিশিখার এরা বিদ্রোহী স্ফুলিঙ্গ। নিচু তলার কুঠুরিগুলোয় তারা গোপনে নিয়ে আসে সহজ অথচ মহৎ এক বাণীর ক্ষুদ্র অঙ্কুর যা একদিন ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আর, কখনও ঠাণ্ডা জল্‌জলে চাউনি ভরা চোখে দৃঢ় হাতে, কখনও বা স্নিগ্ধ স্নেহের সঙ্গে তারা এই দীপ্ত অগ্নিময় সত্যের বীজ বুনে দেয় সেই বিকিয়ে-যাওয়া মানুষগুলির ভারী বুকে—বর্বর আর অতিলোভীদের কামনার প্রচণ্ডতায় যে-মানুষগুলি ধনসঞ্চয়ের অন্ধ আর মূক যন্ত্রে পরিণত।

আর, এই সংকুচিত অবহেলিত মানুষগুলি অবিশ্বাসের সঙ্গে এই নতুন ভাষার সুর শোনে—যে-সুর শোনার জন্যে এতদিন ধরে অস্পষ্ট কামনা জেগেছে তাদের শ্রান্ত মনে, শুনতে শুনতে তারা ধীরে ধীরে মাথা তোলে, ক্ষমতামত্ত লোলুপ অত্যাচারীরা যার মধ্যে তাদের এতকাল বেঁধে রেখেছিল সেই ধূর্ত মিথ্যার জাল ছিঁড়ে নিজেদের তারা মুক্ত করে নেয়।

তারপর, ভোঁতা চাপা অসন্তোষে ভরা তাদের জীবনে, অজস্র অন্যায়ে বিষাক্ত তাদের হৃদয়ে, শক্তিমানদের গালভরা যুক্তিতে বুদ্ধিভ্রষ্ট তাদের মনে—অপমানের তিক্ততায় পরিপূর্ণ এই গ্লানিময় অসহনীয় অস্তিত্বের মাঝে—এসে পড়ল একটি সহজ দীপ্তিময় কথা :

'কমরেড !'

কথাটা তাদের কাছে নতুন নয়, আগেও তারা কথাটা শুনেছে, বলেছে :

কিন্তু এর আগে পর্যন্ত আর-পাঁচটা অতি-পরিচিত অতি-ব্যবহৃত কথার মতোই এটাও ছিল একটা ফাঁকা মামুলি শব্দমাত্র যা ভুলে গেলেও কোন ক্ষতি নেই।

কিন্তু এখন থেকে কথাটায় বেজে উঠল এক নতুন সংগীত—বলিষ্ঠ আর সুস্পষ্ট নতুন অর্থে ভরা এক গান—মরকত মণির মতো কঠিন, উজ্জ্বল আর বহুমুখী।

তারা এই গানকে তুলে নিল তাদের কণ্ঠে, কথাটিকে উচ্চারণ করল সাবধানে, ধীরে ধীরে, শিশুকে দোলনায় দোল-দেওয়া মায়ের মতো লালন করল অন্তরের মধ্যে সযত্নে আর সস্নেহে।

আর, কথাটির অন্তরের দীপ্তির গভীরে তারা যতই প্রবেশ করল, কথাটা ততই তাদের কাছে মনে হতে লাগল উজ্জ্বল আর মধুর।

'কমরেড !'—তারা বলল।

আর বলতে বলতে অনুভব করল, সারা জগতকে মেলাবে এই কথা, মুক্তির চূড়ায় নিয়ে যাবে সমস্ত মানুষকে আর নতুন এক মিতালীর বাঁধনে বাঁধবে তাদের—পরস্পরের প্রতি সম্মানের, মানুষের মুক্তির প্রতি শ্রদ্ধার দৃঢ় বন্ধন।

ক্রমশঃ যখন সেই বাঁধাপড়া মানুষগুলির মনে মনে এই কথাটি শিকড় গাড়ল, তখন তারা আর ক্রীতদাস রইল না, আর তারপর একদিন সেই উত্তুঙ্গ নগরীর সমস্ত শক্তিমত্তার মুখোমুখি তারা ঘোষণা জানাল :

'আর নয় !'

তারপর জীবন দাঁড়িয়ে পড়ল গতিরুদ্ধ হয়ে—কারণ তারাই হচ্ছে সেই শক্তি বা জীবনকে গতি দেয়, একমাত্র তারাই, আর কেউ নয়। জলধারা গেল বন্ধ হয়ে, আগুন গেল নিভে, আঁধারে ডুবে গেল সমস্ত শহর আর ক্ষমতার অধিকারীরা হয়ে পড়ল শিশুর মতো অসহায়।

আতঙ্কে ভরে গেল অত্যাচারীর মন, নিজেদেরই পরিত্যক্ত মলমূত্রের দুর্গন্ধে দমবন্ধ হয়ে তারা বিদ্রোহীদের শক্তি দেখে বিস্ময়ে আর ভয়ে তাদের ঘৃণা গেল চেপে।

ক্ষুধার অপচ্ছায়া তাদের তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল, তাদের সন্তানরা করুণ আর্তনাদ তুলল অন্ধকারের মধ্যে। বাড়ি আর গির্জাগুলো বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন

হয়ে পাথর আর লোহার এক প্রাণহীন বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবে গেল ; পথ-ঘাট এক অশুভ নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃত্যুর কবলে এলিয়ে পড়ল ; জীবনের গতি গেল বন্ধ হয়ে—কারণ, যে-শক্তি তাদের সৃষ্টি করেছিল সে নিজেকে চিনতে পেরেছে, শেকলে বাঁধা মানুষ তার ইচ্ছাকে প্রকাশ করার সেই দুর্বার যাদুমন্ত্রটি খুঁজে পেয়েছে, অত্যাচার থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নিজের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছে—যে-শক্তি স্রষ্টার শক্তি।

এতোদিন যারা নিজেদের জীবনের অধীশ্বর বলে বিশ্বাস করে এসেছে, এবার সেই ক্ষমতাবানদের দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল ; অন্ধকার এতো জমাট, মরা শহরে যে-দু-একটা স্তিমিত আলো জ্বলছে তার কাঁপন-ধরা শিখা এতো করুণ আর ত্রস্ত, যে একটা রাত্রিকে মনে হয় যেন হাজার রাত্রির সমন্বয় ; আর, হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে তোলা সেই মানুষের রক্তচোষা নগর-দৈত্য তার সমস্ত বীভৎস কুশ্রীতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ইঁট-কাঠের এক করুণ স্তূপ হয়ে। ঘর-বাড়ির দৃষ্টিহীন জানালাগুলো ক্ষুধার্ত আর বিষণ্ণভাবে চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে যেখানে জীবনের সত্যিকার প্রভুরা এক নতুন বলে বলীয়ান হ'য়ে চলা ফেরা করে। ওরাও ক্ষুধার্ত, অন্যদের চেয়ে ওরা বাস্তবিক বেশী ক্ষুধার্ত, কিন্তু ক্ষুধার অনুভূতিটা ওদের পরিচিত, ওদের দৈহিক কষ্ট 'জীবনের অধীশ্বর'দের কষ্টের মতো অতো তীব্র নয়, ওদের অন্তরে যে আলো জ্বলছে তার উজ্জ্বলতা কমিয়ে দিতেও তা পারে না। আপন শক্তির চেতনায় ওরা প্রজ্বলিত, আগামী জয়ের প্রতিশ্রুতি ওদের চোখে উজ্জ্বল।

ওদের এতোদিনকার সংকীর্ণ আর নিরানন্দ বন্দীশালা সেই শহরের পথে পথে ওরা ঘুরে বেড়াল—যেখানে ওরা পেয়ে এসেছে শুধু অপমান আর উপহাস, যেখানে ওদের বুকের উপর পুঞ্জীভূত হয়েছে আঘাত। তারপর ওরা উপলব্ধি করেছে ওদের শ্রমের মহান সার্থকতা আর সেই উপলব্ধি থেকেই ওরা সচেতন হ'য়ে উঠেছে ওদের জীবনের প্রভু হবার পবিত্র অধিকার সম্বন্ধে—ওরাই তৈরি করবে জীবনের কানুন, সৃষ্টি করবে জীবন। আর তারপর এক নতুন বেগ নিয়ে সেই জীবন-জাগানো সব-মেলানো কথাটি চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় প্রতিধ্বনিত হল :

'কমরেড !'

বর্তমানের মিথ্যায় ভরা কথাগুলোর মধ্যে এই কথাটি বেজে উঠল ভবিষ্যতের সুখের খবর হয়ে—যে ভবিষ্যত প্রত্যেকের জন্যে আর সকলের জন্যে অপেক্ষা করছে নতুন জীবন নিয়ে। সে-জীবন কি দূরে, না কাছে? ওরা বুঝল, ওদেরকেই সেটা স্থির করতে হবে। মুক্তির লক্ষ্যেই চলেছে ওরা আর ওরা নিজেরাই তার আসাকে স্থগিত রেখেছে।

॥ ৩ ॥

মাত্র গতকাল পর্যন্ত এই গণিকাটি ছিল আধপেটা পশুর মতো, শ্রান্ত দেহে নোংরা রাস্তাটার ধারে এসে দাঁড়াত, কেউ একজন এসে এক মুঠো খাবারের বদলে নির্মমভাবে কিনে নিত তার সোহাগ—এই গণিকাটিও ওই কথাটা শুনেছে, কিন্তু অস্বস্তির সঙ্গে মৃদু হাসি হেসে ও কথাটা আরেকবার উচ্চারণ করার সাহস পায়নি! ওর কাছে এগিয়ে এল একটি মানুষ—এ মানুষটি তাদেরই একজন যারা এর আগে আর কখনও ওপথে আসেনি—এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে পরমাত্মীয়ের মতো বলল :

'কমরেড !'

সুখের কান্নায় যাতে ভেঙে না পড়ে সেইজন্যে মেয়েটি হাসল—ভীরু কোমল হাসি, ওর ক্ষতবিক্ষত মনে এতো সুখ আর কখনও জাগেনি। অশ্রু—পবিত্র নবজাত আনন্দের অশ্রুতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল ওর চোখ, যে-চোখের নির্লজ্জ আর হন্যে চাউনি দিয়ে সে গতকাল দুনিয়ার দিকে তাকিয়েছে। সমাজচ্যুত এই মানুষগুলি দুনিয়ার শ্রমজীবীদের বিরাট পরিবার-ভুক্ত হ'য়ে তাদের আনন্দের দীপ্তি জাগিয়ে রাখল শহরের পথে পথে, আর দু-পাশের বাড়ির স্তিমিত চোখগুলি তাকিয়ে রইল ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষে ভরা শীতল দৃষ্টি মেলে।

মাত্র গতকাল এই ভিখিরিটার দিকে বিত্তবানরা কানাকড়ি ছুঁড়ে দিয়েছে ওর কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আর নিজেদের বিবেকের জ্বালাকে

শান্ত করবার জন্যে—সেও শুনেছে কথাটা। এই কথাটা ওর যেন ভিক্ষায় পাওয়া জিনিস যা পেয়ে এই প্রথম ওর দারিদ্র্যের ঘুন-ধরা বুক ভরে গেল আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায়।

অদ্ভুত এই গাড়িওয়ালাটা—খদ্দেররা যতোই ওর পিঠে খোঁচা মেরেছে ও ততই ওর খিদের জালায় ভেঙে-পড়া হাড়গিলে ঘোড়াটার পিঠে চালিয়েছে চাবুক—ঘুষি খেতেই ও অভ্যস্ত, পাথুরে রাস্তায় চাকার ঘড়ঘড়ানি শুনে শুনে ওর সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে—সেও মুখ-ভরা হাসি নিয়ে একজন পথ-চল্‌তি লোককে শুধায়: 'চলো, তোমায় পৌঁছে দিই…কমরেড?'

বলে ফেলেই আবার কথাটার শব্দ শুনে ও ভয় পেয়ে লাগাম দুটো টেনে ধরল তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাবার জন্যে, তবু ওর চওড়া লাল মুখের ওপর থেকে সেই সুখের হাসির রেশটুকু মুছে ফেলতে না পেরে নিচের দিকে তাকায় পথ-চলতি মানুষটার দিকে।

পথ-চল্‌তি লোকটি প্রীতি-ভরা চোখে ওর দিকে তাকায়, মাথা নেড়ে বলে:

'ধন্যবাদ, কমরেড! বেশী দূরে যাব না আমি।'

তবুও হাসে গাড়িওলা, সুখের অনুভূতিতে ওর চোখ বুঁজে আসে, ওর কোচ-বাক্সে ঘুরে বসে রাস্তার বুকে উচ্চকিত আওয়াজ তুলে এগিয়ে যায়।

লোকে দল বেঁধে বেঁধে রাস্তায় চলাফেরা করে, আর যে কথাটি একদিন গোটা পৃথিবীকে মেলাবে, সেই আশ্চর্য কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো তারা নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়:

'কমরেড!'

রাস্তার কোণায় এক বুড়ো বক্তৃতা দিচ্ছিল আর ভিড় জমে উঠেছিল তাকে ঘিরে, রাসভারি আর গুরুগম্ভীর চেহারার গোঁফওলা এক পাহাড়াওয়ালা এগিয়ে এল সেদিকে—তারপর কয়েক মুহূর্ত শুনে ধীরে ধীরে বলল:

'রাস্তায় সভা করা বেআইনী…চলে যান, মশাইরা…'

তারপর এক মুহূর্ত থেমে চোখ নামিয়ে মৃদু গলায় বলল:

'কমরেড…'

যারা তাদের অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দেহের রক্তে

লালন করছে, ঐক্যের ভেরীতে আহ্বান তুলছে এই কথাটির উচ্চকিত ঘোষণায়, তাদের মুখ তারুণ্য ভরা স্রষ্টার দীপ্তিতে উজ্জল, সবাই বুঝেছে—এই কথাটির পেছনে যে বিরাট শক্তি তারা নিয়োগ করেছে, সে-শক্তি অজেয় অপরিমিত। আর, তাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ধূসর অন্ধ সশস্ত্র মানুষের সারিবদ্ধ নিঃশব্দ ব্যূহ রচনা চলেছে—যারা ন্যায়ের জন্যে লড়ছে সেই বিদ্রোহীদের ওপর অত্যাচারীদের ক্রোধ নেমে আসার অপেক্ষায়।

আর, সেই বিরাট শহরের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পথে পথে, অজ্ঞাত কারিগর-দের হাতে হাতে গড়ে তোলা শীতল নিঃশব্দ দেওয়ালগুলির ফাঁকে ফাঁকে, মানুষের ভ্রাতৃত্বের প্রতি এক অসীম বিশ্বাস তখন ছড়িয়ে পড়ছে, পূর্ণতা পাচ্ছে।

'কমরেড !'

এখানে ওখানে জ্বলে উঠল দু-চারটি স্ফুলিঙ্গ যা একদিন আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করবে সমস্ত মানুষের আত্মীয়তার বলিষ্ঠ উজ্জ্বল চেতনার শিখায়। তারপর, সেই পৃথিবীগ্রাসী আগুনের ঝলসানিতে পুড়ে ছাই হবে বিদ্বেষ, ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা—আমাদের সমস্ত বিকৃতি ; সেই আগুনের আঁচে সমস্ত হৃদয় গলে গিয়ে, মিশে গিয়ে তৈরি হবে একটি একক হৃদয়—একটি যূথবদ্ধ প্রীতিভরা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন শ্রমজীবী নরনারীর নির্ভীক মহৎ হৃদয়।

ক্রীতদাসদের গড়ে তোলা আর নৃশংসতার শাসনে বাঁধা সেই মরা শহরের পথে পথে জেগে উঠল আর প্রতিমুহূর্তে শক্তি সঞ্চয় ক'রে চলল—মানুষের প্রতি বিশ্বাস, নিজেকে আর দুনিয়ার অশুভ শক্তিকে জয় করার আশ্বাস।

আর, অস্বস্তিতে ভরা নিরানন্দ অস্তিত্বের সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আলোয় উজ্জ্বল তারার মতো ভবিষ্যতের মশাল হয়ে জ্বলতে লাগল একটি সহজ মর্মস্পর্শী কথা :

'কমরেড !'

[অনুবাদ : রবীন্দ্র মজুমদার

৯ই জানুআরি

ঝড়ের প্রথম ঝাপটা এইমাত্র লেগেছে যেন, কালো হয়ে ফুঁসে-ওঠা সমুদ্রের মত মনে হচ্ছে জনতাকে। পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে মন্থরভাবে। ধোঁয়াটে মুখগুলোকে দেখাচ্ছে ঢেউয়ের মাথায় ঝাপসা ফেনার মত। উত্তেজনায় চকচকে চোখ কিন্তু তবুও মানুষগুলো অবাক হয়ে তাকাচ্ছে পরস্পরের দিকে, যেন নিজেদের স্থির সংকল্পকে তারা নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছে না। কথার টুকরোগুলি ছোট ছোট ধূসর পাখির মত চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথার উপর।

চাপা গম্ভীর গলায় কথাবার্তা, যেন নিজেরাই নিজেদের কাছে জবাবদিহি করছে।

'অসম্ভব, আর সহ্য করা যায় না। তাইতো এলাম...'

'বেকায়দা কি আর লোকে আসে... !'

'কি বল, 'তিনি' কি বুঝবেন না ?...'

এই 'তিনি' সম্পর্কেই অধিকাংশ কথাবার্তা—'তিনি' ভালো, 'তিনি' সহৃদয় 'তিনি' সব কিছু বোঝেন—কিন্তু যে-ভাবে তারা তাঁর সম্পর্কে কথা বলছে তার মধ্যে কোন রকম আগ্রহ নেই। মনে হয়, এই 'তিনি' সম্পর্কে তারা গভীরভাবে চিন্তা করেনি, কিংবা 'তিনি' যে জীবন্ত মানুষ সে-ধারণা তাদের—একেবারে ছিল না একথা যদি সত্যি নাও হয়—বেশ কিছুটা সময় ধরে নেই ; 'তিনি' যে কি তা তারা জানে না ; এমন কি এই কথাটুকুও বোঝে না যে 'তিনি' কি করতে চান বা 'তিনি' কি করতে পারেন। কিন্তু আজ 'তিনি' না হলে চলবে না। তাঁকে ভালোভাবে জানবার জন্যে সবাই উদগ্রীব ; আর আসল লোকটির সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না সুতরাং নিজেদের অজান্তেই তার সম্পর্কে মস্ত একটা ধারণা করে বসেছে। তাদের আশা মস্ত, আর সেই আশাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে মস্ত কিছু একটা দরকার।

মাঝে মাঝে জনতার ভিতর থেকে দু-একটা সাহসভরা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

'কমরেডস্, ভাঁওতাবাজিতে ভুলবেন না…'

কিন্তু আসলে নিজেরাই নিজেদের ভাঁওতা দিতে চাচ্ছে। অনেকগুলো আতঙ্কিত ও ক্রুদ্ধ চিৎকারে এই কণ্ঠস্বর ডুবে যায় :

'আমরা খোলাখুলি বেরিয়ে আসতে চাই…'

'আরে ভাই, তুমি চুপ করো তো…'

'আর তাছাড়া ফাদার গ্যাপন তো আমাদের সঙ্গে আছেন—কি বল ?'

'তিনিই সব জানেন…'

রাস্তার ওপর দিয়ে জনতার প্রবাহ নালার মত মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে, ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফেটে পড়ছে বুদবুদের মত, গুনগুন করছে, তর্ক করছে, আলোচনা করছে, স্থানচ্যুত হয়ে আছড়ে পড়ছে বাড়ির দেওয়ালের গায়ে, আবার সরে আসছে রাস্তার মাঝখানে—কালো, চলমান বস্তুপিণ্ড। মনে হয় যেন একটা সন্দেহের অস্পষ্ট ফেনা গাঁজিয়ে উঠেছে সর্বাঙ্গ থেকে। একটা প্রত্যক্ষ ও ভয়ানক রকমের তীব্র আশা—এমন কিছু ঘটবে যা চরম লক্ষ্যের পথকে উদ্ভাসিত করে তুলবে। নিজেদের সাফল্য সম্পর্কে একটা বিশ্বাস—যে-বিশ্বাস টুকরো টুকরো অংশগুলিকে জোড়া লাগিয়ে ও মিলিত করে সৃষ্টি করবে এক অখণ্ড, শক্তিশালী ও ঐক্যবিশিষ্ট অবয়ব। নিজেদের বিশ্বাসের অভাবকে গোপন করতে চেষ্টা করছে ; কিন্তু পারছে না। আর প্রত্যেকের ভেতরেই একটা আশঙ্কার অস্পষ্ট অনুভূতি, বিশেষ ক'রে শব্দ সম্পর্কে তীব্র একটা সংবেদনা। সতর্কভাবে, কান খাড়া ক'রে, সামনের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে, আর সব সময়ে কি যেন একটা খুঁজতে খুঁজতে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে। বাইরের শক্তির ওপর বিশ্বাস না রেখে যারা বিশ্বাস রেখেছিল আত্ম-শক্তিতে তাদের কথাবার্তা শুনে জনতা ভীত ও বিরক্ত। যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তার সঙ্গে তারা দেখা করতে চায় তার সঙ্গে প্রকাশ্যে বোঝাপড়া করার অধিকার তাদের আছে, একথা যারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছে তাদের কথাও কোন রেখাপাত করেনি—এত বেশি তীক্ষ্ণ জনতার এই মনোভাব।

রাস্তা থেকে রাস্তায় জনস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত

বৃদ্ধি পাচ্ছে জনতা। এই বহিঃস্ফীতি ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে সৃষ্টি করছে একটা আত্মপ্রত্যয়ের মনোভাব ; জাগিয়ে তুলছে একটা চেতনা যে গোলামেরও অধিকার আছে শাসনকর্তাকে তার প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দিতে বলা।

'যাই বল না কেন, কিন্তু আমরাও তো মানুষ…'

'আর 'তিনি' নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আমরা শুধু চাইতে এসেছি…'

'হ্যাঁ, তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন…আমরা তো আর ইন্‌কিলাব করতে আসিনি…'

'আর তা ছাড়া ফাদার গ্যাপন আছেন ভুলছ কেন…'

'কমরেডস্! ভিক্ষে ক'রে আজাদী মেলে না…'

'হায় ভগবান!…'

'একটু সবুর করো না ভাই!'

'ওই শয়তানটাকে দূর করে দাও!'

'ফাদার গ্যাপন সবার চেয়ে ভালো বোঝেন…'

কাঁধের ওপর হলদে তালি লাগানো কালো ওভারকোট গায়ে লম্বামত একটা লোক উঁচু ঢিবিটার উপর উঠে দাঁড়ায়, তারপর টাক-পড়া মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে উঁচু আর গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা শুরু করে। চোখ দুটো চকচক করছে, গলা কাঁপছে—'তাঁর' কথা, জারের কথা বলছে সে।

প্রথম দিকে লোকটির কথায় ও গলার স্বরে একটা কৃত্রিম উদ্দীপনা ছিল ; বক্তৃতায় সেই আবেগ নেই যা অন্যদের অনুপ্রাণিত ক'রে প্রায় আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটাতে পারে। যে মূর্তিটি বহুকাল হল ব্যক্তিসত্তা ও প্রাণ হারিয়েছে এবং কালের প্রভাবে যা অবলুপ্ত, তাকে সঞ্জীবিত ও জাগ্রত করে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে লোকটি। সারা জীবন 'তিনি' মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে ছিলেন, কিন্তু এখন মন্থেয চাইছে 'তাঁকে', সমস্ত আশা নিয়ে তাকাচ্ছে 'তাঁর' দিকে।

আর এই মৃতদেহে একটু একটু করে প্রাণসঞ্চার হয়। গভীর মনোযোগে জনতা শোনে এই বক্তৃতা, বক্তা তাদের মনের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করছে, এটা

অনুভব করে সবাই। আর যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সম্পর্কে একটা ধারণা নানা আজগুবি প্রক্রিয়ায় নিজেদের মনে গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে; যদিও 'তাঁর' প্রতিমূর্তির ওপর-ওপর মিলটুকুও নেই কিন্তু সবাই জানে যে এই ধরনের একজন দণ্ডমুণ্ডের কর্তার অস্তিত্ব আছে—না থেকে পারে না। বক্তা বলে যে ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখে যে-মানুষটির সঙ্গে তারা পরিচিত, তিনি আর এই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা অভিন্ন। রূপকথা শুনে যে ছবিটি তারা এতদিন ধরে চিনেছে তার সঙ্গে এই দণ্ডমুণ্ডের কর্তার যোগস্থাপন করে সে,—আর রূপকথার এই ছবিটি মানুষেরই ছবি। উঁচু গলায়, স্পষ্ট উচ্চারণে বক্তা বক্তৃতা দিয়ে চলেছে আর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে একটি জীবন্ত মানুষের ছবি—ক্ষমতাবান, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ এবং জনসাধারণের প্রয়োজনের পিতৃসুলভ মনোযোগ।

লোকে বিশ্বাস করতে শুরু করে আর তারপর বিশ্বাসে ডুবে যায়। এই বিশ্বাস উত্তেজিত করে তাদের, সন্দেহের চাপা ফিসফাস মুছে দেয়।। মনের যে বিশেষ মেজাজটির জন্যে তারা এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে তার সন্ধান মিলতেই কেউ আর দ্বিরুক্তি করে না। গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়—এক বিরাট দৃঢ়সংলগ্ন, সমদর্শী মানুষের শরীরের বস্তুপিণ্ড। কাঁধের সঙ্গে কাঁধের, নিতম্বের সঙ্গে নিতম্বের সন্নিধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্যকর উত্তাপ সৃষ্টি হয়, আশা ও সাফল্যের আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

'লালঝাণ্ডা আমরা চাই না!' চিৎকার ক'রে বলে টাকমাথা লোকটা। টুপি নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় ভিড়ের মধ্যে। টাকমাথা থেকে ফ্যাকাশে আলো ঠিকরে পড়ছে, মাথাটা দুলছে এধার ওধার। সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে তার উপর।

'আমরা যাচ্ছি আমাদের বাপের কাছে!'

'তিনি আমাদের ওপর কখনো অবিচার করবেন না।'

'কমরেড্‌স, লাল হচ্ছে আমাদের রক্তের রং।' একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে জনতার মাথার ওপর দিয়ে।

'জনসাধারণকে মুক্ত করতে পারে জনসাধারণের নিজের শক্তি, অন্য কোন শক্তি নয়।'

'ওসব কথা বন্ধ কর !'

'প্ররোচনাকারীদের হটাও ! ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই !'

'ফাদার গ্যাপন যাচ্ছেন ক্রশচিহ্ন নিয়ে আর ও ঝাণ্ডা নিয়ে এসেছে !'

'তোমার বয়স কি হে ছোকরা যে মোড়লি করতে চাও !'

আর নিজেদের ওপর বিশ্বাস যাদের সব চেয়ে কম তারা ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে ক্রুদ্ধ ও শঙ্কিত গলায় চিৎকার করে চলেছে :

'ওই ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে চলেছে, ও ব্যাটাকে মেরে ভাগাও !'

এবার আরও দ্রুত পদক্ষেপ। কোন দ্বিধা নেই। এবং প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের ওপর ছোঁয়াচ লাগছে এই সমপ্রবণতার আর এই আত্ম-প্রবঞ্চনার উন্মাদনার। যে 'তিনি'কে তারা এইমাত্র সৃষ্টি করেছে তা তাদের মনে মুহূর্তে মুহূর্তে জাগিয়ে তুলছে প্রচীনকালের উদারহৃদয় বীরদের প্রতিচ্ছবি, ছেলেবেলায় শোনা রূপকথার নানা কাহিনীর অনুরণন। মানুষের মনে বিশ্বাস করবার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার প্রাণশক্তিতে পরিপুষ্ট হয়ে 'তিনি' তাদের কল্পনায় নিরবচ্ছিন্ন রূপপরিগ্রহ ক'রে চলেছেন…

কে যেন চিৎকার করে :

' 'তিনি' আমাদের ভালোবাসেন…'

আর সন্দেহ নেই যে, যে-মানুষটিকে তারা এইমাত্র সৃষ্টি করেছে তাঁর ভালোবাসায় এই জনসমষ্টির আন্তরিক বিশ্বাস আছে।

রাস্তা থেকে বেরিয়ে জনপ্রবাহ বাঁধের ওপর এসে পৌঁচেছে। আর তখন দেখা যায় যে দীর্ঘ আঁকবাঁকা রেখায় একদল সৈন্য পুলের মুখ আটক করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এই পাতলা ধূসর প্রতিবন্ধক দেখেও জনতা দমে না। চওড়া নদীর নীলাভ পটভূমিতে দাঁড় করানো সারি সারি সৈনিকের মূর্তিগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাদের চালচলনে কোন রকম হিংস্রতা নেই। ঠাণ্ডায়-অসাড়-হয়ে-আসা পায়ের পাতা গরম রাখার জন্যে পা ঠুকছে, অস্ত্র নাড়াচাড়া করছে, ঠেলাঠেলি করছে। নদীর অপর তীরে প্রকাণ্ড ঝাপসা একটা বাড়ী। এইখানেই থাকেন 'তিনি'—'তিনি', জার, এই বাড়ির মালিক। তিনি মহৎ ও শক্তিমান, সহৃদয় ও স্নেহপরায়ণ। তাঁর কাছেই তারা চলেছে, তাঁকে তারা

ভালোবাসে, তাঁর কাছে তারা নিজেদের প্রয়োজনের কথা জানাতে চায়। আর তিনি সৈন্যদের আদেশ দেবেন তাদের বাধা দেবার জন্যে, এ কিছুতেই হতে পারে না।

কিন্তু অনেকগুলো মুখের ওপর একটা বিমূঢ় মনোভাবের ছায়া পড়ে। সামনের সারির লোকগুলোর চলার গতি কমে গেছে। পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছে কেউ কেউ, ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে অনেকে দাঁড়াচ্ছে ফুটপাথের উপর। কিন্তু প্রত্যেকেই এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে যেন সৈন্যদের উপস্থিতিটা জানা কথা, ওতে অবাক হবার কিছু নেই। কেউ কেউ অত্যন্ত শান্তভাবে সোনালী পরীটার দিকে তাকিয়ে থাকে; আবছা দুর্গের মাথায় আকাশের অনেক উঁচুতে মূর্তিটা চকচক করছে। হাসছে অনেকে। সমবেদনার স্বরে কে যেন বলে :

'বাবাঃ, এই ঠাণ্ডার মধ্যে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে…'

'হ্যাঁ, ঠাণ্ডাটা একটু বেশিই যেন…'

আর না দাঁড়িয়েই বা উপায় কি বল। দাঁড়াতেই হবে!'

'সৈন্যরা এসেছে শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে।'

'আচ্ছা ভাইসব আর কথা নয়!…গোলমাল বন্ধ কর!'

'সৈনিক জিন্দাবাদ!' কে যেন চিৎকার ক'রে ওঠে।

পিঠের দিকে ঝোলানো হলদে মস্তকাবরণ পরা একজন অফিসার খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বার করেছে। তারপর সেই বাঁকানো ইস্পাতের ফলাটাকে শূন্যে আস্ফালন করতে করতে চিৎকার করে কি যেন বলে জনতাকে। দ্রুত বিক্ষেপে সৈনিকের দল 'প্রস্তুত' অবস্থায় আসে, তারপর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চলভাবে।

মোটাগোছের একটি স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করে : 'কী করছে ওরা?'

কেউ তার কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ প্রত্যেকই দেখে, সামনে পা ফেলবার জায়গা নেই, চলতে অসুবিধা হচ্ছে।

'বাস্, আর এক পা সামনে নয়' চিৎকার করতে শোনা যায় অফিসারটিকে।

পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কেউ। মানুষের শরীর ঘন হয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। আর কালো একটা জনস্রোত অবিশ্রান্ত ধারায় এসে মিশছে তার সঙ্গে। এই স্রোতের ধাক্কা সামলাতে না পেরে জনতা সরতে থাকে, আর পুলের সামনের ফাঁকা জায়গাটা ভরে যায় একেবারে। কয়েকজন লোক সাদা রুমাল নাড়তে নাড়তে এগিয়ে যাচ্ছে অফিসারটির সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। যেতে যেতে চিৎকার ক'রে বলে :

'আমরা চলেছি আমাদের জারের কাছে !'

'শান্তি ও শৃঙ্খলা ঠিকঠিক বজায় রেখে চলেছি !'

'সরে দাঁড়াও ! নইলে আমি গুলি চালাবার আদেশ দেব !'

অফিসারের কথাগুলো জনতার কানে পৌছবার পর একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ আগেই বলেছিল যে 'তাঁর' কাছে তাদের যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু যখন তারা যাচ্ছে 'তাঁর' কাছে, তাঁর শক্তি ও সহৃদয়তার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছে এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা কোন রকমেও ক্ষুণ্ণ করেনি—তখন এই গুলি চালাবার হুমকি এতক্ষণের গড়ে-তোলা মূর্তিটাকে বিকৃত করে দিয়ে গেল। তিনি হচ্ছেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, সকলের উপরে। তিনি কেন অপরকে ভয় করতে যাবেন ? তিনি কেন চাইবেন বেঅনেট আর বুলেট চালিয়ে তাঁর আপন মানুষকে ফিরিয়ে দিতে···

লম্বা কৃশকায় চেহারা, উপবাসী মুখ, কালো চোখ একটি লোক হঠাৎ চিৎকার ক'রে ওঠে :

'গুলি করবে ? গুলি করুক তো দেখি !'

তারপর জনতার দিকে ফিরে ক্রুদ্ধ স্বরে তেমনি উঁচু গলাতেই বলে :

'কেমন ? আমি বলিনি যে ওরা আমাদের যেতে দেবে না ?'

'কারা ? সৈন্যরা ?'

'সৈন্যরা নয়। ওরা, ওই ওখানে যারা আছে···'

এই বলে সে দূরের দিকে আঙুল দেখায়।

'যারা রয়েছে আরও অনেক ওপরে···হল তো ! একথা আমি বলেছিলাম, বলিনি ?'

'এখনো আমরা ঠিক কিছু জানি না…'

'যখন ওরা শুনবে কেন আমরা এসেছি, আমাদের ওরা যেতে দেবে !'

গোলমাল বেড়ে চলেছে। শোনা যাচ্ছে ক্রুদ্ধ চিৎকার আর টিটকিরি। এই অর্থহীন প্রতিবন্ধকে যা খেয়ে লোকের সাধারণ বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে, চাপা পড়েছে। অনিশ্চয়তাসূচক, উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গি। ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস আসছে নদীর দিক থেকে। চকচক করছে টান করে ধরা বেঅনেটগুলো।

পেছনের চাপ সহ্য করতে না পেরে লোকে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। এলোমেলো মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। যারা এতক্ষণ রুমাল নাড়ছিল, তারা সরে এসে মিশে গেছে ভিড়ের মধ্যে। কিন্তু একেবারে সামনের সারির পুরুষ স্ত্রীলোক আর শিশুরা এখন একসঙ্গে রুমাল নাড়তে শুরু করেছে।

'গুলি করবে ? কী বলছ তোমরা ? গুলি করতে যাবে কেন ?' কথাগুলো বলে কাঁচাপাকা দাড়িওলা একজন প্রৌঢ় : 'তার মানে হচ্ছে এই যে ওরা আমাদের পুলের ওপর দিয়ে যেতে দেবে না। ওরা চায় যে আমরা সোজা বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাই।'

সহসা চাপা উঁচু নিচু গুমগুম একটা আওয়াজ ভেসে ওঠে। যেন হাজার হাজার চাবুক মারা হচ্ছে জনতাকে। মুহূর্তের জন্যে সবকটি গলার স্বর জমে হিম হয়ে গেছে যেন। আর সেই বিরাট জনতা ঠেলতে ঠেলতে একটু একটু করে এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

'ফাঁকা আওয়াজ,' কে যেন বলে নিষ্প্রাণ গলায়। কথাটা তার প্রশ্ন না বক্তব্য স্পষ্ট বোঝা যায় না।

কিন্তু এখানে ওখানে আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে মানুষের পায়ের কাছে পড়ে আছে কয়েকজন। চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে আর বুকের ওপর হাত চেপে ধরে একজন স্ত্রীলোক ভিড়ের মধ্যে থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে এগিয়ে চলে বেঅনেটের দিকে ; বেঅনেটগুলো তার দিকে উদ্যত। স্ত্রীলোকটির পিছনে পিছনে তাড়াতাড়ি ছুটে আসে কয়েকজন লোক, তারপর আরও কয়েকজন, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ছুটতে থাকে আগে আগে।

আবার রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা এবার আরও স্পষ্ট কিন্তু আগের চেয়েও চাপা। বেড়ার ধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা শোনে, কড়মড় ক'রে আওয়াজ হচ্ছে, যেন কতকগুলো অদৃশ্য দাঁত হিংস্র কামড় বসাচ্ছে বেড়ার উপর। কাঠের বেড়াটার গা ঘেঁষে একটা বুলেট চলে যায়, কাঠের চিল্‌তে ছোটে চারদিকে, ছিটিয়ে পড়ে লোকের চোখেমুখে। দুজন তিনজন করে মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মানুষ, তলপেট চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ছে কেউ কেউ, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছে কয়েকজন আর কিছু লোক বরফের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে চলেছে। বরফের উপর সর্বত্র টকটকে লাল দাগ, একটু একটু করে বড় হচ্ছে দাগগুলো, ধোঁয়া উঠছে। সকলের দৃষ্টি সেই দাগগুলোর উপর···মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জনতা যেন পাথর হয়ে গেছে সবাই। আর তার পরেই হাজার হাজার কণ্ঠ থেকে ফেটে পড়ে একটা বন্য স্নায়ু-চমকানো আর্তনাদ। এই আর্তনাদ উপরের দিকে উঠে ভেসে বেড়ায় বাতাসে—যেন তীব্র ব্যথা, আতঙ্ক, প্রতিবাদ, শোকার্ত বিহ্বলতা আর সাহায্যের জন্যে চিৎকারের একটানা কাঁপা-কাঁপা ভাঙা-ভাঙা আওয়াজগুলো একসঙ্গে মিশে রয়েছে।

হতাহতদের তুলে আনবার জন্যে কয়েক দল লোক মাথা নিচু করে সামনের দিকে ছুটে যায়। আহতরাও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে আর ঘুষি ছুঁড়ছে শূন্যের দিকে। মানুষগুলোর হাবভাব বদলে গেছে হঠাৎ। চোখের দৃষ্টি প্রায় উন্মাদের মত। কিন্তু আতঙ্কের চিহ্ন নেই, বা সেই বিশেষ সর্বগ্রাসী ভয়ও নেই যার কবলে পড়লে হঠাৎ মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়, শুকনো পাতার মত মানুষগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে স্তূপাকার ক'রে তোলে, আত্মগোপন করবার ইচ্ছার দুর্নিবার ঘূর্ণিপাকে অন্ধভাবে ছুটিয়ে ও চালিয়ে নিয়ে যায় এক অজানা দিকে। তবে ভয়ের সমস্ত চিহ্ন আছে—সেই ধরণের ভয় যা হিমশীতল লোহার স্পর্শের মত জ্বালা ধরিয়ে দেয়; এই ভয়ে মানুষগুলোর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেছে, ভাইস্‌যন্ত্রে আট্‌কা পড়ার মত চাপ পড়ছে শরীরের উপর, দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার ক্ষমতা নেই, বরফের উপরে ছড়ানো রক্তের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে রক্তাক্ত মুখ হাত আর জামাকাপড়ের দিকে,

আর তাকিয়ে আছে এই জীবন্ত মানুষের বিশৃঙ্খল সমাবেশের মাঝখানে শান্তভাবে শায়িত মৃতদেহগুলোর দিকে। চিহ্ন রয়েছে জলন্ত ঘৃণার, শোকার্ত অক্ষম ক্রোধের আর অনেক বিহ্বলতার। চারদিকে অদ্ভুত রকমের অনড় চোখ, ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতে টান হয়ে থাকা ভুরু, উত্তেজিত অঙ্গবিক্ষেপ আর জোরালো ভাষায় ফেটে পড়া ক্রোধ। মনে হচ্ছে যেন একটা অবসন্ন আত্মবিধ্বংসী বিমূঢ়তা গ্রাস করেছে সবাইকে। এই সামান্য কিছুক্ষণ আগেও তারা লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়েছিল; তাদের চোখের সামনে ছিল রূপকথার সেই মহিমান্বিত মূর্তি; তাঁকে শ্রদ্ধা করেছিল, ভালোবেসেছিল, আর তাঁকে অবলম্বন করে গড়ে তুলেছিল মস্ত আশা। ঝু-ঝাঁক গুলি, রক্ত, মৃতদেহ আর আর্তচিৎকার—আর তার পরেই তারা দেখছে যে তাদের সামনে ধূসর শূন্যতা, কোন সম্ভাবনা নেই, আর তাদের বুক ভেঙে গেছে একেবারে।

একই জায়গায় অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন এই জায়গার সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা। আর এই শেকল ভাঙবার ক্ষমতা তাদের নেই। নিঃশব্দে ও শোকার্তভাবে হতাহতদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন, অন্যরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে; এমনভাবে তাকায় যেন এটা একটা স্বপ্ন, কোন রকম অনুভূতি নেই, আর অদ্ভুত একটা উদাসীন অবস্থা। অনেকে নালিশ জানায় আর তিরস্কার করে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে, গালাগালি দেয়, ঘুষি পাকায়। তারপর কি যেন ভেবে টুপি খুলে মাথা নোয়ায়; আর সৈন্যদের এই বলে শাসায় যে কারও না কারও ভয়ংকর ক্রোধ তাদের উপর বর্ষিত হবে…

নিশ্চলভাবে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে, হাতে উদ্যত অস্ত্র। তাদের মুখেও একটা কাঠিন্য। গালের চামড়া টান হয়ে রয়েছে মনে হয়, চোয়ালের হাড় উঁচু উঁচু, দূর থেকে দেখাচ্ছে যেন সবারই চোখ সাদা আর ঠোঁট ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে জুড়ে গেছে…

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন মূর্ছারোগীর মত চিৎকার করে ওঠে:

'ভুল করেছে, ভাইসব, ভুল করেছে ওরা! আমাদের ওরা চিনতে পারেনি, অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে! নইলে গুলি চালাবে বিশ্বাস হয়! চলো ভাইসব, ওদের কাছে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলি!'

একটা ছেলে ল্যাম্পপোস্ট বেয়ে উপরে উঠেছিল, সে চিৎকার করে বলে :

'গ্যাপন বেইমান !'

'কমরেডস, ওরা আমাদের কেমন অভ্যর্থনা করছে দেখুন…'

'না ! কোথাও একটা ভুল হয়েছে ! এমন ব্যাপার হতেই পারে না ! চল গিয়ে ব্যাপারটা বুঝি !'

'সরে দাঁড়ান, আহতের জন্যে পথ করে দিন !'

লম্বা রোগা লোকটার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে দুজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী শ্রমিক। লোকটার সর্বাঙ্গে বরফ লেগে রয়েছে, ওভারকোটের আস্তিন থেকে রক্ত পড়ছে চুয়ে চুয়ে। বিবর্ণ মুখ, নাকটা যেন আরও খাড়া, ঠোঁটদুটো নড়ছে আস্তে আস্তে, আর ফিসফিস করে বলছে সে :

'আমি বলেছিলাম যে ওরা আমাদের যেতে দেবে না !…তাঁকে ওরা দূরে রাখতে চায়। সাধারণ লোকের জন্যে ভারি বয়ে গেছে ওদের !'

'পালাও !'

সৈন্যের দেওয়াল নড়ে উঠেছে তারপর খুলে গেছে কাঠের দরজার পাল্লার মত। সেই ফাঁক দিয়ে দুজন দুজন করে সার বেঁধে ঢুকছে একদল অশ্বারোহী সৈন্য। ঘোড়াগুলো টগবগিয়ে উঠছে আর ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে। অফিসারের উচ্চকিত আদেশ শোনা যায়। ঘোড়সওয়ারদের মাথার উপর বাঁকা তলোয়ার ঝলসে উঠছে রুপোলী পাতের মত। খান্‌খান হয়ে যাচ্ছে বাতাস, একই দিকে আবর্তিত হচ্ছে তলোয়ারগুলো। নড়েচড়ে দাঁড়িয়ে আছে জনতা, উত্তেজিত হয়েছে, অপেক্ষা করছে, নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, তারপরেই একটা উত্তেজিত চিৎকার :

'মা-আ-র্চ !'

যেন একটা ঘূর্ণি হাওয়া আছড়ে পড়ছে মানুষগুলোর মুখের উপর, যেন মাটি কেঁপে উঠেছে তাদের পায়ের তলায়। তারপরেই উন্মত্ত ভয়ার্ত পলায়ন। লোকে ছুটছে। আর ছুটবার সময় ধাক্কাধাক্কি ঠোকাঠুকি করে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, যে-সব আহতদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে, মড়া পার হচ্ছে টপ্‌কে টপ্‌কে। ঘোড়ার খুরের ভারি খটাখট্ আওয়াজটা অবশেষে

তাদের নাগাল ধরে। ঘোড়সওয়াররা ভয়ানকভাবে চিৎকার করছে, হতাহত ও হুমড়ি-খাওয়া লোকের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হচ্ছে ঘোড়াগুলো। বাঁকা তলোয়ারের ঝিলিক, ভয়ের অরে যন্ত্রণার চিৎকার, আর মাঝে মাঝে মানুষের হাড়ের সঙ্গে শিস্‌-দেওয়া ইস্পাতের ঠোকাঠুকির শব্দ। আহতদের সমবেত চিৎকার একটা একটানা ফাঁপা আর্তনাদের মত শোনাচ্ছে…

'আ-আ-আ!'

হাতে বাঁকা তোলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে মানুষের মাথা টিপ্‌ করছে ঘোড়সওয়াররা। প্রত্যেকবার ঘা দেবার সঙ্গে সঙ্গে হেলে পড়ছে ঘোড়ার পিঠের উপর। মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস, দৃষ্টি অন্ধ বলে মনে হয়। ঘোড়াগুলো হ্রেষাধ্বনি করছে, দাঁত খিঁচিয়ে উঠছে হিংস্রভাবে, মাথা নাড়ছে বুনো জানোয়ারের মত।

যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা পর্যন্ত তাড়িয়ে নেওয়া হয় লোক-গুলোকে। ঘোড়ার খুরের খটাখট্‌ শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতে না যেতেই তাকায় পরস্পরের মুখের দিকে—প্রত্যেকেই হাঁপাচ্ছে, বিস্ময়ে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবার মত অবস্থা। অনেকের মুখেই অপরাধীর মত হাসি। কে যেন হেসে বলে :

'কী কাণ্ড, দৌড়ে পালিয়ে আসতে হল!'

'যা ব্যাপার, না দৌড়ে উপায় কি! যে কোন লোকই দৌড়বে!' জবাব দেয় আর একজন।

হঠাৎ বিস্ময়, ভয় আর ক্রোধের চিৎকার শোনা যায় চারদিকে…

'এর মানে কি, ভাইসব, এঁ্যা!'

'খ্রীষ্টান সহধর্মীরা, আপনারা বলুন এটা খুন কিনা! খুন ছাড়া আর কি বলা যায়!'

'কী করেছি আমরা?'

'এদেশে গভর্ণমেণ্ট আছে, না নেই!'

'খুশিমত আমাদের কেটে কুচি কুচি করবে, এঁ্যা? ঘোড়া চালিয়ে দেবে আমাদের ওপর…'

আর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে ও পরস্পরের কাছে মনের জালা প্রকাশ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। কী করবে সে ধারণা কারও নেই। কিন্তু চলে যায় না। গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। যতটা না ভয়, অবাক হয়েছে তার চেয়ে বেশি ; চেষ্টা করছে মনের এই এলোমেলো বিচিত্র অনুভূতি কাটিয়ে উঠে পথ বার করতে, উদ্বেগাকুল ঔৎসুক্য নিয়ে তাকাচ্ছে পরস্পরের দিকে, আর তবুও অপেক্ষা করছে কিছু একটার জন্যে, কান খাড়া করে রয়েছে, কি যেন ঘটবে এই আশায় তাকাচ্ছে চারদিকে। কিন্তু কারও আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত। আর এই মনোভাবটাই সকলের মনে প্রবল ; আর এই অপ্রত্যাশিত, আতঙ্কপূর্ণ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, নিরর্থক, নিরপরাধীর রক্তঝরা মুহূর্তে সকলের মনোভাব এক হয়ে আরও স্বাভাবিক কিছু একটা রূপ নিতে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে…

একটি তরুণ কণ্ঠের সোৎসাহ ডাক শোনা যায় :

'আহতদের তুলে নিয়ে আসি চলুন !'

আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে সকলে, তারপর দ্রুত এগিয়ে যায় নদীর দিকে। রক্ত ও বরফে মাখামাখি হয়ে আহতরা আসছে উল্টো দিক থেকে ; কেউ কেউ বুকে হেঁটে, কেউ কেউ টল্‌তে টল্‌তে। ধরাধরি করে নিয়ে আসে আহতদের। ছ্যাক্‌রা গাড়িগুলোকে থামিয়ে আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় আহতদের। প্রত্যেকেই চিন্তাক্লিষ্ট, বিষণ্ণ আর নিস্তব্ধ। আহতদের দিকে তাকিয়ে কি যেন যাচাই করছে, নিঃশব্দে মূল্যবিচার করছে সব কিছুর, তুলনা করছে, আর অস্পষ্ট নিরবয়ব কালো ছায়ার মত শঙ্কাকুল যে প্রশ্ন তাদের সামনে উদ্যত তার জবাব খুঁজে বার করবার জন্যে চিন্তা করছে গভীরভাবে। এই কিছুক্ষণ আগেও তারা যে মূর্তি মনে মনে গড়ে তুলেছিল— বীরের মূর্তি, তাদের জার, দয়া ও উদারতার উৎস—সেই মূর্তিটা মুছে যায়। কিন্তু খুব অল্প লোকেরই খোলাখুলি স্বীকার করবার সাহস ছিল যে মূর্তিটা চুরমার হয়ে গেছে। কথাটা স্বীকার করা খুবই শক্ত, একথা স্বীকার করার অর্থ তাদের একমাত্র আশা ধূলিসাৎ হওয়া…

হলদে তালি লাগানো ওভারকোট গায়ে টাকমাথা লোকটা পাশ দিয়ে

বেরিয়ে গেল। ফ্যাকাশে আলো ঠিকরনো টাকমাথা রক্তে মাখামাখি, মাথা ও কাঁধ ঝুলে পড়েছে, হাঁটু ভেঙে পড়বে মনে হয়। তাকে ধরে আছে একটি ছেলে—চওড়া কাঁধ, মাথায় টুপি নেই, কোঁকড়া চুল—আর একটি স্ত্রীলোক—পরনে ফারের কোট, ফ্যাকাশে নিষ্প্রাণ মুখ।

আহত লোকটা বিড়বিড় করে বলে: 'কী কাণ্ড বল তো মিখাইলো? লোকের ওপর গুলি চালানো? এ হতেই পারে না···হতেই পারে না।'

'কিন্তু তাই তো হয়েছে।' চেঁচিয়ে বলে ছেলেটি।

'গুলি চালিয়েছে···তলোয়ার চালিয়ে কুচি কুচি করেছে···' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে স্ত্রীলোকটি।

'কি জান মিখাইলো, ওদের ওপর নিশ্চয়ই এই আদেশ ছিল···'

'তা তো ছিলই!' ক্রুদ্ধভাবে ছেলেটি জবাব দেয়: 'তুমি কি মনে করো যে ওরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে বা তোমাকে আদরআপ্যায়ন করতে এসেছে?'

'একটু দাঁড়াও তো মিখাইলো···'

আহত লোকটা থামে তারপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চিৎকার করে বলে:

'খ্রীষ্টান সহধর্মী ভাইসব!···কেন ওরা আমাদের খুন করেছে?···কোন্ আইনে? কার আদেশে?'

মাথা নীচু করে লোকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আরও খানিকটা দূরে একটা রাস্তার কোণে একদল লোক জড়ো হয়েছিল। আর সেই ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে একজন ক্রুদ্ধ সন্ত্রস্ত গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে:

'গত রাত্রে গ্যাপন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তার মানে সে জানত আজ কী ঘটবে। এ থেকেই বোঝা যায় যে সে বেইমানী করেছে। মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে আমাদের!'

'ওতে তার কী লাভ?'

'সে আমি জানি কি?'

উত্তেজনা বাড়ছে। প্রত্যেককেই এমন সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে য

তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কিন্তু প্রত্যেকেই অনুভব করছে, প্রশ্নগুলি জরুরী, গভীর, ঋজু, এবং এই প্রশ্নগুলোর জবাব কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না। বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে এই বিশ্বাস আর এক আশ্চর্য পরিত্রাতা সম্পর্কে আশা ছাই হয়ে গেল এই উত্তেজনার আগুনে।

দরিদ্র বেশভূষা, মাতৃসুলভ স্নেহপ্রবণ মুখ, বড় বড় বিষণ্ণ চোখ—মোটাসোটা গোছের একটি স্ত্রীলোক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল। নিজের রক্তমাখা বাঁ হাতটা ডান হাতে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে সে বলছে :

'এখন আমি কাজ করব কী করে? ছেলেমেয়েদের খাওয়াব কী করে? নালিশ জানাতে যাব কার কাছে? খ্রীষ্টান সহধর্মী ভাইসব, জারও যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায় তবে সাধারণ লোকদের কে আর বাঁচাবে?'.

স্ত্রীলোকটির উচ্চকণ্ঠ ও স্পষ্ট প্রশ্ন মানুষগুলিকে জাগিয়ে তোলে, উদ্দীপিত করে, নাড়া দেয়। চারদিক থেকে ছুটে এসে তারা দাঁড়ায় স্ত্রীলোকটির সামনে আর বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মন দিয়ে তার কথা শোনে।

'তার মানে সাধারণ লোকের জন্যে কোন আইন নেই?'

আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন ঠোঁট নেড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। চাপা স্বরে গালাগালি দিয়ে ওঠে অন্যরা।

ভিড়ের মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ গলায় কে যেন চিৎকার করে ওঠে :

'সাহায্য যা পেয়েছি…আমার ছেলের ঠ্যাঙ ভেঙে দিয়েছে ওরা!'

'আমার পিটারকে খুন করেছে!' উচ্চকণ্ঠে বলে আর একজন।

তারপর এই ধরনের আরও অসংখ্য চিৎকার। কানের ভিতর জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে, জাগিয়ে তুলছে ক্রমবিস্তারী প্রতিহিংসার প্রতিধ্বনি, কশাঘাতে উস্কিয়ে দিচ্ছে ক্রোধের অনুভূতি, উদ্দীপ্ত করছে এই চেতনা যে এই খুনীর দলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হলে কিছু একটা করা দরকার। কিছু একটা সিদ্ধান্তে তারা আসছে এমনি একটা আভাস ফুটে ওঠে বিবর্ণ মুখগুলোতে।

'কমরেড্‌স, চলুন আমরা শহরে যাই—হয়তো শেষ পর্যন্ত আমরা এই ব্যাপারটার কিছু একটা অর্থ পেয়ে যাব…চলুন যাওয়া যাক, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাব!'

'ওরা আমাদের খুন করবে…'

'সৈন্যদের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখা যাক না। হয়তো ওরা বুঝবে যে মানুষ খুন করা যেতে পারে এমন কোন আইন নেই!'

'হয়তো এমন আইনও আছে। তুমি কী করে জানবে?'

ধীরে ও অবিচলিতভাবে জনতা পরিবর্তিত হয়ে যায়, রূপান্তরিত হয় জনগণে। তরুণরা চলে যায় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। কিন্তু একই দিকে, নদীর দিকে ফিরে যায় সবাই। ইতিমধ্যে আরও হতাহতকে বয়ে আনা হয়েছে। উষ্ণ রক্তের গন্ধে বাতাস আচ্ছন্ন, আর্তনাদ ও উত্তেজিত চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

'ইয়াকভ জিমিনের কপাল ফুটো করে গুলি বেরিয়ে গেছে…'

'আমাদের 'ক্ষুদে বাপ' জারকে ধন্যবাদ!'

'ঠি-ই-ক! তিনি আমাদের চমৎকার আদরআপ্যায়ন করেছেন!'

কতকগুলি শক্ত শপথবাক্য উচ্চারিত হয়। মাত্র সিকি ঘণ্টা আগেও যদি কারও মুখ থেকে এইধ রনের একটি শপথবাক্যও বেরিয়ে আসত তবে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত জনতা।

একটি ছোট মেয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটছে আর প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করছে:

'আমার মাকে তোমরা দেখেছ?'

লোকে নিঃশব্দে তাকাচ্ছে আর পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

পরে, যে স্ত্রীলোকটির একটা হাত গুঁড়িয়ে গিয়েছিল তাকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়:

'এই যে আমি এই যে আমি!'

রাস্তা জনশূন্য হয়ে যায়। অল্পবয়স্করা আগে আগে তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগ করছে। আর বয়স্করা চলেছে দুজন তিনজন করে দল বেঁধে—বিষণ্ণ ভঙ্গি, কোন রকম তাড়াহুড়ো নেই, আড়চোখে তাকাচ্ছে দ্রুতগামী তরুণদের দিকে। কথা বলছে খুবই কম। মাঝে মাঝে শুধু দু একজন নিজেদের তিক্ত অনুভূতি সংযত করতে না পেরে চাপা স্বরে উত্তেজিত মন্তব্য করে উঠছে:

'তাহলে সাধারণ মানুষদের ওরা দূরে ঠেলে রাখতে চায়…'

'চুলোয় যাক ব্যাটারা, খুনীর দল!'

নিহতদের জন্যে তারা দুঃখপ্রকাশ করে। আর আভাসে-ইঙ্গিতে তারা বুঝতে পারে যে একটা জোরালো দাস-কুসংস্কারেরও মৃত্যু হয়েছে এই সঙ্গে। কিন্তু এ সম্পর্কে তারা বুদ্ধিমানের মত নির্বাক। 'তাঁর' নামটা পর্যন্ত এখন তাদের কাছে অত্যন্ত শ্রুতিকটু, বুকের ভিতরে যে বেদনা ও ক্রোধ ধিকি ধিকি করছে তা যেন আর নাড়া না খায় সেজন্যে এই নাম কেউ আর মুখেও আনছে না…

কিংবা হয়তো তারা কিছু বলেনি কারণ তাদের ভয় ছিল যে একটি কুসংস্কার মরে গেলে সেখানে আর একটি কুসংস্কার দেখা দেয়…

…জারের প্রাসাদকে ঘিরে একটা ঘনসংবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন বেষ্টনী। প্রাসাদের বাগানে, জানলাগুলোর ঠিক নীচে দাঁড় করানো হয়েছে অশ্বারোহী সেনাদলকে। ঘোড়ার ঘাস, ঘোড়ার বিষ্ঠা ও ঘোড়ার ঘামের গন্ধ এবং অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্‌, কাঁটার ঠুনঠুন, সামরিক আদেশ ও ঘোড়ার পা-ঠোকার শব্দ উঠছে জানলাগুলোর দিকে।

হাজারে হাজারে, লাখে লাখে, মানুষের একটা ঘন সমাবেশ চারদিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সৈন্যদের উপর। একটা চাপা ক্রোধ বুকের ভিতরে কুরছে। কথা বলছে শান্তভাবে, কিন্তু তাদের কথায় একটা নতুন ঝংকার, নতুন শব্দ, নতুন আশা—যা তাদের নিজেদের কাছেই প্রায় দুর্বোধ্য। সৈন্যদের একটা বাহিনী বাগানে প্রবেশ করবার পথ অবরোধ করেছে—এই বাহিনীর এক বাহু বিশ্রাম নিচ্ছে দেওয়ালের ধারে, অপর বাহু লোহার রেলিঙের কাছে। আর তাদের মুখোমুখি ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই অপরিশেষ ও বিরাট জনতা—বোবা ও ভয়ংকর।

'আপনাদের অনুরোধ করছি, সরে দাঁড়ান!' অনুচ্চ স্বরে কথাগুলি বলতে বলতে এবং জনতাকে হাত ও কাঁধ দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে একজন সার্জেন্ট-মেজর সামনে দিয়ে চলে যায়। মানুষগুলোর মুখের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করছে সে।

'আমাদের যেতে দিচ্ছ না কেন?' কে যেন তাকে জিজ্ঞেস করে।

'কোথায়?'

'জারের কাছে।'

মুহূর্তের জন্যে সার্জেন্ট-মেজর দাঁড়ায়, তারপর কেমন একটা ক্লান্ত স্বরে বলে ওঠে :

'কিন্তু আমি বলছি, তিনি এখানে নেই !'

'কী, জার এখানে নেই !'

'না, আমি আপনাদের বলছি যে তিনি নেই। আপনারা চলে যান !'

'তিনি কি পগার পার হয়েছেন নাকি ?' বিদ্রূপের স্বরে প্রশ্ন হয়।

সার্জেন্ট-মেজর আবার দাঁড়ায়, শাসানির ভঙ্গিতে হাত তুলে বলে :

'আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি ! এ ধরনের কথা বলার ফল যে কি তা আপনারা জানেন !'

তারপরেই গলার সুর বদলে সে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে :

'তিনি শহরে নেই।'

এ কথার উত্তরে জনতা সাড়া দেয় :

'তিনি কোথাও নেই !'

'তিনি মরে গেছেন !'

'তোমরা তাকে গুলি করেছ, শয়তান !'

'তোমরা কি মনে কর যে খুশিমত মানুষ খুন করতে পার তোমরা ?'

'মানুষ খুন করে জনসাধারণকে শেষ করবে সে ক্ষমতা তোমাদের নেই ! সংখ্যায় আমরা এত বেশি…'

'তোমরা জারকে খুন করেছ — বুঝেছ ?'

'আপনাদের বলছি যে সরে দাঁড়ান এবং এ ধরনের কথা বন্ধ করুন !'

'কে হে তুমি ? সৈনিক ? সৈনিক কাকে বলে ?'

আর এক জায়গায় ছুঁচলো দাড়িওলা খাটোমত একটি বৃদ্ধ সৈন্যদের উদ্দেশ করে আবেগের সঙ্গে বলছেন :

'তোমরা মানুষ, আমরাও তাই ! আজ অবশ্য তোমরা ফৌজি উর্দি পরে আছ কিন্তু কাল আবার আমাদের মতই সাজপোশাক পরতে হবে। তখন রুটির সংস্থান করবার জন্যে চাকরি চাইবে তোমরা। আর তখন দেখবে যে চাকরি নেই, রুটি জুটবে না তোমাদের। আর তারপর কি হবে জান, আজ

আমরা যা করছি ঠিক তাই করবে তোমরা। আর তখন গুলি চালাতে হবে তোমাদের ওপর—তাই নয় কি? তোমাদের পেটে খিদে রয়েছে তাই খুন করা হবে তোমাদের, কেমন?'

শীত করছে সৈন্যদের। অনবরত এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিচ্ছে, পা ঠুকছে, কান ঘষছে, এক হাত থেকে অন্য হাতে চালান দিচ্ছে রাইফেল। কথাগুলো শুনে তারা জোরে নিঃশ্বাস ফেলে এদিক ওদিক তাকায়, জিভ দিয়ে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ঠোঁট চাটে। ঠাণ্ডায় কালসিটে পড়া মুখগুলোর উপরে হতাশা, বিহ্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার ছাপ। চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে সকলে। কয়েকজন শুধু এমনভাবে একটা চোখ ঘোঁচ করে যেন কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য করছে, ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দাঁত কড়মড় করে—স্পষ্ট বোঝা যায়, এই লোকগুলোর জন্যে ঠাণ্ডায় হিমে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে বলে প্রচণ্ড রাগে তারা ফুঁশছে। ধূসর রেখায় সৈন্যরা দাঁড়িয়ে, আর সর্ব্বত্র ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপ।

লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যদের বিপরীত দিকে, বুকের দিকে বুক করে। আর মাঝে মাঝে পিছনের ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তাদের উপর।

আর যতবার এ ব্যাপার হয়, সৈন্যদের মধ্যে একজন বলে ওঠে: 'ঠিক হয়ে দাঁড়াও!'

অন্যরা সৈন্যদের হাত চেপে ধরে আগ্রহের সঙ্গে কথা বলছে। চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে শোনে তারা। অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বিকৃত হয়ে ওঠে মুখগুলো, যেন অত্যন্ত করুণ কিংবা লাজুক।

'বন্দুকে হাত দিও না!' ফারের টুপি মাথায় বাচ্চা একটি ছেলেকে বলে একজন। সৈন্যটির বুকে টোকা দিতে দিতে ছেলেটি বলছিল:

'তুমি হচ্ছ সৈনিক, কসাই নও…সৈন্যবাহিনীতে তোমাকে ডাকা হয়েছিল শত্রুর বিরুদ্ধে রাশিয়াকে রক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু এখন তোমাকে জনসাধারণের ওপর গুলি চালাবার কাজে লাগানো হচ্ছে…ভালো করে ব্যাপারটা বুঝে দেখ! জনসাধারণ, তারাই তো দেশ—রাশিয়া!'

'আমরা গুলি করছি না !' সৈন্যটি জবাব দেয়।

জনতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ছেলেটি বলে : 'দেখ! এই হচ্ছে রাশিয়া, রাশিয়ার জনসাধারণ! তারা তাদের জারের সঙ্গে দেখা করতে চায়…'

'তারা চায় না!' বাধা দিয়ে কে যেন চিৎকার করে ওঠে।

'জনসাধারণ যদি তাদের নিজেদের ব্যাপার নিয়ে জারের সঙ্গে কথা বলতে চায় তাহলে দোষের কিছু আছে? বল না, দোষের কিছু আছে?'

'আমি জানি না!' মুখ থেকে থুথু ফেলে সৈন্যটি জবাব দেয়।

পাশের লোকটি বলে :

'আমাদের ওপর কথা না বলবার আদেশ আছে…'

বলে হতাশভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটি সৈনিক হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে সামনের লোকটিকে আগ্রহের সুরে জিজ্ঞেস করছে :

'আরে, তুমি! রিয়াজান্-এর লোক না তুমি?'

'না, আমার দেশ প্‌স্কোভ…কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'না, এমনি…আমার দেশ রিয়াজান্…'

কথাটা বলে প্রাণখোলা হাসি হাসে, তারপর মুড়িসুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই ধূসর ঋজু দেওয়ালের সামনে জনতা আন্দোলিত হচ্ছে, আছড়ে পড়ছে উপলবিস্তৃত তটভূমিতে নদীর ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার মত, পিছনে সরে যাচ্ছে, আবার এগিয়ে আসছে পাক খেয়ে। যারা ভিড় করে রয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই হয়তো জানে না কেন তারা রয়েছে, কী তারা চায় আর কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে। কোন সচেতন লক্ষ্য বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য নেই। শুধু একটা অন্যায়বোধের তিক্ত অনুভূতি, ঘৃণা, আর অনেকের মধ্যে প্রতিশোধের ইচ্ছা ; এই চেতনাই তাদের একসঙ্গে বেঁধেছে, দাঁড় করিয়ে রেখেছে রাস্তায়। কিন্তু মনের এই জ্বালা মিটিয়ে নেওয়া যায় বা প্রতিশোধ নেওয়া চলে এমন কেউ নেই…সৈন্যদের দেখে রাগও হচ্ছে না, বিরক্তিও নয়, এই লোকগুলো তো একেবারেই অবোধ ; এদেরও কম দুর্ভোগ নয়—শীতে জমে যাবার মত অবস্থা, অনেকেরই কাঁপুনি থামছে না, ঠক্‌ঠক্ করে দাঁতে দাত লাগার শব্দ।

'ভোর চারটে থেকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি! কী ভয়ানক ব্যাপার ভাব তো!' ওরা বলে।

বাবাঃ, তারপরেও তোমাদের ইচ্ছে করে না, চোখ বুজে শুয়ে থাকি আর মরে যাই…'

'ধরো তোমরা যদি চলে যাও, কেমন? তাহলে আমরা আমাদের ব্যারাকের গরম ঘরে ফিরে যেতে পারি…'

'কটা বেজেছে?'

তখন প্রায় দুটো।

'আপনারা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন কেন? আর কেনই বা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?' সার্জেন্ট-মেজর জিজ্ঞেস করে।

এই প্রশ্ন, সার্জেন্ট-মেজরের গম্ভীর মুখ এবং তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মধ্যে গুরুত্ব আর প্রত্যয়ের স্বর—সব মিলে লোকের উৎসাহ দমিয়ে দেয়। তার প্রত্যেকটি কথায় যেন একটা গভীর অর্থ আছে, কথাগুলো শুনতে যতই সহজ হোক কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই! আপনাদের জন্যে এই লোকগুলোকেও ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে…'

মাথায় কাপড় জড়ানো একটি যুবক সার্জেন্ট-মেজরকে জিজ্ঞেস করে:

'আপনারা কি আমাদের উপর গুলি চালাবেন?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সার্জেন্ট-মেজর শান্তভাবে জবাব দেয়:

'যদি আমাদের উপর আদেশ হয়—নিশ্চয়ই চালাব!'

অনেক তিরস্কার, শপথ ও বিদ্রূপ ফেটে পড়ে এই কথার উত্তরে।

'কেন? কিসের জন্যে?' অন্য সমস্ত গলা চাপিয়ে লম্বা লাল-মাথা একটি লোকের গলা শোনা যায়।

'কারণ আপনারা কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করেছেন!' কান ঘষতে ঘষতে বুঝিয়ে বলে সার্জেন্ট-মেজর।

ভিড়ের মধ্যে যে সব কথা হচ্ছে তা শুনছে সৈন্যরা, চোখ পিট্‌পিট্‌ করে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে। কে একজন খুব নরম গলায় বলে:

'আঃ, একটু নরম কিছু খেতে পেলে চমৎকার হত কিন্তু!'

'আমার শরীর থেকে খানিকটা রক্ত দিতে পারি, খাবে?' কে যেন তাকে জিজ্ঞেস করে; গলার স্বর বিষণ্ণ ও ক্রুদ্ধ দুই-ই।

'আমি তো আর বুনো জানোয়ার নই,' নীরস ও বিরক্ত গলায় জবাব দেয় সৈনিকটি।

চওড়া থ্যাবড়া সারি সারি মুখ আর লম্বা ফৌজের লাইন—অনেকেই তাকিয়ে আছে সে দিকে। দৃষ্টিতে নিরুৎসাহ নিঃশব্দ ঔৎসুক্য, ঘৃণা ও বিরক্তি। কিন্তু অধিকাংশই চেষ্টা করছে নিজেদের উত্তেজনার আগুনে এই লোকগুলোকে উত্তপ্ত করে তুলতে। ব্যারাকের জীবন এদের হৃদয়কে একেবারে থেঁতলে দিয়েছে, ব্যারাকের শিক্ষায় এদের মস্তিষ্ক আবর্জনা-ঠাসা—এই হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে কিছু একটা সাড়া জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। তারা প্রায় সবাই চাইছে নিজেদের চিন্তা ও ভাবাবেগকে যে করে হোক কাজে পরিণত করতে। আর তারপর এই ধূসর নির্বিকার মানুষের দেওয়ালে শুধু ঢুঁ মেরে চলেছে, যে মানুষগুলোর এখন একমাত্র কামনা নিজেদের শরীর একটু গরম করে তোলা।

কথাবার্তায় আরও উদ্দীপনা আসে, শব্দগুলো আরও বেশী লক্ষ্যভেদী।

চওড়া লম্বা দাড়ি, নীল চোখ, গাট্টাগোট্টা চেহারা, একটি লোক বলছে:

'সৈন্যগণ! তোমাদের নিজেদের পরিচয় কি? তোমরা কি রাশিয়ার জনগণের সন্তান নও? জনগণ দরিদ্র ও উৎপীড়িত, তারা অসহায়, তাদের কাজ নেই, রুটি নেই—তাই তারা আজ জারের কাছে সাহায্যের কথা বলতে এসেছে। আর জার তোমাদের হুকুম দিয়েছে গুলি চালাতে ও খুন করতে। সৈন্যগণ! জনসাধারণ—তোমাদের বাপ ও ভাইরা—তোমাদের সাহায্য চাইছে, শুধু তাদের নিজেদের জন্যই নয়, তোমাদের জন্যেও! তোমাদের দাঁড় করানো হয়েছে জনসাধারণের বিরুদ্ধে, তোমাদের বাধ্য করা হচ্ছে নিজেদের বাপ ও ভাইকে খুন করতে! তোমরা কি করছ, ভেবে দেখ! তোমরা কি বুঝতে পার না যে তোমরা নিজেদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছ?'

শান্ত ভরাট গলা, সুশ্রী মুখ ও কাঁচাপাকা দাড়ি—সমস্ত মিলিয়ে লোকটির চেহারা ও তার সহজ ও সত্য কথাগুলি সৈন্যদের বিচলিত করেছে বোঝা

যায়। তার দৃষ্টির সামনে তারা চোখ নিচু করে। কেউ কেউ মাথা নাড়তে নাড়তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আর কেউ কেউ চোখ ঘোঁচ করে চারদিকে তাকাতে তাকাতে তার কথা মন দিয়ে শোনে। চাপা গলায় উপদেশ দেয় একজন :

'চলে যাও—অফিসার শুনতে পাবে!'

লম্বা, সুশ্রী, মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, অফিসারটি সারবাঁধা সৈন্যদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছিল। ডান হাতের দস্তানা টানতে টানতে দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলে চলেছে :

'ডিসমিস্!···সরে যাও এখান থেকে! কী? তোমরা কথা বলতে চাও? আচ্ছা, কথা বলা টের পাওয়াচ্ছি!'

মাংসল লাল মুখ, গোল চোখ—উজ্জ্বল কিন্তু জ্যোতিহীন। মন্থরভাবে, মাটির ওপর চেপে চেপে পা ফেলে সে এগিয়ে চলেছে। তার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই সময় আরও দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে, যেন প্রতিটি সেকেণ্ডের চলে যাবার তাড়াহুড়ো—পাছে অপ্রীতিকর ও বিরক্তিকর কোন কিছুর দাগ পড়ে। মনে হচ্ছে যেন সৈন্যদের সারি সোজা করতে করতে একটা অদৃশ্য রুলার টেনে নেওয়া হচ্ছে অফিসারটির পিছনে পিছনে। ঋজু হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তলপেট টান করে বুক চিতিয়ে দিচ্ছে, চোখ নামিয়ে তাকাচ্ছে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিকে। কেউ কেউ চোখের দৃষ্টি দিয়ে জনতাকে অফিসারটি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে আর ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করছে। সারির শেষ প্রান্তে পৌঁছে অফিসারটি আদেশ দেয় :

'—শান্!'

সৈন্যরা তৎপরতার সঙ্গে 'প্রস্তুত' অবস্থায় আসে, তারপর স্থির হয়ে দাঁড়ায়, যেন সবাই পাথর হয়ে গেছে।

কিছুমাত্র ব্যস্ততা না দেখিয়ে খাপ থেকে নিজের তলোয়ার টেনে বার করতে করতে অফিসারটি তারপর বলে :

'আমি আদেশ করছি, এই মুহূর্তে তোমাদের স্থানত্যাগ করতে হবে!'

কিন্তু জনতার পক্ষে স্থানত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব, কারণ ছোট জায়গাটা আগাগোড়া মানুষে ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে আর রাস্তা থেকে আরও দলে দলে লোক এসে ধাক্কা দিচ্ছে পিছন দিক থেকে।

চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা, বিদ্রূপ ও শপথবাক্য—কিন্তু অফিসারটি অবিচল। ভাবাবেগহীন দৃষ্টি সৈন্যের সারির উপর বুলিয়ে নিয়ে সামান্য ভুরু উৎক্ষেপ করে সে। একটা মিলিত কণ্ঠের কলরব ভেসে আসে জনতার দিক থেকে। অফিসারটির স্থৈর্য দেখে জনতা ফুঁসে উঠেছে—অফিসারটির ভ্রূভঙ্গি এত বেশি অমানুষিক যে এই মুহূর্তের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না।

'ওই লোকটাই হুকুম জারি করবে!'

'হুকুম জারির তোয়াক্কা করবে না, তার আগেই গুলি চালাবে…'

'হুঁঃ, এমনিতেই তলোয়ার উঁচিয়েছে, তার ওপর…'

'ও মশাই, শুনছেন! আপনি কি খুন করবার জন্যে তৈরি নাকি?'

ঠাট্টার সুরটা চলে গিয়ে ক্রমশ ফুটে উঠেছে একটা বেপরোয়া মনোভাব, চিৎকার হচ্ছে উচ্চতর, ঠাট্টা মর্মভেদী।

সার্জেন্ট-মেজর অফিসারের দিকে তাকায়, কেঁপে ওঠে, বিবর্ণ হয়ে যায়, তারপর তাড়াতাড়ি তলোয়ার টেনে বার করে।

বিপদের সংকেত জানিয়ে একটা বিউগল্ বেজে উঠেছে। বিউগল-বাদকের ওপর সবার চোখ পড়ে। গালদুটো অদ্ভুত রকমের ফুলে উঠেছে, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে চোখ, বিউগলটা কাঁপছে হাতের মধ্যে, আর টেনে টেনে বাজাচ্ছে সে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গোলমালে বিউগলের নাকী ধাতব শব্দটা ডুবে যায়। শোনা যাচ্ছে শিস, কাতরানি, গর্জন, গালাগালি, তিরস্কার, অক্ষমতার নৈরাশ্যব্যঞ্জক আর্তনাদ, আর এই মুহূর্তে মৃত্যু আসতে পারে এবং সেই মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব—এই চেতনা থেকে উদ্ভূত চরম হতাশার বেপরোয়া চিৎকারধ্বনি। মৃত্যুকে এড়িয়ে দাঁড়াবার জায়গা কোথাও নেই। কতকগুলি কালো কালো মূর্তি মাটি আঁকড়ে রয়েছে, দু-হাতে মুখ ঢেকে রয়েছে অনেকে। চওড়া দাড়িওয়ালা লোকটি সামনের দিকে এগিয়ে এসে বুকের কাছে ওভারকোটটা ছিঁড়ে ফেলে তারপর নীল চোখের দৃষ্টি মেলে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে সৈন্যদের দিকে। কি যেন বলে সৈন্যদের উদ্দেশ ক'রে কিন্তু কথাগুলো শোনা যায় না—একটা এলোমেলো হট্টগোলে তার গলার স্বর ডুবে গেছে।

সৈন্যরা ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে 'প্রস্তুত' অবস্থায় রাইফেল নিয়ে আসে তারপর

তোলে 'উদ্যত' অবস্থায় এবং পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একই রকমের সতর্ক ভঙ্গি, বেঅনেটের মুখ জনতার দিকে উঁচনো।

কিন্তু এই শূন্যে উঁচিয়ে-ধরা বেঅনেটের সারি সমান্তরাল নয়—কতকগুলির মুখ অনেক উঁচুতে, কতকগুলি একেবারে নিচে, অল্প কয়েকটাই সোজাসুজি মানুষের বুক লক্ষ্য করেছে। আর বেঅনেটগুলোকে কেমন যেন নরম দেখাচ্ছে, কাঁপছে বেঅনেটগুলো, আর মনে হচ্ছে যেন গলে পড়বে ও বেঁকে যাবে।

ভয় ও বিরক্তি মেশানো একটা উচ্চকণ্ঠ শোনা যায় :

'কী করছ তোমরা ? খুনীর দল !'

বেঅনেটের সারি থর থর করে কাঁপছে। ভীতিবিহ্বল এক ঝাঁক গুলি ছুটে আসে। শব্দ হচ্ছে, বুলেট বিঁধছে, নিহত ও আহতরা মুখ থুবড়ে পড়েছে—জনতা সরে দাঁড়ায়। আর একটিও কথা না বলে বাগানের রেলিং টপ্‌কাতে শুরু করে কয়েকজন।

আর এক ঝাঁক গুলি ছুটে আসে…তারপর আরও এক ঝাঁক।

একটি ছেলে রেলিং বেয়ে উঠেছিল। একটা বুলেট এসে লাগে, পা দুটো উপরের দিকে তুলে হুমড়ি খেয়ে ঝুলে থাকে [illegible] মাথায় একরাশ নরম চুল, একটি দীর্ঘাঙ্গী সুশ্রী স্ত্রীলোক [illegible] দেয় [illegible] মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছেলেটির পাশে।

'নরকেও স্থান হবে না তোমাদের !' কে যেন চেঁচিয়ে বলে।

জায়গাটা অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে আর অনেক বেশি শান্ত। পিছন-দিকের লোকেরা ছুটে রাস্তায় ফিরে গেছে, তারপর আশ্রয় নিয়েছে বাড়ির উঠোনে। যেন কতকগুলো অদৃশ্য হাতের ঠেলা খেয়ে আস্তে আস্তে পিছু হটে গেছে জনতা। সৈন্যের সারি ও জনতার মাঝখানে এখন প্রায় কুড়ি ফুট জায়গা আর জায়গা-টুকুতে হতাহতরা ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে জনতার দিকে। কেউ কেউ উঠেছে খুবই কষ্টের সঙ্গে, দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে মাটির উপর চাপ চাপ রক্ত, টলতে টলতে তারা এগিয়ে চলেছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্তে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে তাদের পদক্ষেপ। আর অনেকেই পড়ে আছে নিশ্চলভাবে, কারও মুখ আকাশের দিকে, কারও মাটির দিকে, কেউ পাশ ফিরে—আর একটা অদ্ভুত

উদগ্রতায় টান হয়ে আছে প্রত্যেকেই। মনে হচ্ছে যেন মৃত্যু তাদের আঁকড়ে ধরেছে কিন্তু তারা চেষ্টা করছে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হতে···

রক্তের গন্ধে বাতাস আচ্ছন্ন, গুমোট দিনের শেষে সন্ধ্যার সমুদ্রের উষ্ণ লবণাক্ত হাওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অত্যন্ত ক্ষতিকর গন্ধ, মানুষের নেশা ধরায় এবং এই গন্ধে বহুক্ষণ ধরে ও গভীর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবার একটা অসুস্থ কামনা জাগিয়ে তোলে। এই গন্ধ মানুষের অনুভূতিতে একটা ন্যক্কারজনক বিকৃতি আনে; কসাই, সৈনিক এবং অন্য যাদের পেশা হচ্ছে খুন করা তারা তা জানে।

জনতা পিছু হটছে আর কাতরে উঠছে। গালাগালি, শপথবাক্য আর যন্ত্রণাসূচক চিৎকার তালগোল পাকিয়ে মিশে গেছে শিস্, গর্জন আর আর্তনাদের সঙ্গে। মাটির সঙ্গে দৃঢ়মূল পা ফেলে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে মড়ার মত। মুখগুলো ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে শক্তভাবে—যেন তারাও চায় জোরে চিৎকার করে উঠতে আর শিস দিতে কিন্তু আদেশবিরুদ্ধ বলে সংযত করে রাখছে নিজেদের। এখন আর তাদের চোখ পিট্‌পিট্ করছে না, বড় বড় চোখ মেলে বিস্ফা[illegible] দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। যেন মানুষের দৃষ্টি নয়, টান হয়ে [illegible]আছে হা[illegible] উপর ভাবলেশহীন দুটো গর্ত দৃষ্টিহীন বলে মনে হয়। কিংবা হয়তো তারা তাকিয়ে দেখতে চায় না, হয়তো তাদের মনে মনে ভয় আছে—যে রক্তপাত তারা করেছে সেই উষ্ণ প্রবাহ চোখ মেলে দেখলে আরও বেশি রক্তপাত করবার ইচ্ছা জাগবে। রাইফেলগুলো কাঁপছে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে, বেঅনেটগুলো পাক খাচ্ছে যেন বাতাসে ফুটো করতে চায়। কিন্তু এই কাঁপুনি সত্বেও তাদের নিস্পৃহ উদাসীনতা দূর হয় না—কারণ পদে পদে ইচ্ছার অমর্যাদা ঘটে বলে তাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গেছে, ন্যক্কারজনক দূষিত মিথ্যার পুরু আবরণ পড়েছে তাদের মনের উপর। দাড়িওয়ালা নীলচোখ লোকটি মাটি থেকে উঠে দাঁড়ায়। তার সমস্ত শরীর মোচড় দিয়ে উঠছে, ধরা ধরা গলায় সৈন্যদের উদ্দেশ করে আবার সে বলে:

'আমাকে খুন করতে তোমাদের হাত ওঠেনি···কারণ আমি তোমাদের কাছে যা বলেছি তা হচ্ছে পবিত্র সত্য···'

হতাহতদের তুলে নেবার জন্যে লোকে আবার ধীর ও বিষণ্ণ গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। কয়েকজন এসে দাঁড়ায় যেখানে সেই লোকটি সৈন্যদের উদ্দেশ করে কথা বলছিল। লোকটির কথায় বাধা দিয়ে তারাও যুক্তি দেখায়, চিৎকার ও ভর্ৎসনা করে। ক্রুদ্ধ ভঙ্গি নয়, বরং একটা বিষণ্ণতা ও সহানুভূতির সুর রয়েছে তাদের কথাবার্তায়। গলায় ও স্বরে বেজে উঠছে একটা অকপট বিশ্বাস যে সত্যেরই জয় হবে, আর এই নিষ্ঠুরতার কার্যকারণহীনতা ও উন্মত্ততাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার ইচ্ছা—যেন সৈন্যরা বুঝতে পারে কী ভয়ংকর ভুল তারা করেছে। তারা চাইছে এবং প্রাণপণে চেষ্টা করছে সৈন্যরা যেন বুঝতে পারে যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে ভূমিকায় তারা নেমেছে তা কী লজ্জাকর ও ঘৃণ্য…

অফিসারটি চামড়ার খাপ থেকে রিভলবার বার করে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে অস্ত্রটা, তারপর পা ফেলে, এগিয়ে আসে যেখানে জনতার এই দলটি সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলছিল। কোন রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে—উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়তে দেখলে লোকে যেমন সরে দাঁড়ায় তেমনিভাবে—অফিসারের জন্যে জায়গা করে দেয় তারা। কিন্তু দাড়িওয়ালা নীলচোখ লোকটি একটুও সরে না, সোজাসুজি দাঁড়ায় অফিসারের সামনে, আর তারপর দূরবিস্তৃত ভঙ্গিতে চারদিকের রক্তের দিকে আঙুল দেখিয়ে উদ্দীপ্ত গলায় ভর্ৎসনার সুরে বলে :

'এর সমর্থনে কোন যুক্তি দেখাতে পার তুমি ? নেই, কোন যুক্তি নেই।'

অফিসারটি তার সামনে দাঁড়ায়, ভুরু ঘোঁচ করে যেন অন্য কোন চিন্তায় গভীরভাবে ডুবে আছে, তারপর হাত তোলে। গুলির শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু খুনীর হাতের চারপাশে পাক খেয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে দেখা যায়। একবার, দু-বার, তিনবার। তিনবারের পরেই দাড়িওয়ালা লোকটির হাঁটুতে আর জোর নেই, মাথাটা হেলে পড়েছে পিছন দিকে আর ডান হাত নেড়ে পড়ে আছে মাটিতে। চার দিক থেকে লোক ছুটে আসে খুনীর দিকে। তলোয়ার আস্ফালন করতে করতে আর সবার দিকে রিভলবার উঁচিয়ে পিছু হটে সে…পায়ের কাছে একটা ছেলে পড়ে গিয়েছিল,

তলোয়ার চালিয়ে দেয় ছেলেটার পেটের ভিতরে। তিরিক্ষি গলায় চিৎকার করে আর ঘোড়ার মত টগবগিয়ে লাফঝাপ দেয়। কে যেন তার মুখ লক্ষ্য করে একটা টুপি ছুঁড়েছে, রক্তমাখা বরফে মাখামাখি হয়ে যায় সে। সার্জেন্ট-মেজর এবং আরও কয়েকজন লোক বেঅনেট উঁচিয়ে ছুটে আসে তার দিকে, আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। বিজেতা তখন এই পলায়নপর লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে শাসানির ভঙ্গিতে তলোয়ার আস্ফালন করে তারপর হঠাৎ নিচের দিকে নামিয়ে আর একবার ছেলেটার শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়—ছেলেটা তখন তার পায়ের কাছে হামাগুঁড়ি দিয়ে হাঁটছিল আর প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল তার শরীর থেকে।

বিউগলের ধাতব একটানা সুর আবার বেজে উঠেছে। শুনেই দ্রুত স্থানত্যাগ করেছে সকলে। আর শব্দটা বাতাসে আন্দোলিত হয়ে চলেছে—যেন তুলির শেষ টান পড়ছে সৈন্যদের ভাবলেশহীন চোখে, অফিসারটির বীরত্বে, তার রক্তাক্ত তলোয়ারে ও বিপর্যস্ত গোঁফে…

রক্তের টকটকে লাল রং চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তবুও খানিকটা আকর্ষণও আছে। নেশা ধরানো অবাধ্য কামনা জাগে আরও দেখবার, আরও বেশি করে দেখবার। সৈন্যরা উচ্চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘাড় উঁচিয়ে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক—যেন দেখছে বুলেট বেঁধাবার জীবন্ত লক্ষ্যবস্তু আরও আছে কিনা…

সৈন্যের সারির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে তলোয়ার আস্ফালন করছে অফিসারটি। তারপর ঘড়ঘড়ে ক্রুদ্ধ গলায় বুনো হুংকার ছেড়ে কি যেন বলে সে।

চারদিক থেকে উচ্চকণ্ঠ জবাব ভেসে আসে :

'কসাই !'

'স্কাউণ্ডেল !'

গোঁফে তা দিচ্ছে অফিসারটি।

এক ঝাঁক গুলি ছুটে আসে, তারপর আরেক ঝাঁক…

বস্তাবন্দী ফসলের মত রাস্তায় লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে। এখানে শ্রমিকশ্রেণীর লোক খুবই কম। অধিকাংশই ক্ষুদে দোকানদার, ফেরিওলা আর

কেরানী। এদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আগেই রক্ত ও মৃতদেহ দেখেছে, অন্যরা মার খেয়েছে পুলিশের হাতে। আজ তারা রাস্তায় বেরিয়েছে বিপদের আশঙ্কায়, সর্বত্র ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে এই আশঙ্কা আর সেইদিনের ভীতিপ্রদ ঘটনাগুলোর চেহারাকে ফাঁপিয়ে ফেনিয়ে মস্ত করে তুলেছে। পুরুষ, স্ত্রীলোক আর শিশুরা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারদিকে আর ভয়ানক কিছু একটা ঘটবে এই মনোভাব নিয়ে কান খাড়া করে আছে। কত লোক খুন হয়েছে সে-সম্পর্কে বলাবলি করছে, গোঙাচ্ছে, কাতরাচ্ছে, গালাগালি দিচ্ছে, সামান্য আহত শ্রমিকদের কাছে প্রশ্ন করছে আর মাঝে মাঝে গলা নামিয়ে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলছে কানে কানে। কেউ জানে না তারা কি করবে আর কেউ বাড়ি যাচ্ছে না। তবে অনুমানে এইটুকু বুঝেছে যে খুনোখুনির পর ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটবে। এমন কিছু যার তাৎপর্য তাদের কাছে শত শত হতাহতের চেয়েও গভীর ও মর্মান্তিক,—হতাহতরা তো তাদের কাছে অনাত্মীয় বৈ কিছু নয়।

প্রায় কোন রকম চিন্তা না করেই তারা এ পর্যন্ত দিন কাটিয়েছে। গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাদের কতকগুলি অস্পষ্ট ধারণা ছিল মাত্র—ঈশ্বর জানেন এই সব ধারণা কবে এবং কি ভাবে তারা পেয়েছে। আর ধারণাগুলির কোন অবলম্বন ছিল না—সুতরাং অনায়াসেই তাদের চিন্তাশক্তি মোটা ও ঘন বুনটে জড়িয়ে গেছে আর ঢাকা পড়েছে একটা চটচটে শক্ত প্রলেপে। একটা কিছু শাসনশক্তি আছে যার দায়িত্ব তাদের রক্ষা করা এবং সেই দায়িত্ব পালনে তা সক্ষম, এই ধরনের চিন্তায় তারা অভ্যস্ত। অর্থাৎ আইনের উপর তাদের বিশ্বাস আছে। এই অভ্যাস তাদের ভিতর খানিকটা নিশ্চয়তার মনোভাব এনেছে, বাঁচিয়েছে আপদবিপদে। এই অবস্থায় একরকম জীবন কাটছিল, যদিও এই অস্পষ্ট ধারণাগুলো প্রায়ই চিড় খেয়েছে বাস্তব জীবনের খোঁচায়, আঁচড়ে ও গুঁতোয়—এমন কি মাঝে মাঝে জোরালো ঘুষি পর্যন্ত লেগেছে, কিন্তু তারা একগুঁয়ের মত খাড়া থেকেছে। আঁচড় ও ফাটলগুলো নিরাময় হতে বেশি সময় লাগেনি এবং তাদের চিন্তাধারার প্রাণহীন সমগ্রতা বজায় আছে।

কিন্তু আজ তাদের মস্তিষ্ক যেন হঠাৎ আবরণমুক্ত হয়ে গেছে। তারা কাঁপছে, আতঙ্কে বুক ঠাসা আর এই আতঙ্ক জাগিয়ে তুলছে যেন একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার শিরশিরানি। যা কিছু প্রতিষ্ঠিত ও অভ্যস্ত তা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। মানুষের অধিকার মানে না, আইন মানে না—এমন একটি নিষ্ঠুর ও রূঢ় শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের অসহায়তা এবং বিষণ্ণ ও ভয়ংকর নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে তারা আজ প্রত্যেকেই কম-বেশি স্পষ্টভাবে সচেতন। প্রত্যেকের জীবন এই শক্তির হাতের মুঠোয়। জনসাধারণের মধ্যে মৃত্যুর বীজ ছড়াতে পারে এই শক্তি, শাস্তি দেবার কেউ নেই; মর্জিমত এবং যতগুলি খুশি প্রাণ ধ্বংস করতে পারে, বাধা দেবার কেউ নেই। কারো সঙ্গে কথা বলতে রাজি নয়। সে সর্বশক্তিমান এবং আজ শহরের রাস্তা অকারণে মৃতদেহে আকীর্ণ করে ও রক্তের বন্যা ছুটিয়ে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রমাণ দিয়েছে যে তার কর্তৃত্ব সীমাহীন। তার রক্তলোলুপ পিপাসার্ত উন্মত্ত খাম-খেয়ালী প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, আর ছড়িয়ে পড়েছে একটা সর্বজনীন আতঙ্ক ও একটা সর্বগ্রাসী আত্ম-বিধ্বংসী ভয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবিচলিতভাবে মনকে জাগিয়ে তুলছে, মানুষকে বাঁচাবার জন্যে নতুন নতুন পরিকল্পনা ও জীবনকে রক্ষা করবার জন্যে নতুন নতুন প্রক্রিয়া খুঁজে বার করতে বাধ্য করছে।

বেঁটে মত গাঁট্টাগোট্টা একটি লোক মাথা নিচু করে রক্তমাখা হাত দুটো দোলাতে দোলাতে হাঁটছিল। তার জামার সামনের দিকটাও রক্তে একেবারে মাখামাখি।

'তুমি কি আহত হয়েছ?' তাকে জিজ্ঞেস করা হয়।

'না।'

'তাহলে অত রক্ত কেন?'

'ও আমার গায়ের রক্ত নয়', বলে চলে যায় লোকটা। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাকায় চারদিকে আর অদ্ভুত গলায় চিৎকার করে ওঠে:

'আমার গায়ের রক্ত নয়। এ হচ্ছে সেই সব মানুষের রক্ত যারা বিশ্বাস করেছিল...' আর তারপর তার বক্তব্য শেষ না করেই মাথা নিচু করে চলে যায়।

কনূৎ* দোলাতে দোলাতে একদল অশ্বারোহী বাহিনী ঘোড়া ছুটিয়ে আসে জনতার মধ্যে। দূরে সরে যাবার জন্যে জনতা ছুটছে, ধাক্কা খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে, গা ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে দেওয়ালের পাশে। সৈন্যগুলো মাতাল অবস্থায় ছিল ; বোকার মত হাসছে, দুলছে ঘোড়ার জিনের উপর বসে আর যেন নিজেদের অজান্তে কনূৎ চালাচ্ছে লোকের মাথায় ও ঘাড়ে। কনূতের বাড়ি খেয়ে একটি লোক চোখে অন্ধকার দেখছিল, পড়ে গিয়েছিল মাটিতে, কিন্তু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সৈন্যটিকে জিজ্ঞেস করে :

'কেন মারলে আমাকে ? এ্যাঁ ! জানোয়ার কোথাকার !'

ছোট হাল্‌কা বন্দুকটা খুলে নেয় সৈন্যটি, তারপর ঘোড়ার লাগাম না টেনেই গুলি চালায় লোকটির দিকে।

আবার মাটিতে পড়ে যায় লোকটি। সৈনিক হেসে ওঠে।

'কী কাণ্ড দেখলে !' সম্ভ্রান্ত পোশাক পরা একজন ভদ্রলোক শিউরে উঠে চিৎকার করে ওঠেন। বিকৃত মুখে তাকান চারদিকে। 'কী কাণ্ড দেখলে !'

উত্তেজিত গলায় অবিরাম কলরব হচ্ছে। আর ভয়ের উৎকণ্ঠা ও হতাশার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে কি যেন ; ধীর, গোপন সঞ্চারে মিলিত ও উজ্জীবিত করছে অপটু কাজে-অনভ্যস্ত মনগুলোকে।

কিন্তু শান্তির ধ্বজাধারী লোকও হাজির ছিল।

'ও কেন সৈন্যটিকে গালাগালি দিল ?' কৈফিয়ৎ চায় একজন।

'সৈন্যটি আগে ওকে মেরেছে, বল মারেনি ?'

'রাস্তায় ভিড় না করে সরে দাঁড়ানো উচিত ছিল ওর।'

একটা তোরণের নিচে দুটি স্ত্রীলোক ও একটি ছাত্র একজন শ্রমিককে পরিচর্যা করছিল। শ্রমিকটির হাতের ভিতর দিয়ে গুলি চলে গিয়েছে। আহত লোকটি পা ছুঁড়ছে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারদিকে।

আশেপাশের লোকদের উদ্দেশ করে সে বলে :

'কোন রকম ঢাকাঢাকি আমরা করিনি, সাফ্‌সুফ সব কথা জানিয়েই

---

* কনূৎ হচ্ছে এক ধরনের চাবুক, রুশদেশে জারের আমলে শাস্তি দেবার জন্যে প্রচলিত ছিল।

গিয়েছিলাম। শুধু মুখফোড় বদমাশগুলোই বলে, আমাদের মতলব ছিল অন্য। খোলাখুলিই আমরা গিয়েছি, মন্ত্রীরা জানত কেন আমরা যাচ্ছি। আমাদের দরখাস্তের নকলও ছিল তাদের কাছে। যদি যাওয়াই বারণ হয় তবে আগে বলে দিল না কেন? যত সব বদমাশ! এ কথাটুকু বলবার যথেষ্ট সময় তারা পেয়েছে। আমরা তো আর হঠাৎ বেমক্কা বেরিয়ে পড়িনি, অনেক দিন থেকেই বন্দোবস্ত চলছিল···পুলিস, মন্ত্রী সবাই জানত যে আমরা যাচ্ছি। খুনীর দল···'

'কী লিখেছিলে তোমাদের দরখাস্তে?' বেঁটে মত পাকাচুল রোগা বৃদ্ধ একটি লোক চিন্তান্বিতভাবে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে।

'আমরা লিখেছিলাম যে জার সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জমায়েত করুন এবং তাদের সাহায্যে দেশ শাসন করুন। আমলাদের দিয়ে দেশ শাসন বন্ধ করতে হবে। এই বজ্জাতগুলো দেশটাকে উচ্ছন্নে দিয়েছে আর সবার ওপরে ডাকাতি শুরু করেছে।'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা···দেশশাসনের ব্যাপারে আমাদের হাত থাকা চাই!' বৃদ্ধ মন্তব্য করে।

শ্রমিকটির হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়, আর খুব সাবধানে তার জামার আস্তিন নামিয়ে দেওয়া হয়।

সে বলে: 'ধন্যবাদ! 'আমি কমরেডের বলেছিলাম যে গিয়ে কোন লাভ নেই, কোন ফল হবে না। এবার তারা বুঝবে যে আমি খাঁটি কথা বলেছিলাম।'

তারপর বোতাম লাগানো ওভারকোটের ফাঁকে সন্তর্পণে হাত ঢুকিয়ে ধীরেসুস্থে চলে যায়।

'লোকটার কথাবার্তার ধরন দেখলে? মানেটা বুঝলে তো ভাই···'

'তা আর বুঝিনি, তবুও এত লোককে খুন করাটা ঠিক হয়নি···'

'আজ ওদের খুন করেছে, কাল হয়তো আমাদের পালা···'

'এই কথাটা ঠিক বলেছ ভাই···'

আরেক জায়গায় দু-জনের উত্তেজিত তর্ক হচ্ছে। একজন বলে:

তিনি হয়তো জানতেন না!'

'তাহলে কেন…'

কিন্তু শবটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায় এমন লোক খুবই কম, এত কম যে চোখেই পড়ে না। যে প্রেতাত্মার কবর দেওয়া হয়েছে তাকে তুলে আনবার চেষ্টা শুধু ক্রোধই জাগিয়ে তুলছে। এসব কথা যারা বলছিল তাদের উপর সবাই এমন রুখে আসে যেন তারা শত্রু, আর ভয়ে পালিয়ে যায় তারা।

রাস্তা দিয়ে গোলন্দাজ বাহিনী চলেছে, ঘোড়ার উপর আর কামানবাহী গাড়ির উপর বসে আছে সৈন্যরা, চোখেমুখে উৎকণ্ঠা নিয়ে মানুষের মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। কামান চলবার জায়গা করে দেবার জন্যে লোকে ঠেলাঠেলি করে সরে দাঁড়ায়। একটা বিষণ্ণ স্তব্ধতা, শুধু শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার সাজ-পোষাকের ঝন্‌ঝন্ শব্দ, গোলাবারুদের পেটির ঘড়ঘড় আওয়াজ। কামানের নলগুলো হাতীর শুঁড়ের মত দুলছে, কামানের মুখগুলো মাটির দিকে ফেরানো—মনে হচ্ছে যেন মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলেছে। এই অশ্বারোহী যাত্রিদলকে দেখে শোকযাত্রার কথা মনে পড়ে।

দূর থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসে। উৎকর্ণ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জনতা। একজন বলে :

'আবার !'

হঠাৎ একটা উত্তেজনার আবর্ত পাক খেয়ে ওঠে রাস্তায় রাস্তায়।

'কোথায়, কোথায় ?'

'দ্বীপে…ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপে…'

'শুনতে পাচ্ছ ?'

'বলছ কি তুমি ?'

'দিব্যি দিয়ে বলছি ! একটা বন্দুকের দোকান ওরা দখল করে নিয়েছে…'

'এ্যাঁ !'

'টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো কেটে ফেলে ব্যারিকেড্ বানিয়েছে…'

'তাই নাকি ?'

'অনেক লোক ?'…

'প্রচুর !'

'হুঃ! আজ যত নির্দোষ লোকের রক্তপাত হয়েছে তার শোধ যদি ওরা নিতে পারে!'

'চল ওখানে যাই!'

'চল যাই। ইভান ইভানোভিচ্, যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ-এ্যা-এ্যা…যাব তো…তবে কি জান…'

ভিড়ের সামনে একটি মানুষের মূর্তিকে দেখা যায়, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে শোনা যায় এক উদাত্ত আহ্বান: 'কে আছ স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ চাও? জনসাধারণের জন্যে, জীবনে ও শ্রমে মানুষের অধিকার স্থাপনের জন্যে? ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সংগ্রামে প্রাণ দিতে রাজি আছ কে? কে?—এগিয়ে হাতে হাত মেলাও!'

কয়েকজন এগিয়ে এসে লোকটিকে ঘিরে দাঁড়ায়, মানুষের শরীরের একটা ঘনসংবদ্ধ গ্রন্থি গড়ে ওঠে রাস্তার মাঝখানে। তাড়াতাড়ি সরে যায় অন্যরা।

'দেখেছ, মানুষগুলো কী রকম ক্ষেপে আছে!'

'ক্ষেপা তো স্বাভাবিক! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক!'

'কিন্তু এ তো পাগলামি…'

সন্ধ্যার অন্ধকারে মানুষের ভিড় পাতলা হয়ে আসে। দল ভেঙে লোকে বাড়ি ফিরেছে, আর সঙ্গে নিয়ে গেছে একটা আতঙ্কের অপরিচিত ও নিঃসঙ্গতার ভীতিপ্রদ অনুভূতি; তাদের জীবনের—গোলামের উৎপীড়িত অর্থহীন জীবনের মর্মান্তিকতা সম্পর্কে একটা অর্ধ-জাগ্রত চেতনা…আর একটা প্রস্তুতি—যা কিছু তাদের পক্ষে লাভজনক ও সুবিধাজনক তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে নিজেদের…

আবহাওয়াটা থমথমে—এতটা থমথমে এর আগে আর হয়নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের বাইরের স্বার্থের যে শিথিল যোগসূত্র—তা এই অন্ধকারে ছিন্ন হয়ে গেছে। যাদের বুকে কোন আগুন জ্বলছে না তারা ফিরে গেছে নিজেদের অভ্যস্ত ডেরায়।

রাত্রি ঘনায়মান, কিন্তু রাস্তার আলো এখনো জ্বলেনি…

'ড্র্যাগুন বাহিনী!' ভাঙা গলায় চিৎকার শোনা যায়।

একদল অশ্বারোহী সেনা হঠাৎ বেরিয়ে আসে একটা গলি থেকে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠোকে ঘোড়াগুলো, তারপর ছুটে আসে লোকগুলির উপর। সৈন্যরা অদ্ভুতভাবে চিৎকার করছে, গর্জন করছে, আর সেই গর্জনের ভিতর এমন কিছু আছে যা অমানুষিক, অন্ধকার, অন্ধ, দুর্বোধ্য ; এমন কিছু যা প্রায় হতাশার মত মনে হয়। ঘোড়া আর মানুষ দুই-ই অন্ধকারে মনে হচ্ছে আরও ছোট, আরও কালো। বাঁকানো তলোয়ার থেকে ম্লান আলো ঠিকরে পড়ছে, চিৎকার আর্তনাদ আগের চেয়ে অনেক কম, কিন্তু শোনা যাচ্ছে অনেকগুলো আঘাতের শব্দ।

'কমরেড্‌স, হাতের কাছে যা পাও তাই দিয়ে ঘা মারো! রক্তের বদ্‌লা চাই!'

'পালাও!'

'খেয়াল রেখ, সৈনিক! আমি চাষী নই!'

'ইঁট চালাও, কমরেডস!'

ছোট ছোট কালো মূর্তিগুলোকে তছনছ ক'রে দিয়ে ঘোড়াগুলো লাফঝাঁপ দিচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে। ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষ। একটা আদেশ শোনা যায়:

'স্কোয়াড!...'

বিউগল বাজছে, দ্রুত অস্থির সুর। মানুষ দৌড়চ্ছে, ঠেলাঠেলি ক'রে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। জনশূন্য রাস্তা, এখানে ওখানে মাটি কালো হয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে। আশেপাশে কোথা থেকে যেন ভারি ঘোড়ার খুরের দ্রুত শব্দ আসছে...

'লেগেছে নাকি, কমরেড?'

'আমার কানটা উড়ে গেছে মনে হয়...'

'খালি হাতে কীই বা করা যায়?'

জনশূন্য রাস্তায় রাইফেলের গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

'ওদের এখনো ক্লান্তি আসেনি—শয়তান!'

স্তব্ধতা। দ্রুত পদধ্বনি। রাস্তায় এত কম শব্দ আর এত কম চলাচল—

ভারি আশ্চর্য। একটা চাপা জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে উঠছে চারদিক থেকে, যেন সমুদ্রের জোয়ার এসেছে শহরের উপর।

কাছাকাছি কোথা থেকে একটা চাপা বিলাপ কেঁপে কেঁপে উঠছে অন্ধকারে···হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়চ্ছে কে যেন।

একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা যায় :

'লেগেছে নাকি, ইয়াকভ ?'

'ও কিছু না !' মোটা ভারি গলায় জবাব।

যে গলিটা থেকে ড্রাগুন বাহিনী ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিল সেখান থেকে একদল লোক বেরিয়ে আসে, তারপর এগিয়ে চলে সারা রাস্তাটা জুড়ে কালো একটা প্রবাহের মত। দল থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে আগে আগে যে হাঁটছিল, সে বলে :

'আজ আমরা রক্তের স্বাক্ষরে শপথ নিয়েছি—আজ থেকে আমরা নিজেদের অধিকারকে কায়েম করে চলব।'

ধরা ধরা অস্থির গলায় বাধা দিয়ে বলে আর একজন :

'হ্যাঁ—যাদের ওপর আমরা ভরসা করতাম তারা দেখিয়ে দিয়েছে তাদের আসল চেহারাটা কি।'

হুমকি দেবার মত আর একজন বলে ওঠে :

'এই দিনটি আমরা কখনো ভুলব না !'

দ্রুত পায়ে তারা হাঁটছে, গায়ে গা ঘেঁষে ঘনসংবদ্ধ, একসঙ্গে কথা বলে উঠছে অনেকে, আর সেই কালো ক্রুদ্ধ জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তাদের এলোমেলো গলার স্বর। আর মাঝে মাঝে অন্য সমস্ত গলা ছাপিয়ে দু-একজনের কথা শোনা যাচ্ছে।

'ভগবান, কতগুলি লোক খুন হল আজ !'

'আর কীই বা তারা করছে ?'

'না ! এই দিনটি আমরা ভুলতে পারি না !'

একপাশ থেকে টানা-টানা ভাঙা গলায় কে যেন একটা ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী করে ওঠে :

'গোলামের দল, তোমরা ভুলে যাবে! অন্য লোকের রক্তের দাম কী তোমাদের কাছে?'

আরও কালো আরও নিঃশব্দ হয়ে আসছে চারদিক। গলার শব্দ শুনে দু-একজন পথচারী ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ আওয়াজ করে উঠছে।

একটা জানলা থেকে আলো বেরিয়ে এসে রাস্তার উপর একটা অস্পষ্ট হলদে দাগ ফেলেছিল। সেই দাগের উপর দুটো মূর্তি দেখা যায়। একজন ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে মাটিতে বসে, আর একজন ঝুঁকে পড়েছে তার উপর, যেন তাকে ধরে তুলতে চায়। আর তারপর আবার শোনা যায়, বিষণ্ণ নরম গলায় একজন বলছে:

'গোলামের দল...'

[অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

রাজাধিরাজ দর্শন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একজন কিন্তু সেখানে রাজা আছেন অনেক, কেউ লোহার রাজা, কেউ তেলের রাজা, কেউ ইস্পাতের রাজা। এইসব রাজাদের সম্বন্ধে বহুদিন ধরে মনে মনে বহু জল্পনা-কল্পনা করেছি কিন্তু কোনদিনই তাঁদের চেহারা ও চরিত্রের ঠিক হদিস খুঁজে পাই নি। ভাবতে গেলে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। মনে হয়, এত টাকা যাঁদের, তাঁরা কখনই সাধারণ মানুষের মতন সাধারণ জীব নন্।

নিশ্চয়ই তাঁদের প্রত্যেকের অন্তত তিনটে ক'রে উদর নামক গহ্বর আছে এবং প্রত্যেকের মুখে অন্তত, বত্রিশের জায়গায় একশো বত্রিশটা ক'রে দাঁত আছে। আমার স্পষ্ট ধারণা যে এই সব ক্রোরপতিরা সারাদিন ধরে, ভোর ছটা থেকে নিশীথ রাত্রি পর্যন্ত অবিরাম শুধু খেয়েই চলে, আর যা-তা খাবার নয়···প্রত্যেক খাবারই রীতিমত দামী, মাখন-ভর্তি আস্ত হাঁস-সেদ্ধ, মশলা-ঠাসা আস্ত মুর্গী, ভাল-ক'রে-চোখ-ফোটেনি এমন সব ছোট ছোট শুয়রের বাচ্ছা··· পুডিং, কেক, নানান রকমের সৌখিন মিষ্টান্ন। খেতে খেতে সন্ধ্যের দিকে যখন চোয়াল ধরে যায়, তখন মাইনে-করা নিগ্রো ভৃত্যের ডাক পড়ে, মনিবের হ'য়ে খাবার চিবিয়ে দেবার জন্যে ; সেই চিবানো খাদ্য তখন তিনি চোয়াল না চালিয়ে গিলে খেতে সুরু করেন। কারণ, খেতে তাঁকে হবেই! অবশেষে, খেতে খেতে যখন একেবারে ক্লান্ত অবশ হয়ে পড়েন, তখন ভৃত্যরা এসে ধরাধরি ক'রে বিছানায় শুইয়ে দেয়। পরের দিন সকাল ছ'য়টায় ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসেই আবার সেই খাবার অভ্যস্ত পালা সুরু করেন।

এতখানি প্রাণান্ত চেষ্টা করেও তিনি তাঁর মূলধনেব ওপর যে সুদ বর্তে, তার অর্ধেকও খেয়ে শেষ করতে পারেন না।

অবশ্য, যে-কোন বুদ্ধিমান লোকই বুঝতে পারেন, এ হেন জীবন যাপন করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু উপায় কি? সাধারণ লোক যা খায়, তাই-ই যদি খেতে হয়, তাহ'লে ক্রোরপতি হয়ে কি লাভ বলুন?

আমার মনে হয়, তাঁদের জুতোর গোড়ালি সোনার কাঁটা দিয়ে তৈরি, মাথায় শোলার টুপির বদলে বোধ হয় তাঁরা হীরের ঢাকনা ব্যবহার করেন; তাঁদের জামা অবিশ্যি সবচেয়ে দামী ভেলভেটের তৈরি এবং জামার বহর কম-সে-কম পঞ্চাশ ফিট লম্বা তো হবেই এবং তাতে, ধরুন না কেন, কম-পক্ষে অন্তত শ' তিনেক সোনার বোতাম লাগে। আবার উৎসবের দিন তাঁকে জামার ওপরে জামা, অন্তত আট-টা জামা পরতেই হয়; সেই সঙ্গে অন্তত ছ' জোড়া প্যান্ট লাগে, একটার ওপরে আর একটা। অবশ্য, আপনি বলবেন, বেয়াড়া. এ পোষাক পরে কখনই কেউ স্বস্তি পেতে পারে না। কিন্তু যার এত টাকা, সে কি ক'রে আপনার আমার মত পোষাক পরে বলুন?

আমার মনে হয়, ক্রোরপতিরা যে জামা ব্যবহার করেন, তার পকেট এত সুগভীর যে তাতে অনায়াসে একটা গির্জা, একটা ব্যবস্থা-পরিষদ, একটা সিনেট পুরে রাখা যায়। আমার বিশ্বাস, এ হেন মহাপুরুষের উদর নামক গহ্বরটি রীতিমত একটা বড় জাহাজের খোলের মতন কিন্তু ভেবে উঠতে পারি না, সেই অনুপাতে তাঁর চরণ-দ্বয়ের দৈর্ঘ্য কি হ'তে পারে! তিনি যে লেপের তলায় নিদ্রা যান, তার আয়তন নিশ্চয়ই একবর্গ মাইল অন্ততঃ হবে। ধূমপানের জন্যে তিনি যে তামাক ব্যবহার করেন, নিঃসন্দেহে সে-তামাক শুধু জগতের গুটিকতক বাছা বাছা ক্ষেতেই জন্মায়, যে-সে ক্ষেতের তামাক তিনি তো খেতে পারেন না…এবং একবার পাইপে অন্ততঃ সে-তামাকের দুপাউণ্ড লাগে। একটিপ নস্যি নিতে হয়, অন্ততঃ এক পাউণ্ডে এক টিপ হওয়া দরকার…আরে মশাই, টাকা হয়েছে তো খরচ করবার জন্যেই!

তাঁর আঙুলের ডগা একান্ত স্পর্শসচেতন, যা তা জিনিস তা স্পর্শ করতে পারে না এবং তাঁর আঙুলের একটা অলৌকিক বৈশিষ্ট্য আছে, তাঁর ইচ্ছা-অনুযায়ী তা দীর্ঘ, দীর্ঘতর হ'তে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, যদি নিউইয়র্ক শহরে তাঁর ঘরে বসে দেখতে পান যে সাইবেরিয়ার তুহিন প্রান্তরে হঠাৎ একটা

ডলারের গাছের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ঘরে বসেই, আসন থেকে না উঠে, বেরিং পয়োপ্রণালী ছাড়িয়ে হাত বাড়িয়ে সেই ডলার-লতাটি উপড়ে নিয়ে আসতে পারেন।

এত কল্পনা করা সত্বেও, একটা জিনিস আমি কল্পনা ক'রে উঠতে পারিনি, এই অতিকায় মানুষটির মাথাটা কি রকম দেখতে হবে। কেন যে কল্পনা করতে পারিনি, তার অবশ্য একটা হেতু আছে। প্রত্যেক জিনিস থেকে কি ক'রে নিংড়ে চটকে সোনা বার করা যায়, এই বৃহৎ মাংসপিণ্ডের হলো সেই একমাত্র কাজ, সুতরাং তার দেহের ওপরে মাথা থাকার কি দরকার? এ থেকে অবশ্য বুঝতে পারছেন যে, ক্রোরপতি সম্বন্ধে আমার ধারণা যে খুব বেশী স্পষ্ট ছিল, তা নয়। কল্পনায় একটা আবছা মূর্তি গড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু সেই আবছা মূর্তির একটা অঙ্গ শুধু স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলাম—তাহ'ল তার দুটি হাত। দেখলাম, সেই দুটি হাতের আলিঙ্গনের মধ্যে সারা বিশ্ব ধরা পড়ে গিয়েছে…ধীরে ধীরে সেই আলিঙ্গন-বদ্ধ পৃথিবীকে তার গুহা-সদৃশ অন্ধকার মুখ-গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে…দাঁতের মধ্যে ফেলে তাকে চিবিয়ে গুড়ো করবার চেষ্টা করছে…আর সেই চর্বন-চেষ্টার ফলে সারা মুখ থেকে লালা বিনির্গত হ'য়ে পৃথিবীর মাটির অঙ্গকে কর্দমাক্ত ক'রে তুলছে…একেবারে যে গিলে ফেলবে, তাও পারছে না,…বড্ড গরম…বড্ড ঝাল…

তাই যেদিন সর্বপ্রথম একজন সত্যিকারের ক্রোরপতির সামনে মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হলো, অবাক হ'য়ে গেলাম, দেখলাম আমার সমস্ত কল্পনা ভুল হ'য়ে গিয়েছে…দেখলাম, কি আশ্চর্য, ক্রোরপতিদের চেহারা ঠিক সাধারণ মানুষেরই মতন!

একটা আরাম-কেদারায় আমার সামনেই তিনি বসেছিলেন, দীর্ঘকায় একজন বৃদ্ধ লোক, বয়সে মুখের রংটা তামাটে হ'য়ে গিয়েছে, হাতের চামড়া কুঁকড়ে গিয়েছে, যেমন সব বৃদ্ধ লোকেরই যায় এবং সে-হাতের দৈর্ঘ্য আপনার-আমার হাতের মতনই স্বাভাবিক…দু'টো হাত পেটের উপর রেখে হুজুর আরাম-কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন। গালের মাংস ঝুলে পড়েছে কিন্তু দেখলাম সারা মুখ নিখুঁতভাবে ক্ষুর দিয়ে চাঁচা; নিচের পুরু ঠোঁটটা আলগা হ'য়ে

আপনা থেকে ঝুলে গিয়েছে, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভাল কারিগরের হাতের তৈরি দু'পাটি ঝকঝকে দাঁত…মাঝে মধ্যে এক আধটা সোনার দাঁতও ঝিকমিক করছে। ওপরের ঠোঁটের রং ফ্যাকাশে বিবর্ণ হ'য়ে এসেছে…গোঁফ কামানোর দরুণ ঠোঁটটার রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সরু পাতলা…যেন ভেতর থেকে মাড়ির সঙ্গে কে আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে, কারণ কথা বলবার সময় লক্ষ্য করলাম, সেটা একদম নড়ছে না। চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হ'য়ে এসেছে এবং চোখের ওপর ভ্রূ-তে আজ আর একটীও চুল নেই। মাথার টাক রোদে-পোড়া লালচে হ'য়ে এসেছে, একটীও চুল নেই সেখানেও। সদ্য-জাত শিশুর মুখের মতন, সারা মুখটা যেন বোবা অসম্পূর্ণ। দেখে বোঝা বড় কঠিন, এই জীবটি সবেমাত্র পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে, না, পৃথিবী ত্যাগ করবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে…

পোষাক-পরিচ্ছদেও দেখলাম আমার কল্পনা আমাকে রীতিমত প্রতারিত করেছে। সাধারণ মানুষের মতনই তাঁর পোষাক। সারা দেহের মধ্যে সোনা যেটুকু ছিল, তা ছিল শুধু হাতের একটা আংটিতে, ঘড়িতে আর দাঁতে। সব শুদ্ধ সেই সোনা টুকুর ওজন বোধহয় আধ পাউণ্ডের কাছাকাছি হবে। মোট কথা, দেখলাম, য়ুরোপের বনেদী অভিজাত-বংশের ঘরে যে সব বুড়ো চাকর দেখা যায়, এই ক্রোরপতি ইয়াঙ্কি রাজার চেহারা হুবহু তাদেরই মতন।

যে-ঘরে তিনি আমাকে আহ্বান ক'রে নিয়ে বসালেন, সৌন্দর্য বা বিলাসিতার দিক থেকেও তার কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। বড় জোর বলতে পারি, ঘরের আসবাবপত্রগুলো ভারিক্কি গোছের, এই যা।

কিন্তু যেভাবে সেই সব আসবাবপত্র সাজানো ছিল, তা দেখে মনে হলো, বোধহয় মাঝে মধ্যে এই ঘরের ভেতর হাতী-জাতীয় কোন জীব বেড়াতে আসে।

সৌভাগ্যবশতঃ চোখের সামনে একজন জ্যান্ত ক্রোরপতিকে দেখেও মন কেমন যেন বিশ্বাস করতে চাইছিল না। তাই সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম : 'আপনিই কি…সেই ক্রোরপতি…?'

আত্মপ্রতিষ্ঠ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে তিনি জবাব দিলেন : 'হাঁ, আমিই—!'

তাঁর কথা যে বিশ্বাস ক'রে নিলাম, এইটেই দেখাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মনে মনে স্থির করলাম, তোমার এই ধাপ্পাবাজি এখুনি তোমার সামনেই ভেঙে দিচ্ছি! তোমার সামনেই প্রমাণ ক'রে দেবো, তুমি ক্রোরপতি নও!

তাই জিজ্ঞাসা করলাম: 'সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আপনি কতটা মাংস গলাধঃকরণ করেন?'

গম্ভীরভাবে তিনি জবাব দিলেন: 'আমি মাংস খাই না! তা ছাড়া আমি অতি সামান্যই খাই, দু'এক কোয়া নেবু, একটা ডিম, ছোট এক কাপ চা··· এই মাত্র···'

শিশুর মতন ছোট চোখ দুটো দেখে মনে হ'লো, লোকটা মিথ্যা কথা বলবার কোন চেষ্টাই করে নি। যা বলছে, তা বোধহয় সত্যিই!

একটু যেন ধাঁধায় পড়ে গেলাম। বলে উঠলাম: 'বেশ, তাই যেন হ'লো কিন্তু আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি অকপট চিত্তে স্বীকার করুন, সারা দিনে কতবার এই রকম আহার গ্রহণ করেন?'

শান্তকণ্ঠে তিনি বল্লেন: 'সারা দিনে মাত্র দু'বার। সকালে ব্রেকফাস্ট, সন্ধ্যার ডিনার। আমার পক্ষে তাই-ই পর্যাপ্ত বলে মনে হয়। আর ডিনারের সময় খাই এক প্লেট পাতলা সুপ, সামান্য খানিকটা মুর্গীর মাংস, আর যা হোক্ একটা মিষ্টি। দু'একটা ফল। এক কাপ কফি। আর একটা সিগার···'

আমার বিশ্বাস ক্রমশঃ কুমড়োর মতন বড় হ'য়ে উঠছিল। দেখলাম, আমার দিকে তিনি চেয়ে আছেন, যেন তপস্বীর দৃষ্টি! বিস্ময়ে আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসবার মতন হলো। থেমে খানিকটা দম নিয়ে নিলাম। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলাম:

'কিন্তু, তাই যদি হয়, তাহ'লে আপনার এতটাকা নিয়ে আপনি কি করেন?'

ঘাড়টা দেখলাম একবার নড়ে উঠলো···চোখের মণি দুটো যেন হঠাৎ ঝক্‌মক্ ক'রে জ্বলে উঠলো, বল্লেন:

'টাকা নিয়ে কি করি? যাতে আরো টাকা হয় তার চেষ্টা করি!'

'কিন্তু কিসের জন্যে?'

'আরো বেশী টাকা জমাবার জন্যে !'

'আহা, কিন্তু কিসের জন্যে ?'

বার বার আমার সেই এক প্রশ্নে, দেখলাম, বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলেন :

'তুমি কি পাগল ?'

'আমিও সেই কথা ভাবছিলাম, আপনি কি পাগল ?' জবাব দিই আমি।

মাথা নিচু ক'রে বৃদ্ধ আপনার মনে হেসে ওঠে। তারপর ঘাড় তুলে আমার দিকে চেয়ে বলেন : 'তুমি দেখছি বেশ মজাদার লোক···তোমার মতন লোক আর দেখেছি বলে মনে হয় না !'

ঘাড় তুলে নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, সেই দুটো ছোট চোখ দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে নিতে চেষ্টা করেন। তাঁর শান্ত ভঙ্গিমা দেখে মনে হলো, বৃদ্ধ নিজেকে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে করে। দেখলাম, নেকটাই-এর সঙ্গে একটা পিন গাঁথা রয়েছে···পিনটার ডগায় ছোট্ট এক টুকরো হীরে। রীতিমত দমে গেলাম, হীরেটার সাইজ যদি একটা ছোট বলের মতনও হতো, তাহলে অন্ততঃ বুঝতে পারতাম যে, সত্যিসত্যিই আমার সামনে একজন ক্রোরপতি বসে আছে।

কিছুক্ষণ নীরবে পরস্পর পরস্পরকে পরীক্ষা ক'রে দেখবার পর আমিই জিজ্ঞাসা করলাম : 'এবারে বলুন, সারাদিন আপনি কি করেন ?'

ঘাড়টা ঈষৎ দুলিয়ে বৃদ্ধ শান্তকণ্ঠে ছোট ক'রে জবাব দিলে : 'টাকা তৈরি করি।'

বৃদ্ধের উত্তর শুনে, মনে মনে খুশি হয়েই উঠলাম, এবার তাহলে বুড়োর আসল স্বরূপ ধরা পড়বে। বল্লাম :

'জাল টাকা তৈরি করেন এই বলছেন তো ?'

বৃদ্ধ অবিচলিত কণ্ঠে বলে উঠলো : 'উঁহু, তা কেন ! খুব সোজা ব্যাপার বুঝতে পরেলে না ?···আমার অনেক রেল লাইন আছে। রেলের মালিকও আমি। চাষারা গাঁয়ে গাঁয়ে যে-সব শস্য উৎপন্ন করে, আমার রেল গাড়ীতে সে-সব শস্য আমি বাজারে পৌঁছে দি, তবেই তো মাল বিক্রি ক'রে চাষা টাকা

পায়! তবে, তার সব টাকাটা নিয়ে নিলে চলবে না! দেখতে হবে যাতে অনাহারে সে মরে না যায়, অর্থাৎ খেয়ে পরে কোনমতে বেঁচে থাকবার মতন যেটুকু টাকা তার দরকার, বিক্রির টাকা থেকে অন্ততঃ সেইটুকু সে রাখতে পারে, বাকিটা ভাড়া আর কমিশন বাবদ আমি আদায় করে নি। সোজা ব্যাপার!'

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম: 'তারা খুশি মনে দিয়ে দেয়?'

শিশুর মত সরলভাবে বৃদ্ধ উত্তর দিল: 'সবাই বোধ হয় তা দেয় না! সবাইকে তো খুশি করা যায় না! তাদের মধ্যে দু'একজন বেয়াড়া লোক থাকে···পাগলা···তারা সব সময়ই নাকে কাঁদে!'

সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলে উঠলাম: 'দেশের গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে হাত দেয় না? বাধা দেয় না?'

বৃদ্ধ অবাক হ'য়ে বলে উঠলো: 'বাধা দেবে? কে?'

তারপর হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে দু'একবার আঙুল ঠুকে বলে উঠলো: 'ওঃ, বুঝেছি···বুঝেছি···গভর্ণমেণ্ট বলতে তুমি তাদের কথা বলছো, যারা ওয়াশিংটনে থাকে? না, না, তারা ভারী ভদ্রলোক···অপরের ব্যাপারে কেন তারা মাথা গলাবে? তাছাড়া, তাদের মধ্যে অনেকেই আমার জানাশোনা লোক, একই ক্লাবের মেম্বার আমরা! তবে সব সময় তারা তো ক্লাবে আসে না, তাই তাদের কথা অনেক সময় ভুলেই যাই···তবে, তারা ভদ্রলোক, আমাকে বাধা দেবে কেন?'

কথা শেষ ক'রে বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে:

'তুমি কি বলতে চাও, জগতে এমন কোন গভর্ণমেণ্ট আছে, যা ব্যক্তিগত টাকা রোজগারের ব্যাপারে ভদ্রলোকদের বাধা দেয়?'

বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে আমার কথাটা হয়ত ঠিক বলা হয় নি। তাই শান্তকণ্ঠে বল্লাম: 'না, না, সে-কথা নয়···আমি বলতে চাইছিলাম, প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের উচিত এই জাতীয় প্রকাশ্য ডাকাতি বন্ধ করা!'

বৃদ্ধ সহসা চিৎকার ক'রে উঠলো: 'থামো, থামো, আমি বুঝেছি, তুমি যা

বলছো, তাকে বলে আদর্শবাদিতা…আমাদের দেশে ও-সব নেই। লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হাত দেওয়ার কোন অধিকার আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্টের নেই !'

এই বিশ্ব-অচেতন বৃদ্ধ বালকের নির্বুদ্ধিতার অবিকার স্থৈর্যের সামনে আমি যেন ক্রমশই পরাভূত হয়ে যাচ্ছি, মনে হলো।

তবুও ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম: 'যখন একজন লোক প্রকাশ্যভাবে হাজার লোকের সর্বনাশ করে, সেটা কি ক'রে ব্যক্তিগত ব্যাপার হয় ?'

বৃদ্ধ গর্জন ক'রে উঠলো: 'সর্বনাশ ? কি বলছো তুমি ? সর্বনাশ কাকে বলে, তা তুমি জান ? সর্বনাশ তখনই ঘটে, যখন মজুরী অতিরিক্ত বেড়ে যায় কিম্বা যখন ধর্মঘট হয়। তবে আমাদের একটা বিশেষ সুবিধে আছে, আমাদের দেশে বাইরে থেকে বহু বিদেশী লোক আসে, বিদেশী মজুর। তাদের সাহায্যে আমরা অনায়াসেই চড়া মজুরীর হার নামিয়ে আনি, ধর্মঘটিদের জায়গায় তাদের এনে বসাই। এইসব বিদেশী মজুররাও খুব ভাল, তারা যা পায় তাতেই খুশি। তবে চাইবামাত্রই দরকার মতন বিদেশী মজুরদের যখন পাওয়া যাবে, তখন আর কোন গণ্ডগোলই থাকবে না !'

বলতে বলতে এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ সচেতন হয়ে উঠলো, তা নইলে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল লোকটা যেন বার্ধক্য আর শৈশবের একটা অচেতন সংমিশ্রণ। সরু পাতলা কণ্ঠস্বর চড়ে উঠতেই একটু যেন ফেটে গেল। সেই ফাটা গলায় বৃদ্ধ উত্তেজিতভাবে বলে চল্লো: 'গভর্ণমেণ্টের কথা বলছো ? কথাটা দরকারী সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটা সত্যিকারের ভাল গভর্ণমেণ্ট কম দরকারী জিনিস নয়। সত্যিকারের ভাল গভর্ণমেণ্টের কাজই হলো, আমি যে-সব জিনিস বিক্রি করতে চাই, তা কেনবার মতন উপযুক্ত লোক আর বাজার যেন সব সময় পাই, তার বন্দোবস্ত ক'রে রাখা। যাতে আমার কাজ লোক-অভাবে আটকে না যায়, তার দিকে লক্ষ্য রেখে ঠিক ততটা সংখ্যার মজুর গভর্ণমেণ্টকে জুগিয়ে যেতে হবে, আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে সেই সংখ্যার বেশী মজুর না থাকে। তা হলেই দেখবে দেশে একটাও সোস্যালিস্ট থাকবে না। কোন ধর্মঘট হবে না। তবে ভাল গভর্ণমেণ্টের সব সময়ই আর একটা বিষয়ে

নজর রাখতে হবে, যাতে আমাদের ওপর বেশী ট্যাক্সের চাপ না পড়ে। লোকের কাছ থেকে যা আদায় করবার, তা আমরাই করবো। এই হলো আদর্শ গভর্ণমেণ্ট, বুঝলে?'

লোকটা নিজের মূর্খতায় বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয় এবং নিজের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে এতটুকুও তার সন্দেহ নেই···লোকটা রাজা না হ'য়ে যায় না! নিশ্চয়ই লোহা কি ইস্পাৎ কি তেলের রাজা হবে!

তেমনি আত্মপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বৃদ্ধ বলে চলে: 'আমি চাই, দেশের মধ্যে থাকবে শান্তি আর শৃঙ্খলা! তার জন্যে গভর্ণমেণ্ট কিছু মাইনে দিয়ে নানা জাতের দার্শনিক ভাড়া ক'রে রাখবে, তারা প্রত্যেক রবিবার অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ক'রে জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দেবে, যাতে ক'রে লোকে আইনকে সম্মান ক'রে চলতে শেখে। যখন দার্শনিকদের বক্তৃতায় আর কুলোবে না, তখন গভর্ণমেণ্ট তার সৈন্যদের ডাকতে বাধ্য হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো শান্তি আর শৃঙ্খলা, কি উপায়ে তা সম্ভব হলো, তা দেখবার কোন দরকার নেই; উদ্দেশ্য সফল হওয়া নিয়ে কথা, তা সে যে উপায়েই হোক্। যারা খদ্দের আর যারা মজুর, তারা যাতে আইনকে সম্মান ক'রে চলতে শেখে, সেইটে দেখাই হলো গভর্ণমেণ্টের প্রধান কাজ!'

বক্তব্যের শেষে হাত নেড়ে বৃদ্ধ বলে উঠলো: 'এই তো হলো ব্যাপার!'

মনে মনে বুঝলাম, না, যা মনে করেছিলাম, তাতো নয়! লোকটা তো ততখানি মূর্খ নয়, তাহ'লে কি রাজা নয়?

জিজ্ঞাসা করলাম: 'তাহ'লে আপনি আপনার দেশের প্রচলিত গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে রীতিমত খুশিই বলুন?'

দেখলাম, বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি হঠাৎ কোন উত্তর দিতে চাইল না। খানিকটা ভেবে নিয়ে বল্‌ল: 'গভর্ণমেণ্টের যতটা করা উচিৎ, গভর্ণমেণ্ট ঠিক ততখানি ক'রে উঠতে পারছে না। আমার কথা হচ্ছে, বাইরে থেকে যে-সব বিদেশী লোক আমাদের দেশে আসতে চাইছে, আপাততঃ তাদের আসতে দেওয়া হোক্। তবে আমাদের দেশে অনেক রাজনৈতিক সুবিধা-সুযোগ আছে, তারা যখন সে-সব ভোগ করবে, তখন তার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত মূল্য

আদায় ক'রে নিতে হবে। তাই আমার কথা হলো, বাইরে থেকে যে-সব বিদেশী যুক্তরাষ্ট্রে আসবে, গভর্ণমেন্টের দেখা উচিত, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অন্তত যাতে ক'রে কম পক্ষে পাঁচশ ডলার মতন টাকা থাকে। আর এটা তো বোঝ যে, যার পাঁচশ টাকা আছে, সে, যার পঞ্চাশ টাকা আছে তার চেয়ে দশগুণ ভাল লোক···সোজা অঙ্ক···যারা ভবঘুরে, ভিখিরী, পকেটে-পয়সা-নেই অথচ দাঁও মারবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়, তাদের দিয়ে জগতে কোথাও কোন কাজ হতে পারে না···তাদের দেশে ঢুকতে দেওয়াই অন্যায় !'

প্রত্যুত্তরে বললাম : 'কিন্তু আপনার প্রস্তাব যদি পালন করতে হয়, তাহ'লে বাইরে থেকে আসা বিদেশীদের সংখ্যা যে একেবারে কমে যাবে ?'

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে জানালো : 'তা যাবে বটে। তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই। আর কিছুদিন গেলেই আমি প্রস্তাব করবো, বিদেশীদের আসা পুরোপুরি বন্ধ ক'রে দেওয়া হোক্। ইতিমধ্যে যারা আসবে, তারা যেন সঙ্গে ক'রে অন্তত খানিকটা সোনা নিয়ে আসে। তাতে আমাদের দেশের উপকার হবে। তাছাড়া বাইরে থেকে বিদেশীরা এসেই যে আবদার করবে, আমাদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হোক্, সেটী চলবে না···নাগরিক অধিকার পেতে হ'লে যে-সময় এখন বরাদ্দ আছে, আমার মতে সে-সময় আরো বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমেরিকানদের জন্যে যারা কাজ করতে চায়, তাদের অবশ্য সে-সদিচ্ছায় আমি বাধা দিতে চাই না, কিন্তু তাই বলেই যে তাদের আমেরিকান নাগরিকের অধিকার দিতে হবে, তার কোন মানে নেই। এমনিতেই তো আমরা অনেক বিদেশীকেই এই অধিকার দিয়ে ফেলেছি—। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে তারাই যথেষ্ট।···গভর্ণমেন্টের লোকদের বড় বড় শিল্পের অংশীদার হওয়া উচিত ব'লে আমি মনে করি। কারণ, তাহ'লে দেশের স্বার্থ তারা খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজেই বুঝতে পারবে।···

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বৃদ্ধ বলে উঠলো : 'ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের আমার মতে টানবার জন্যে কিছু সোনা আমাকে এখন খরচ করতে হয়···নিরুপায়···সোনার পাহাড়ের চূড়োয় না দাঁড়ালে জীবনকে সম্পূর্ণরূপে দেখা বা বোঝা যায় না ?'

বৃদ্ধের রাজনৈতিক মতামত যে কি, তা বুঝতে আর বাকি রইলো না। তাই এবার কৌতূহল হলো, ধর্ম সম্বন্ধে বৃদ্ধের মতামত জানবার জন্যে। তাই জিজ্ঞাসা করলাম : 'ধর্ম সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে পারি কি?'

সজোরে নিজের কনুই-এর ওপর চপেটাঘাত ক'রে উৎসাহিত হ'য়ে বৃদ্ধ বলে উঠল : 'ধর্ম! নিশ্চয়ই ধর্ম হলো জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। ধর্ম না হ'লে জনসাধারণের চলতেই পারে না, একথা আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি···বিশ্বাস করি বল্‌লে সবটুকু বলা হলো না, প্রত্যেক রবিবার গির্জাতে গিয়ে আমি নিজেই ধর্ম-প্রচার করি···হাঁ, হাঁ সত্যি সত্যি করি!'

জিজ্ঞাসা করলাম : 'গির্জায় কি বলেন লোকদের?'

গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৃদ্ধ বলে উঠল : 'একজন ধর্মনিষ্ঠ ক্রিশ্চান গির্জায় গিয়ে যা কিছু বলতে পারে, সবই বলি! অবশ্য আমি যে-গির্জায় ধর্ম-প্রচার করি, সেটা ছোট গির্জা, সেখানকার লোকেরা বড়ই গরীব বেচারা, তাদের যদি দু'একটা দয়ার কথা বলা যায়, বাপের মত যদি দু'একটা উপদেশ দেওয়া যায়, তারা কৃতার্থ হ'য়ে যায়!'

গরীবদের কথা বলতে বলতে বৃদ্ধের মুখে যেন শিশু-সুলভ কোমলতা ফুটে উঠল, পাতলা ঠোঁট চেপে ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে চেয়ে রইলেন, সেখানে দেখলাম কোন আধুনিক চিত্রকরের আঁকা মদনদেবের ছবি রয়েছে··· মদনদেব নগ্ন-দেহ তরুণীদের প্রেমশর বিদ্ধ করছেন, আর তরুণীরা লজ্জায় তাদের ইয়র্কশায়ার শূকরীর মতন পীতাভ দেহকে ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করছে।

আমার অনুরোধের অপেক্ষা না করেই বৃদ্ধ উচ্ছ্বাসভরে বলতে সুরু করল, প্রতি রবিবার গির্জায় কৃপা-পরবশ হ'য়ে তিনি দরিদ্র গ্রামবাসীদের যে ধর্মোপদেশ দিয়ে থাকেন :

'যিশুর নামে হে আমার ভ্রাতা আর ভগ্নীগণ! সাবধান, তোমাদের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে হিংসার দানব, দেখো, তার চাতুরী-জালে যেন জড়িয়ে পড়ো না···বড় চতুর সে-দানব। তাই জাগতিক জিনিসের সমস্ত লোভ পরিত্যাগ করো। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কোন স্থিরতা নেই তার। একটু অসাবধান

হয়েছ কি যন্ত্রে তোমার হাত গুঁড়িয়ে যাবে, একটু অনিয়ম করেছ কি সর্দি-গরমিতে মারা যাবে। তাই জুডাসের দাদা, সন্ন্যাসী জেমস্ সত্যই বলে গিয়েছেন, অহো, দরিদ্র লোক হলো সেই অন্ধ ব্যক্তির মতন যে একা তেতলার ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে, যেদিকেই পা বাড়াক না কেন, নিশ্চয়ই পড়ে মরবে! তাই ভাইরা আমার, এ-জীবনের জন্যে কিছু সঞ্চয় করবার চেষ্টা ক'রো না, এ-জীবন হলো শয়তানের কারসাজি। তোমার রাজত্ব তোমার জন্যে অপেক্ষায় রয়েছে স্বর্গলোকে, সেখানে তোমাদের সকলের পিতা তোমাদের জন্যে দু' বাহু বাড়িয়ে অপেক্ষা ক'রে রয়েছেন। যদি তোমরা ধৈর্য ধরে, একান্ত নিষ্ঠা-সহকারে এই জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনাকে অম্লানবদনে সহ্য ক'রে চলে যেতে পারো, তাহ'লে নিশ্চয়ই জেনো, জীবনের পরপারে তোমাদের পরম পিতা তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন তোমাদের জন্যে! ভগবান যে বেদনার ক্রস বহন করবার জন্যে তোমাদের দিয়েছেন, ধৈর্য-সহকারে তা বহন কোরো, কখনো তার বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে যেয়ো না! নিশ্চয়ই জেনো, ভগবান স্বয়ং তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমাদের ভাবনা কি?'

বৃদ্ধের সোনালী দাঁতটা ঝক্‌মক্ ক'রে উঠলো···বিজয়ী বীরের মতন গর্বভরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বললাম: 'ধর্মকে তাহ'লে দেখছি, আপনি বেশ কাজে লাগিয়েছেন?'

আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বৃদ্ধ গর্বভরেই বলে উঠলেন:

'নিশ্চয়ই! ধর্মকে কাজে লাগাব না তো, কি? ধর্মের চেয়ে বড় জিনিস আছে? বিশেষতঃ, দরিদ্রের কাছে? ধর্ম ঠিক কথাই বলে, এই পৃথিবীর যা কিছু জিনিস, সমস্তই হলো শয়তানের সম্পত্তি। মানুষ যদি তার আত্মাকে বাঁচাতে চায়, তাহ'লে তাকে শয়তানের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতেই হবে! তার জন্যে হয়তো পৃথিবীতে তাকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু তার জন্যেই তো পরলোকে সে চরম পুরস্কার পাবে! মৃত্যুর পর, জীবনের পরপারে, মানুষের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে তার সব আনন্দ। যে-মানুষ এই-বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে, সে মানুষের সঙ্গে চলা-ফেরা করতে কোনই অসুবিধা হয় না। যন্ত্র ভালভাবে চালাতে হ'লে তার চাকায় নিয়মিত তেল দেওয়া দরকার···নইলে

যন্ত্র বিগড়ে যাবে, বিদঘুটে সব আওয়াজ বেরুবে, অচল হয়ে পড়বে···ধর্মই হ'ল সেই তেল যার সাহায্যে জীবন-যন্ত্রের চাকা মসৃণ চলে—

এতক্ষণ পরে মনে মনে স্থির বুঝলাম, লোকটা রাজা না হ'য়ে যায় না !

জিজ্ঞাসা করলাম :

'আপনি কি সত্যিসত্যিই নিজেকে ক্রিশ্চান ব'লে মনে করেন ?'

পূর্ণ-বিশ্বাসের জোরে বৃদ্ধ বলে উঠলেন :

'নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই আমি ক্রিশ্চান। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও আমি ভুলি না যে আমি একজন আমেরিকান্।'

সন্দিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম :

'আপনার ঐ কিন্তুটির তাৎপর্য তো ঠিক বুঝছে পারলাম না ! একটু বুঝিয়ে বলবেন ?'

বৃদ্ধ নাটকীয় ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বর নিচু ক'রে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন :

'কিন্তু এখন যা বলবো, সেটা শুধু তোমার আর আমার মধ্যেকার কথা··· বাইরের পাঁচজনকে বলবার নয়···একজন আমেরিকানের পক্ষে যিশুকে স্বীকার করা অসম্ভব ব্যাপার !'

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমিও বলে উঠলাম :

'হাঁ, অসম্ভবই !'

বৃদ্ধ তেমনি নিম্ন কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন : 'সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই !'

বৃদ্ধের মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর জিজ্ঞাসা করলাম :

'কিন্তু কেন ?'

বৃদ্ধের চোখের কোণে যেন একটা অর্থপূর্ণ হাসির ঝিলিক দেখা দিল। দাঁতে দাঁতে চেপে বৃদ্ধ বল্লেন : 'যিশু জন্মেছিলেন···বিবাহের বাইরে !'

সারা ঘরটার মধ্যে দৃষ্টিটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বলে উঠল : 'যা বল্লাম তার অর্থ বুঝেছ কি ? যে লোক বিবাহিত পিতা-মাতার সন্তান নয়, সে-লোক আমাদের আমেরিকায় কোন রাজপদে বসবার অধিকারী নয়, দেবতা হওয়া তো দূরের কথা। কোন ভদ্রসমাজে

কেউ তাকে অভ্যর্থনা করবে না। কোন ভদ্রকুমারী মেয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। নিশ্চয়ই! এসব ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত কঠোর, এতটুকু নীতির এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। বোঝ না কেন, যদি যিশুখৃষ্টকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, তাহ'লে তো সমস্ত অবৈধ সন্তানকেই ভদ্র বলে স্বীকার ক'রে নিতে হয়!···বাপ নিগ্রো, মা আমেরিকান্, এমন অনেক ছেলে আমাদের দেশে আছে···তাদের তো আমরা ভদ্রসমাজে গ্রহণ করিতে পারি না—। আর যদি করতে হয়, তাহ'লে অবস্থাটা কি সাংঘাতিক দাঁড়ায় বল তো?'

অবস্থাটা যে সেক্ষেত্রে কতদূর সাংঘাতিক হবে, তা বৃদ্ধের চোখটা সহসা প্যাঁচার চোখের মতন গোল হয়ে যাওয়াতে বুঝতে পারলাম। রীতিমত চেষ্টা ক'রে তলার ঠোঁটটা টেনে তুলে, বৃদ্ধ দাঁত দিয়ে চেপে ধরে থাকে। বৃদ্ধের ধারণা, সেইভাবে মুখ-রেখাকে পরিবর্তিত করার দরুণ তাঁকে রীতিমত গম্ভীর আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখাচ্ছিল।

এই গণতান্ত্রিক দেশের নীতিধর্মের কথা শুনে বুকের ভেতর কি যেন মোচর দিয়ে উঠছিল। তাই জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলাম:

'আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, আপনারা স্পষ্টতই নিগ্রোদের মানুষ বলে অস্বীকার করতেই চান?'

আমার প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ যেন আমার সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে পড়লেন। বল্লেন:

'আচ্ছা গোলমেলে লোক তো তুমি হে! আরে, নিগ্রোরা যে কালো! গায়ে বিদ্ঘুটে দুর্গন্ধ! যখনি আমরা খবর পাই যে কোন নিগ্রো কোন আমেরিকান্ মেয়েকে বিয়ে করবার আয়োজন করেছে, তখনি আমরা সেই নিগ্রোকে 'লিঞ্চ' করি। বেটার গলায় দড়ি বেঁধে, তার বাড়ীর কাছাকাছি ল্যাম্প-পোষ্টে ঝুলিয়ে দিই। এতটুকু দেরী করলেই বিপদ। তোমাকে তো বলেছি···নীতির কথা যেখানে, সেখানে আমরা অত্যন্ত কঠোর—'

এতক্ষণ পরে আমার স্পষ্ট ধারণা হলো, যে-মানুষটির সামনে আমি বসে আছি, সেটি কোন জীবন্ত প্রাণী নয়···একটা গলিত শব-দেহ···তার ভয়াবহ দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগছে। সেখান থেকে উঠে যাওয়াই হতো স্বাভাবিক, কিন্তু

আমি উঠতে পারলাম না…একটা বিশেষ কাজের ভার নিয়েই আমাকে আসতে হয়েছে এবং সে-কাজটি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি আমাকে সমাধা করতে হবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ ক'রে উঠবার জন্যে আমার বক্তব্য দ্রুত উত্থাপন করতে লাগলাম।

'সাম্যবাদীদের সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?'

দুই হাঁটুর ওপর সজোরে দুটি চপেটাঘাত ক'রে বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে উঠলেন :

'ওরাই তো হলো শয়তানের আসল বান্দা ! জীবন-যন্ত্রে ওরাই তো হলো বালি…বালির মত সূক্ষ্মভাবে যন্ত্রের ভেতর সব জায়গায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে যন্ত্র আর চলতে চায় না। তাই ভাল গভর্ণমেন্ট চালাতে গেলে, একটিও সাম্যবাদী থাকলে চলবে না। তবে বিপদের কথা হলো, আগে বাইরে থেকে ওরা আমদানী হতো, এখন আমেরিকার মাটি থেকেই ওরা জন্মাচ্ছে। তা থেকে একটা কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে, আজকাল ওয়াশিংটনে যারা গভর্ণমেন্টের কাজ চালাচ্ছে, তারা ঠিক কাজের লোক নয়। তা যদি হতো, তাহ'লে কবে এই সব সাম্যবাদীদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিতো ! সাম্যবাদীদের কোন মতেই নাগরিক অধিকার দেওয়া চলতে পারে না। গভর্ণমেন্ট যারা হাতে-নাতে চালায়, তাদের সঙ্গে জীবনের আরো ঘনিষ্ট পরিচয় থাকা দরকার, যেমন ধারা ঘনিষ্টভাবে ক্রোরপতিরা জীবনকে জানে বা চেনে। সেইজন্যে আমার বিশ্বাস, গভর্ণমেন্ট যারা চালাবে, তাদের প্রত্যেককেই ক্রোরপতি হওয়া উচিত। আমার কথাটা বুঝলে ?'

বল্‌লাম : 'আপনাকে বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না। আপনার মতের মধ্যে কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা নেই।'

বৃদ্ধ মহা-উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠলেন : 'ঠিক বলেছ ! ঠিক !'

এই অবকাশে বল্লাম : 'আপনাকে আর গুটিকতক প্রশ্ন করবো !'

বৃদ্ধ খুশি হ'য়ে সম্মতিদান করলেন। ঠিক করলাম, এবার আর্ট সম্বন্ধে দু' একটা প্রশ্ন করবো। তাই বল্‌লাম : 'আপনার ধারণায় আপনি—'

উল্লাসের আধিক্যে বৃদ্ধ আমাকে প্রশ্ন শেষ করতেই দিলেন না। তিনি

ধরে নিলেন আমি সেই সাম্যবাদীদের কথাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করছি। তাই বলে উঠলেন :

'আরে ধারণা-টারনা নয়। সাম্যবাদীগুলোর মাথায় আছে শুধু নাস্তিকতা···আর পেটের মধ্যে আছে অরাজকতা। শয়তান নিজের হাতে তাদের মনের সঙ্গে দুটো ডানা জুড়ে দিয়েছে, একটা হলো পাগলামীর আর একটা হলো বাঁদরামির ডানা! এই সাম্যবাদীগুলোকে ঠাণ্ডা করবার জন্যেই আমাদের দরকার, আরো বেশী ক'রে ধর্মের আলোচনা করা এবং সেই সঙ্গে দরকার আরো বেশী সৈন্যের! ধর্ম দিয়ে তাদের নাস্তিকতা দূর করতে হবে। আর সৈন্য দিয়ে তাদের অরাজকতা ভাঙতে হবে। প্রথমে অবশ্য চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে, সাম্যবাদীদের মগজ বাইবেলের উপদেশের সিসে ঢুকিয়ে ভরাট করা যায় কি না; যদি সে-পরীক্ষায় কোন কাজ না হয়, অগত্যা তখন সৈন্যদের দিয়ে তাদের বুকে পিঠে এবং পেটে সিসের গুলি ঢোকাতে হবে!'

কথা শেষ ক'রে বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে সম্মতি-লাভের আশায় কটমট ক'রে চেয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন :

'শয়তানের ক্ষমতার সীমা-পরিসীমা নেই!'

বৃদ্ধকে অনুমোদন করেই বল্‌লাম : 'সত্যি, তাই!'

জীবনে এই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে আমার চোখের সামনে দেখলাম, সেই পীত-দানব, স্বর্ণ যার আর এক নাম, তার সুগভীর মর্মান্তিক প্রভাব। মিথ্যা আর ব্যভিচারের জন্মদাতা সেই পীত-জনকের নির্মম হিম নির্দেশে দেখলাম বৃদ্ধের শুষ্ক বাতগ্রস্ত শ্লেষ্মাতুর দেহ যেন সহসা সতেজ হ'য়ে উঠল, পুরানো জীর্ণ চামড়ার খোলসে আবদ্ধ সেই বিশীর্ণ দেহ, রাবিশের ভগ্নস্তূপ, যেন চকিতে প্রাণ-চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। বৃদ্ধের গোল গোল রক্ত-হীন দুই চোখ যেন দুটো নতুন স্বর্ণ-মুদ্রার মতন ঝিকমিক ক'রে উঠলো, তাঁর জীর্ণ দেহে যেন নতুন শক্তি ফিরে এল।

এবার সোজা প্রশ্ন করলাম : 'আর্ট সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?'

আমার দিকে চেয়ে, হাত দিয়ে সারা মুখটা থেকে বিরক্তির চিহ্ন যেন মুছে নিয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলেন :

'কি বলছো বুঝতে পারলাম না?'

বল্‌লাম :

'আর্ট সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?'

বৃদ্ধ স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন :

'আর্ট সম্বন্ধে ধারণা ? না, না, আর্ট নিয়ে কোন ধারণা-টারনা আমার নেই···আমি শুধু আর্ট কিনি···বুঝলে ?'

বললাম :

'তা বুঝি। কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনার নিজস্ব একটা মত আছে··· একটা স্বতন্ত্র দাবী আছে···?'

'দাবী ? তা আছে বই কি ! আর্ট বলতে আমি কি চাই, তার একটা ধারণা আমার আছে বৈকি ! আর্টের কাছে আমার একমাত্র দাবী হলো, আমার ক্লান্তির সময়ে, আমার অবসাদের সময়ে আর্ট আমাকে যোগাবে খানিকটা তৃপ্তি, খানিকটা মজা, যাতে ক'রে প্রাণখুলে একটু হাসতে পারি। জানই তো, আমরা চব্বিশঘণ্টা যে ব্যবসা নিয়ে থাকি, তাতে হাসবার মতন কিছুই থাকে না। মস্তিষ্ক চব্বিশঘণ্টা তো কাজ ক'রে যেতে পারে না ! মাঝে মাঝে তার একটু ছুটি দরকার···এমন একটা জিনিসের দরকার যাতে ক্লান্ত মস্তিষ্ক খানিকটা বিশ্রাম পায় আর ক্লান্ত দেহ পায় খানিকটা উত্তেজনা। এই যে আমার ঘরের দেয়ালে চারদিকে দেখছ ছবি আঁকিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি, এ হলো সেই ক্লান্তি দূর করবার জন্যে। তা ছাড়া ছবির একটা বড় সার্থকতা হলো, বিজ্ঞাপনে। যত রঙ-চঙে ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন সাজানো যাবে, ততই লোককে তা আকৃষ্ট করবে···তাই বিজ্ঞাপনের ছবিতে এমনভাবে রঙ দিতে হবে, যাতে এক মাইল দূর থেকেও লোকের নজর তার ওপর গিয়ে পড়ে··· সেইখানেই হলো আর্টের সার্থকতা···তার আসল মূল্য। মূর্তি বা ফুলদানি জাতীয় যে-সব আর্টের জিনিস তৈরি হয়, সে-সব সম্বন্ধে আমার মত হলো, সেগুলো মোটেই পাথর দিয়ে তৈরি করা উচিত নয়, পাথরের বদলে ব্রোনজ্‌ ব্যবহার করা উচিত, কেন না পাথরের জিনিস চাকর-বাকরেরা প্রায়ই ভেঙ্গে ফেলে। খেলাধূলোর ব্যাপারে যদি জিজ্ঞাসা করো, তাহ'লে বলবো, মুর্গীর

লড়াই আর ইঁদুর শিকার, দুটোই খুব আর্টিষ্টিক ব্যাপার। লণ্ডনে আমি অনেকবার দেখেছি…চমৎকার! বক্সিংও মন্দ নয়, বেশ উত্তেজনা পাওয়া যায়…তবে শেষ পর্যন্ত যাতে কেউ কাউকে না মেরে ফেলে সেটা দেখতে হবে… ঘুষোঘুষি ভালো কিন্তু মারামারি ভাল নয়। বাকী থাকে সঙ্গীত…আমার কথা হলো, সঙ্গীত এমন হওয়া চাই, যাতে স্বদেশপ্রেম জেগে ওঠে। সেই জন্যে মার্চ-সঙ্গীত হলো সেরা সঙ্গীত, তার মধ্যে আবার আমেরিকান সৈন্যদের মার্চ-সঙ্গীত জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়। আমেরিকানরা হলো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাত, তাই তাদের সঙ্গীতও হলো জগতে শ্রেষ্ঠ। আমেরিকানরা হলো জগতের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী জাত, কেন না তাদেরই আছে সকলের চেয়ে বেশী টাকা। আমাদের যত টাকা আছে, জগতের আর কোন জাতের তা নেই। তাই দেখবে, খুব শিগ্‌গিরই জগতের আর সব জাত একে একে আমাদের দরজাতেই আসবে…'

এই রোগগ্রস্ত দুর্বল শিশুটির নিশ্চিন্ত কল-কাকলি শুনতে শুনতে কৃতজ্ঞ-চিত্তে ভেসে উঠলো তাসমানিয়ার বুনো অসভ্যদের কথা। শোনা যায় তারাও বলে নরখাদক, কিন্তু তাদেরও সৌন্দর্য-জ্ঞান এই-বৃদ্ধ-শিশুটির চেয়ে পরিমার্জিত ও উন্নত।

বুঝলাম বৃদ্ধকে বাধা না দিলে বৃদ্ধ তাঁর স্বদেশ-প্রেমের উচ্ছ্বাসেই মেতে থাকবেন। তাই জিজ্ঞাসা করলাম:

'আপনি কি থিয়েটার দেখতে যান?'

বৃদ্ধ সচকিত হ'য়ে বলে উঠলেন:

'হাঁ, হাঁ, থিয়েটারও একটা আর্ট বটে—যাই বইকি মাঝে মাঝে!'

জিজ্ঞাসা করলাম: 'সেখানে কোন্ জিনিসটা আপনার ভাল লাগে!'

বৃদ্ধ সহজভাবেই জবাব দিলেন: 'আমার সত্যি খুব ভাল লাগে যখন ষ্টেজের ওপর সুন্দরী সব মেয়েরা বুক-আলগা জামা পরে নাচতে সুরু করে… ওপরের বক্স থেকে দেখতে ভারী মজা লাগে!'

বললাম: 'সেকথা নয়, আমার জিজ্ঞাসা হলো, রঙ্গমঞ্চের কোন্ জিনিসটা আপনাকে আকর্ষণ করে!'

বৃদ্ধ কোনরকম চিন্তা না করেই অবলীলাক্রমে জবাব দিলেন :

'কেন ? রঙ্গমঞ্চের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে তরুণী অভিনেত্রীরা—এতো সবাই জানে। যে থিয়েটারে সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রীর সংখ্যা বেশী, সেই থিয়েটারই ভাল। তবে, একটা বড় অসুবিধা হয়, তাদের সাজ-সজ্জা দেখে বাইরে থেকে বোঝা বড় কঠিন, কোন্ অভিনেত্রী সত্যি তরুণী, কোন্ অভিনেত্রী তরুণী নয়। এমন সেজে-গুঁজে বেরোয়, ধরবার উপায় নেই। ঐটেই নাকি ওদের আর্ট ! অভিনয় দেখে, তুমি মনে মনে ভাবছো : বাঃ, দিব্যি অল্প-বয়সের মেয়েটি—কিন্তু খোঁজ-খবর নিয়ে শেষকালে জানলে যে তার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে আর তার প্রায় দুশোর ওপর প্রেমিক আছে। তখন কি রকম বিশ্রী লাগে বলতো ? আমার মনে হয়, সেইজন্যে থিয়েটারের অভিনেত্রীদের চেয়ে সার্কাসের মেয়েরা ঢের ভাল—তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রীতিমত তরুণী আর তাদের দেহের গড়ন, বুঝেছ, বেশ আঁটসাঁট…'

বুঝলাম : এতক্ষণ পরে বুড়ো যে-বিষয় নিয়ে কথা বলছেন, সে-বিষয়ে তিনি রীতিমত একজন পণ্ডিত লোক। আমি যে আমি, যৌবনে যে কামনার পাঁক দু'হাতে ঘেটেছে, আমিও এই ব্যাপারে বৃদ্ধের কাছে নতুন কিছু শিখতে পারি।

অবশেষে জিজ্ঞাসা করলাম :

'কাব্য আপনার কেমন লাগে ?'

'কাব্য ?' জুতোর দিকে চোখ নামিয়ে, মুখ কাঁচুমাচু ক'রে কয়েকমুহূর্ত কি যেন ভেবে নিলেন। তারপর বললেন : 'কবিতার কথা বলছো তো ? কবিতা আমার খুবই ভাল লাগে। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক ব্যবসায়ী যদি কবিতায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে থাকে, তাহ'লে খুব ভালই হয় !'

আর বিলম্ব না ক'রে পরবর্তী প্রশ্ন উত্থাপন করলাম :

'কোন্ কবি আপনার সবচেয়ে প্রিয় ?'

আমার প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ যেন বেশ বিব্রত ও বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়লেন। সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কি বলতে চাইছো ?'

আমি আবার প্রশ্নটা বললাম।

সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নেড়ে বৃদ্ধ বলে উঠলেন :

'হুম্…তুমি দেখছি, আচ্ছা মজার লোক! কবি আবার আমার প্রিয় হ'তে যাবে কেন? আর, পাঁচটা কবি থেকে একজনকেই বা কেন আলাদা ক'রে আমি ভালবাসতে যাবো? একি উদ্ভট প্রশ্ন তোমার?'

কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললাম : 'আমার অপরাধ স্বীকার করছি! ক্ষমা করবেন…আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইছি, আপনার চেক-বই ছাড়া অন্য আর কোন্ বইটা আপনার খুব ভাল লাগে?'

বৃদ্ধ এতক্ষণে যেন হদিস পেলেন। বললেন : 'আহ্, তাই বলো! সারা দুনিয়ায় দুটি বই আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়, একখানি হলো বাইবেল, আর একখানি হলো আমার অফিসের লেজার বই। আমার মনের দিক থেকে, এই দুখানি বই-ই সমান দামী, এই দুখানি বই হাতে নিলেই আমার মন-প্রাণ সমান অনুপ্রেরণায় ভরে ওঠে—'

হঠাৎ কেন জানি না, মনে হলো, বুড়ো বোধহয় আমাকে ঠাট্টা করছে। কিন্তু সেই শিশুর মতন নির্বিকার মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, বৃদ্ধ ঠাট্টা করে নি, তাঁর অন্তরের সত্যিকারের অনুভূতির কথাই বলেছে।

নথ খুঁটতে খুঁটতে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন :

'সত্যি! দু'খানি বই-ই চমৎকার! একখানি বই লিখেছিলেন প্রাচীন জগতের প্রেরিত-পুরুষেরা, আর, দ্বিতীয়খানির স্রষ্টা আমি নিজে। আমার বইতে অবশ্য তুমি কথা খুব কমই পাবে। শুধু সংখ্যা আর সংখ্যা। সেই সংখার সমারোহ থেকে তুমি বুঝতে পারবে, একজন লোক যদি নিষ্ঠা সহকারে পরিশ্রম করে, তাহ'লে সে কি করতে পারে। আমার মৃত্যুর পর গভর্ণমেণ্ট যদি আমার সেই লেজার বইখানি ছাপায়, তাহ'লে জগতের অনেক কল্যাণ হবে। লোকে একটা মহৎ দৃষ্টান্ত পাবে, কি ক'রে সামান্য অবস্থা থেকে নিজেকে উন্নত করা যায়।'

মনে হলো এই সাক্ষাৎকার আর বেশীক্ষণ চালানো যুক্তিযুক্ত নয়। আমার মস্তিষ্ককে আর বেশীক্ষণ এমনিভাবে বিমর্দিত করতে দিলে, মস্তিষ্কের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

তাই শেষ প্রশ্ন স্বরূপ জিজ্ঞাসা করলাম :

'আপনি অনুগ্রহ ক'রে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার মতামতটা যদি একটু জানান, তাহলে বিশেষ বাধিত হবো।'

'বিজ্ঞান ? হাঁ, সে-সম্বন্ধে আমার বলবার অনেক কিছুই আছে··· বিজ্ঞানের বই···তাতে যদি আমেরিকার কথা থাকে, তাহ'লে বুঝবে, বিজ্ঞান হিসাবে সেই বইটার মূল্য আছে। তবে কি জানো, এইসব বইতে সত্যি কথা খুব কমই লেখা থাকে। তার কারণ, এইসব বই যারা লেখে, সাহিত্যিক আর কবি, তারা শুনেছি টাকা-পয়সা তেমন কিছু রোজগার করতে পারে না। অল্পই তাদের আয়। যে-দেশে সবাই যে-যার কাজকর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে চব্বিশঘণ্টা ব্যস্ত, সেখানে লোকে এইসব বই পড়বার বাজে সময় পাবে কোথা থেকে, বল ? শুনেছি, সেইজন্যে সাহিত্যিকরা নাকি ভয়ানক চটে যায়, তাদের বই বিক্রি হয় না বলেই তাদের যত রাগ। আমার বিশ্বাস গভর্ণমেণ্টের উচিত, এইসব সাহিত্যিকদের দিকে নজর দেওয়া যাতে তারা দুটো পয়সা পায়। যে-মানুষের পেট ভর্তি থাকে, সে-সাধারণতঃ চটে যায় না, ভাল মিষ্টি কথা তখন তার মুখ থেকে আপনা হতেই বেরুবে। আমেরিকার সম্বন্ধে যদি বই লেখার প্রয়োজন হয় তবে মোটা টাকা দিয়ে ভাল ভাল লিখিয়েদের ভাড়া করলেই হয়। তখন দেখবে ভাল ভাল বই লেখা হয়ে যাবে।'

আমি শুধু বললাম : 'বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার ধারণা দেখছি বড়ই সংকীর্ণ !'

দু'চোখ বুজে বৃদ্ধ যেন কি ভেবে নিলেন। তারপর বলে উঠলেন :

'বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাইছো ! আমি জানি শিক্ষক দার্শনিক, আরো সব কারা কারা আছে তারাও বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করে···অধ্যাপকরা আছে, ডেন্টিষ্টরা আছে, ধাত্রীরা আছে···তারা সবাই বিজ্ঞান নিয়ে কারবার করে···হাঁ···হাঁ···উকিলরা, ইন্‌জিনিয়াররা, ডাক্তাররা···তাদের সকলের বিজ্ঞানই ভাল···তাতে অনেক লোকের অনেক উপকার হয়। আমার মেয়েকে যে শিক্ষক পড়ায়, তার কাছে একদিন শুনলাম, সামাজিক বিজ্ঞান বলে নাকি একটা নতুন বিজ্ঞান হয়েছে··· ওসব বিজ্ঞান আমি বুঝি না···আমার মনে হয়

ঐসব বিজ্ঞানের জন্যেই যত গোলমাল আর ঝগড়া-ঝাটি হয়। যে-লোকটা সাম্যবাদী, সে কখনই ভাল বিজ্ঞান তৈরি করতে পারে না। গভর্ণমেন্টের দেখা উচিত, যাতে সাম্যবাদীরা বিজ্ঞানকে নিয়ে নষ্ট না করে। যে-সে লোক বিজ্ঞানকে নিয়ে যেন নাড়াচাড়া করতে না পারে। ধর না কেন, এডিসনের কথা…তিনি যে সব বিজ্ঞানের কাজ করেন, প্রত্যেকটি ভাল, প্রত্যেকটি মানুষের কাজে আসে…গ্রামোফন. ক্যামেরা, সিনেমা…এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে সব মানুষেরই কাজ হয়। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে শুধু শুধু একগাদা বই…সে শুধু জঞ্জাল বাড়ানো। যে-সব বই পড়ে মাথায় শুধু সন্দেহই ঢোকে, সে-সব বই লোকের পড়া উচিত নয়, মোটেই নয়।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বৃদ্ধ বলে উঠলেন : 'একি। চলে যাচ্ছো নাকি?'

বল্‌লাম : 'হাঁ! কিন্তু যাবার মুখে আপনাকে শেষ কথা জিজ্ঞেস ক'রে যেতে চাই।…আপনি বলতে পারেন এইভাবে ক্রোরপতি হওয়ার কি সার্থকতা?'

বৃদ্ধ অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। বল্‌লেন : 'ক্রোরপতি হওয়া? সেটা হলো একটা অভ্যাস!'

অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম : 'অভ্যাস?—'

'হাঁ, ক্রোরপতি হওয়া…একটা অভ্যাস বই কি!'

'তাই যদি হয়, তাহলে আপনি কি বলতে চান, মাতাল, আফিংখোর আর ক্রোরপতিরা একই পর্যায়ের লোক?'

বৃদ্ধের দুটো চোখ যেন দু'টুকরো কয়লার মতন জ্বলে উঠলো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধ বললেন :

'দেখছি, তুমি একটা অসভ্য অশিক্ষিত লোক…কথা বলতে জানো না!'

'তাই হবে! বিদায়!'

এই বলে হন্ হন্ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে পা বাড়ালাম। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি, বৃদ্ধের যেন কি একটা দরকারী কথা মনে পড়ে গিয়েছে, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে, নিজেই আমার কাছে এগিয়ে এলেন।

কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

'শুনেছি, তোমাদের য়ুরোপে নাকি অনেক বাড়তি রাজা আছে ? যাদের আর দরকার নেই তোমাদের ?'

বললাম : 'তাদের একজনকেও আর আমাদের দরকার নেই !'

বৃদ্ধ উত্তর শুনে খুশি হয়েই বললেন :

'তা ভাল ! তুমি এক কাজ করতে পার ? কমিশন পাবে—তোমাদের য়ুরোপ থেকে গোটাকতক রাজা এখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পার ?'

'কেন ?'

বাড়ীর সামনে খানিকটা খোলা জায়গা পড়েছিল। আঙ্গুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন : 'ঐ খোলা জায়গায় তাহ'লে একটা বকসিং খেলার তাঁবু তুলে দি ? প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা লাঞ্চের পরে একঘন্টা ক'রে…'

'কিন্তু বক্সিং-এর জন্য রাজাদের দরকার কি ?'

বৃদ্ধ হেসে বল্লেন :

'তুমি ব্যবসার কিছুই জানো না। এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস হবে, এর আগে কেউ আর তা করেনি, তাই—'

বললাম : 'কিন্তু রাজাদের যে আবার উল্টো অভ্যাস ! তারা মাইনে ক'রে লোক রাখে, তাদের হ'য়ে লড়াই ক'রে মরবার জন্যে, তারা নিজেরা লড়াই করে না !'

'তা হোক ! সেই জন্যই তো রাজাদের চাইছি ! লোকে একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস দেখতে পাবে…তুমি য়ুরোপে গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখবে… তিন মাস ধরে প্রত্যেক দিন আধঘন্টা ক'রে দুজন রাজা বক্সিং করবে…কত খরচ পড়বে তুমি আমাকে জানাবে…ভুলবে না…বুঝলে ?'

চলে আসতে আসতে দেখলাম, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ তখনও ভাবছেন, কি ক'রে এই নতুন ব্যবসাটা ফাঁদা যায়।

[অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আর একজন রাজার সঙ্গে

স্বয়ং রাজার একজন দেহরক্ষী আমাকে সঙ্গে নিয়ে, রাজমন্দিরের নিভৃতকক্ষে যেখানে রাজার পুণ্যদর্শনলাভ ঘটবে, তার দ্বারের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লক্ষ্য করলাম, দেহরক্ষীর অঙ্গ মূল্যবান পোষাকে সুসজ্জিত, বক্ষস্থলে অসংখ্য পদক ঝুলছে, বহুবিধ সম্মানের চিহ্ন···কোমরে সুদীর্ঘ তলোয়ার, কোষবদ্ধ। দ্বারপ্রান্তে দেহরক্ষী স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখে, আমার হাতের দিকে চেয়ে থাকে।

যথাসম্ভব নিঃশব্দে দেহরক্ষীর সঙ্গে কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। রাজা তখনো আসেন নি। সেই অবকাশে মন্দিরটি ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখলাম, যে-সব বড় বড় পরিকল্পনার দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্য নিরূপিত হয়, এই মন্দির-কক্ষেই তাদের জন্ম হয়। তাই বিহ্বল বিস্ময়ে সেই পরম-আশ্চর্য কক্ষটি দেখতে লাগলাম। দেখলাম, রাজার এই বিশ্রাম আর পাঠকক্ষটি দৈর্ঘ্যে অন্তত দুশো ফিট লম্বা হবে, প্রস্থে প্রায় একশো ফিট চওড়া।

পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, কক্ষটির ছাদ কাঁচের তৈরি। বাঁদিকে দেওয়ালের কাছে একটা পুষ্করিণীর মতন গোলাকার গর্তে বিভিন্ন রণ-তরীর মডেল রক্ষিত রয়েছে। দেয়ালের গায়ে সুনির্দিষ্ট রেখায় তাকের পর তাক সাজানো আর সেই সব তাকে নানাধরণের রঙীন সব পুতুলের সৈনিক সাজানো রয়েছে···বিভিন্ন পোষাকে বিভিন্ন ধরণের সব সৈনিক···জ্যামিতিক ছন্দে সাজানো। ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি অনেকগুলি চিত্তাধার সাজানো রয়েছে, প্রত্যেকটিতে এক-একটা ক'রে ছবি অসমাপ্ত-ভাবে আঁকা রয়েছে। পায়ের তলায় সমস্ত মেঝেটা দেখলাম, ইবনী আর শাদা হাতীর দাঁতে মোড়া, পিয়ানোর চাবির মতন শাদা আর কালো ঘরকাটা।

দেহরক্ষীকে আহ্বান ক'রে বললাম : 'শোন বন্ধু…'

দেহরক্ষীর কোমরের তলোয়ার শব্দ ক'রে উঠলো। ঘাড় সোজা ক'রে দেহরক্ষী বললো :

'বন্ধু নয়…আমাকে সম্বোধন করতে হ'লে যথারীতি বলতে হবে, মাস্টার অব সেরিমনিস্…আমি হলাম মহামান্য নরপতির রাজসভার মাস্টার অব সেরিমনিস্…'

উত্তরে জানালাম : 'শুনে সুখী হলাম…কিন্তু আমাকে বলতে পারেন…'

আমাকে বাঁধা দিয়ে মান্যবর দেহরক্ষী বলে উঠলো :

'বাজে কথা থাক…যখন হিজ্ ম্যাজেষ্টি প্রবেশ করবেন, তখন কি বলে তাঁকে সম্বোধন করতে হবে, জান তো ?'

সহজভাবেই জবাব দিলাম : 'জানি। বলবো, কেমন আছেন ?'

তলোয়ারের ওপর হাত রেখে মান্যবর গর্জে উঠলো :

'ওসব অসভ্যতা চলবে না…'

এই বলে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগল, কিভাবে হিজ্ ম্যাজিষ্টিকে সম্বোধন করতে হবে, কিভাবে তাঁর কথার উত্তর দিতে হবে…

ইত্যবসরে প্রবেশ করলেন স্বয়ং হিজ ম্যাজেষ্টি। তাঁর পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি নিঃসন্ধিগ্ধভাবে জানেন যে তাঁর প্রাসাদকক্ষের প্রাঙ্গণ নিরেট কঠিন প্রস্তর দিয়েই তৈরি। দেখলাম হিজ ম্যাজেষ্টি যখন হাঁটেন তখন তাঁর পা জ্যামিতির সরল রেখার সতন সোজাই থাকে, দু'পাশে দুই বাহু সোজা সরল রেখার মতন দু'পাশে পড়ে থাকে, কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ে না, বেঁকে না। হিজ ম্যাজেষ্টির ধারণা হয়ত তাতে আরো বেশী ক'রে তাঁকে রাজকীয় দেখায়। চোখের দৃষ্টি তেমনি স্থির…শুধু সামনের দিকে, দূরে বহু দূরে যেন বদ্ধ হ'য়ে আছে। যেমনভাবে মানুষ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকে।

আমি মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানালাম। দেহরক্ষী রাজসভার কায়দা মাফিক 'স্যালুট' করলো। হিজ ম্যাজিষ্টি ঈষৎ হেসে গোঁফটা একবার চুমড়ে নিলেন।

গম্ভীর কণ্ঠে হিজ ম্যাজেষ্টি জিজ্ঞাসা করলেন :

'বল তোমার জন্যে কি করতে পারি ?'

মনে পড়লো, কিছুক্ষণ আগেই দেহরক্ষী আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। টাটকা তা স্মরণে ছিল ব'লে উত্তর দিলাম :

'ইয়র ম্যাজেষ্টি, এই অধীন এসেছে আপনার সুবিপুল জ্ঞান-সাগরের বিশাল বিস্তার থেকে দুই এক বিন্দু জ্ঞান-অমৃত-কণা আহরণ করবার উদ্দেশ্যে।'

হিজ ম্যাজেষ্টি উত্তর শুনে খুশি হয়েই রসিকের মতন জবাব দিলেন :

'তাতে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।'

দেহরক্ষীর শিক্ষা ভুলে গিয়ে, হিজ ম্যাজিষ্টির রসিকতায় তাল দিতে গিয়ে বলে ফেললাম : 'ক্ষতি হওয়া সম্ভব !'

হিজ ম্যাজেষ্টি রসিকতাটা বুঝতে পারলেন না ! তাই সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন : 'বেশ তাহ'লে এসো একটু কথাবার্তা বলাই যাক্…অবশ্য রাজার সঙ্গে কথা বলতে হ'লে দাঁড়িয়েই বলতে হয়, তবে, তোমার যদি অসুবিধা হয়, তুমি বসেই কথা বলতে পার।'

রাজার উদারতা গ্রহণ করতে দ্বিধা করলাম না। তাঁর সামনেই একটা চেয়ারে বসলাম। লক্ষ্য করলাম, রাজা যখনই কথা বলেন, তখন শুধু তাঁর জিভ্‌টাই যা নড়ে, তা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নড়ে না। কি কঠিন অভ্যাস !

হিজ ম্যাজেষ্টি বল্‌লেন :

'তাহলে, তুমি সত্যি সত্যি একজন রাজার সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছ… এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়…যে কেউই ইচ্ছা করলে রাজার সামনে আসতে পারে না। এখন তোমার বক্তব্য কি, তাই শুনি !'

সোজা জিজ্ঞাসা করলাম : 'আপনার এই চাকরী কেমন লাগছে ?'

হিজ ম্যাজেষ্টি চমকে উঠলেন : 'চাকর ? রাজাগিরি করা কোন চাকরী নয়…কর্তব্য বলতে পারো ! ভগবান আর রাজা, এই দু'জনের চরিত্র সাধারণ মানুষের মনের বাইরে !'

এই বলে রাজা মাথার ওপরে কাঁচের ছাদের দিকে চেয়ে বললেন :

'এই যে দেখছো, মাথার ওপরে কাঁচের ছাদ, কেন জান? যাতে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পান রাজা কি করছে, তারই জন্যে এই কাঁচের ছাদ, বুঝলে? একমাত্র ভগবানই হলো রাজার সাক্ষী...একমাত্র ভগবানই পারেন রাজাকে নির্দেশ দিতে...রাজা আর ভগবান, দু'জনেই হলো তাই স্রষ্টা।...এক ...দুই...ভগবান তৈরি করেছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এক...দুই...তিন...আমার ঠাকুরদা তৈরি করেছেন এই জার্মানীকে...আমি তাঁর সেই সৃষ্টিকে করেছি নিখুঁত, সম্পূর্ণ। আমি আর আমার পূর্ব-পুরুষদের একজন রাজভক্ত প্রজা... গ্যেটে তার নাম...আমরা দুজনে এই জার্মান জাতের জন্য যা করেছি, তা আর কেউ করতে পারেনি। আমি অবশ্য বলতে পারি, গ্যেটের চেয়েও কিছু বেশীই আমি করেছি...আমার প্রতিভা যে গ্যেটের চেয়ে বহুমুখী তাতে কারুরই সন্দেহ নেই। গ্যেটে যে 'ফাউষ্টকে' তৈরি করেছিল, তার চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। কিন্তু আমি জগতে এনেছি অভেদ্য অচ্ছেদ্য ফাউষ্টকে। বুঝেছ?'

জিজ্ঞাসা করলাম : 'মহারাজ কি আর্টের চর্চাই বেশী ক'রে থাকেন?'

তিনি উত্তর দিলেন :

'সারা জীবনটাই আমি আর্টের চর্চায় উৎসর্গ করেছি! একটা জাতিকে শাসন করা হলো সবচেয়ে বড় আর্ট, সবচেয়ে কঠিন আর্ট। সেই আর্ট পুরোদস্তুর শিক্ষা করতে হ'লে, হেন জিনিস নেই যা জানতে না হয়। এবং হেন জিনিস নেই যা আমি জানি না। কবিতা হলো রাজার স্বভাব-ধর্ম, ছন্দ-জ্ঞান নিয়েই রাজাকে জন্মাতে হয়। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ছন্দোবদ্ধ, যা কিছু সুশৃঙ্খলিত, তার প্রতি আমার অন্তরের যে কি সুতীব্র আকর্ষণ, তা যদি চাক্ষুস দেখতে চাও, তাহ'লে প্যারেডের মাঠে যখন আমি সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করাই, তখন আমাকে দেখলেই বুঝতে পারবে! সত্যিকারের কবিতা কাকে বলে জান? সত্যিকারের কবিতা হলো নিয়মতান্ত্রিকতা, বাধ্যতা, যাকে বলে ডিসিপ্লিন্, বুঝলে? সৈন্যদের কুচকাওয়াজ আর ছন্দোবদ্ধ কবিতা, একই জিনিস। সারি সারি সৈন্যেরা দাঁড়িয়ে আছে, তারই মধ্যে রয়েছে চরম

কবিতা…কবিতার মধ্যে যেমন শব্দ, প্যারেডের সারিতে তেমনি এক একজন সৈনিক…! সনেট হলো লাইন ক'রে গুণে গেঁথে অক্ষরে সৈন্যদের সাজানো, যাতে ক'রে তাদের আক্রমণ হৃদয়ের উপর অব্যর্থ হয়। ঠিক হ'য়ে সারি বেঁধে দাঁড়াও, বেয়নেট তুলে নাও, তারপর ফায়ার…বুলেটের মতন অব্যর্থ গিয়ে লাগবে হৃদয়ে…কথাগুলো মগজ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে…এই তো কবিতা। কবিতা আর সৈন্য একই জিনিস, বুঝলে? রাজাই হলো প্রথম সৈনিক, রাজাই হলো জাতির দিব্য বাণী…জাতির প্রথম কবি। তাই আমি যখন কুচকাওয়াজ করি, লোকে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে…আপনা হ'তে আমার ভেতর থেকে জেগে ওঠে ছন্দ…অনায়াসে…স্বচ্ছন্দে…এই দেখ…মা—র্—চ্।'

দেখলাম, হঠাৎ মহারাজের বাঁ পা-টা সোজা কাঠের মতন ওপর দিকে উঠে গেল আর সেই সঙ্গে ডান হাতটা কাঁধ বরাবর উঠে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড সেই অবস্থায় কাঠের মতন দাঁড়িয়ে থাকার পর মহারাজ গর্জন ক'রে উঠলেন: 'ছাড়!' সঙ্গে সঙ্গে কলের মত হাত আর পা আবার স্বাভাবিক জায়গায় ফিরে এলো।

কবিতার এই প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখিয়ে মহারাজ বল্‌লেন:

'চোখের সামনে দেখলে, অভ্যাস করতে করতে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছন্দোবদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে যে চেতনার অজ্ঞাতসারেই তারা কাজ ক'রে চলে। পা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাত আপনা থেকেই উঠে যায়, এর মধ্যে মস্তিষ্কের কোন দরকার হয় না। একেবারে যাকে বলে যাদু। সেইজন্য সে হলো সবচেয়ে সেরা সৈনিক, যার মগজ বিন্দুমাত্র কাজ করে না। সেনাপতির গলার আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হাত-পা আপনা থেকে ওঠা-নামা করে। যেই কানে এলো মা—র্—চ্…অমনি পা চলতে আরম্ভ করলো, তা সে স্বর্গেই হোক আর নরকেই হোক্। যেই হুকুম হলো, চার্জ…অমনি হাতে সোজা উঠে গেল নাঙ্গা বেয়নেট। সামনে যদি পড়ে সৈনিকের বাবা…সোজা চলে যাবে বেয়নেট বাবারই বুক ভেদ ক'রে—বাবা যদি সাম্যবাদী হয় তাহলে তো কথাই নেই—মা বা বোন্ বা ভাই-ও যদি সাম্যবাদী হয় তাহলেও রক্ষে নেই। যতক্ষণ না আবার হুকুমের আওয়াজ শুনছে, থামো—ততক্ষণ সোজা চলতেই থাকবে

বেয়নেট। অপূর্ব! অদ্ভুত! মনের স্পর্শের বাইরে, আপনা থেকে কাজ ক'রে চলবে দেহ!'

হঠাৎ দেখলাম, মহারাজার বুক ফুলে উঠে আপনা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। সেই একই ভঙ্গীতে তিনি বলে চললেন :

'আমার বাসনা, আমি পৃথিবীতে একটা আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে যাবো—আমি যদি নাও পারি, তাহ'লে আমারই কোন বংশধর তা করবে। তার জন্যে দরকার, দেশের মধ্যে প্রত্যেক লোককে বুঝতে হবে ডিসিপ্লিন হলো আসল ধর্ম। ডিসিপ্লিনের সাহায্যে যখন এমন অবস্থা হবে, মগজের সংযোগ ছাড়াই সব কাজ চলবে, কাজ করতে গেলে মানুষকে আর অকারণ ভাবনা চিন্তা করতে হবে না, তখনই রাজাদের আসবে সুদিন, জাতিরও হবে সমৃদ্ধ। টাকা! রাজা আদেশ করবেন—আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রজা সারি বেঁধে দাঁড়াবে। এক—সঙ্গে সঙ্গে চার কোটি হাত চার কোটি পকেটে চলে যাবে··· দুই—চার কোটি হাত প্রত্যেক পকেট থেকে তুলে ধরবে দশটা ক'রে মুদ্রা··· তিন—চার কোটি হাত তারপর রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে আবার ফিরে যাবে যে-যার কাজে। কি সুন্দর ব্যবস্থা বলতো? এ থেকেই তুমি বুঝতে পারবে, প্রজাদের সুখী হওয়ার মধ্যে মগজের কোন দরকারই নেই, বরঞ্চ মগজকে বাদ দিয়ে রাখলেই তারা প্রকৃত সুখ পেতে পারে। তার প্রধান কারণ হলো, তাদের জন্যে যা-কিছু ভাবনা চিন্তা করবার, সে তো রাজাই করবেন। অবশ্য সব রাজাই যে আমার মতন ঠিক পথে ভাবতে পারেন, তা নয়। সেই জন্যে আমি চেষ্টা করছি, যাতে অন্য সব রাজারা এক জোট হ'য়ে আমার সঙ্গে মিলতে পারে। তাতে জগতেরই কল্যাণ হবে—জগতে যেখানে ভদ্র লোক আছে, তারা শান্তি পাবে। কি ক'রে? আজ সাম্যবাদ রাক্ষসের মতন মানুষের সভ্যতার হৃদপিণ্ডকে খেয়ে ফেলতে চলেছে···সভ্যতার হৃদপিণ্ড হ'লো, সম্পত্তি। তাই আজ সব রাজাদের এই রাক্ষসকে বধ করবার জন্যে একজোট হতে হবে। যাতে জনসাধারণের মধ্যে এই রাক্ষসের বীভৎসতা সম্বন্ধে আতঙ্ক বেড়ে ওঠে, সেদিকেও রাজাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, কারণ, এই রাক্ষসকে তারা যত ভয় করবে, ততই আমাদের বেশী ক'রে চাইবে।

তাই এই রাক্ষসকে বধ করবার আগে, তার সম্বন্ধে আতঙ্ককে জীইয়ে রাখতে হবে।...'

এক নাগাড়ে এতক্ষণ বলে যাওয়ার দরুণ রাজাবাহাদুর একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু দম নিয়েই আবার বলতে সুরু করলেন :

'সেইজন্যে য়ুরোপের সমস্ত রাজাদের হ'য়ে আমি একটা প্রোগ্রাম ঠিক করেছি...এই প্রোগ্রাম তাঁদের সকলের কাছেই উপস্থিত করবো, তবে তার আগে আমার নৌ-বাহিনীকে আর একটু শক্তিশালী করা দরকার...আমার নৌ-বাহিনীকে যদি অজেয় ক'রে গড়ে তুলতে পারি, আমি জানি আমার কথা তখন ঘাড় হেঁট ক'রে শুনবে য়ুরোপের রাজারা। ইতিমধ্যে আমি অবশ্য বসে নেই। শান্তিপূর্ণ কালচারের সাহায্যে যাতে আমরা জার্মান প্রজাদের হৃদয়-মনকে সকল দিক থেকে সমুন্নত করতে পারি, তার চেষ্টা করছি। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার মধ্যে দিয়ে আমার প্রজাদের অভ্রান্তভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকেই অধিকার নিয়ে আমাদের বংশের রাজারা শাসন ক'রে চলেছেন...। আমার তৈরি বিরাট নতুন রাজপথটা দেখেছ? একটা বিস্ময়কর সৃষ্টি! বিরাট রাস্তার দুদিকে দশ হাত অন্তর আমার পূর্বপুরুষদের এক-একটা ক'রে প্রতিমূর্তি গড়ে তুলে স্থাপন করেছি—প্রতিদিন মানুষ আসতে যেতে চোখের সামনে দেখতে পাবে হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ আর হোয়েন্‌জোলার্ণ রাজবংশে কী সব দেবতুল্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ডাইনে বাঁয়ে, যেদিকে চাইবে, আসতে যেতে দেখতে পাবে বিরাটকায় আমার পূর্বপুরুষেরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন...প্রত্যেকে এক-একজন দিকপাল। দেখতে দেখতে আপনা থেকে তাদের মনে এক সুবিশাল রাজ-গর্ব জেগে উঠবে...তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের মনে জেগে উঠবে রাজধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য...আমার প্রতি আনুগত্য। আমার ইচ্ছা, আমার রাজ্যের প্রত্যেক শহরের বড় রাস্তার দুধারে এই রকম আমার পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করবো। লোকে বুঝতে পারবে, অনাদিকাল ধরে আমার বংশের রাজারাই রাজত্ব ক'রে এসেছে এবং অতীতে যা সত্য হ'য়ে এসেছে, ভবিষ্যতেও তাই সত্য হবে। লোকে বুঝবে, রাজা না হ'লে রাজ্য চলে না। শিল্প-কলা যে মানুষের কাছে একটা মস্তবড় প্রয়োজনীয়

জিনিস, সেকথা সবাই জানে, কিন্তু আমিই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবজীবনে হাতেকলমে দেখালাম, মূর্তি-শিল্প কত বড় একটা প্রয়োজনীয় জিনিস···কি বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে···তুমি দেখেছ সেই সব প্রতিমূর্তি ?'

বিনীতভাবে জানাই : 'দেখেছি হুজুর ! তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনার পূর্বপুরুষদের যে-সব মূর্তি দেখলাম, প্রত্যেকের পায়ের গড়ন যেন মনে হলো একই রকমের, অস্বাভাবিক···কেন ?'

রাজাবাহাদুর বললেন :

'তার কারণ হলো, সবগুলি মূর্তিই এক কবর-মিস্ত্রীর কারখানা থেকে তৈরি হয়েছে···পায়ের গড়নের ত্রুটিতে কিছু যায় আসে না···আসল হলো তাদের ভঙ্গি···হাঁ···ভালকথা, তুমি আমার সঙ্গীত শুনেছ ? শোন নি ? আচ্ছা, তোমার সামনেই আমি বাজিয়ে দেখাচ্ছি—'

কথা শেষ করেই রাজা বাহাদুর সোজা দেহটাকে বেয়নেটের মতন ভেঙে একটা চেয়ারে বসলেন। একটা পা সামনের দিকে তুলে দিয়ে দেহরক্ষীকে আদেশ করলেন : 'কাউন্ট, জুতোটা খুলে দাও···হ্যাঁ···এই পা-টারও···বেশ ···এইবার মোজাটাও খোল···ধন্যবাদ···যদিও ভৃত্যের সেবার জন্যে রাজারা ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য নয়···তবুও ভব্যতার খাতিরে আমি বল্লাম !'

সঙ্গীতের সঙ্গে এই পাদুকা-পরিবেশনের কি সম্পর্ক বুঝতে না পেরে অবাক হ'য়ে রাজাবাহাদুরের দিকে চেয়ে রইলাম···

তারপর রাজাবাহাদুর সোজা ডানদিকের দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, কাছেই একটা স্টাণ্ড থেকে একটা তুলি তুলে নিলেন, বাঁদিকে ঘাড়টা একটু কাৎ ক'রে বল্‌লেন : 'আমি একসঙ্গে ছবি আঁকি আর বাজনা বাজাই··· এই দেখ, মেজেতে সমস্ত পর্দা সাজানো রয়েছে···আসল বস্তুটা আছে মাটির তলায়···এই আমি তুলি নিয়ে ছবি আঁকছি···এক নম্বর···'

বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম রাজাবাহাদুর শাদা পটের উপর তুলির একটা আঁচড় দিলেন।

'তারপর, এই দেখো দু' নম্বর···পা দিয়ে বাজনার পর্দার উপর আঘাত করছি···'

সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম একটা তীব্র শব্দ যেন দেওয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

'দেখলে তো ব্যাপার! কি রকম সোজা। তা ছাড়া, রাজার হাতে এত সময় নেই যে তা নষ্ট করা চলে···রাজাকে সব সময় দেখতে হয়, যাতে কম সময়ের মধ্যে বেশী কাজ করা যায়। এত করেও সব কাজ রাজারা সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। সেইজন্য ভগবানের উচিত রাজাদের পরমায়ু সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী করা। রাজাদের ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই। নদীর জলের মতন রাজাদের মন সব সময়েই বয়ে চলেছে। সমস্ত প্রজার ভাল-মন্দ রাজাকে ভাবতে হয়, একমাত্র রাজারই আছে সেই ভগবানে অধিকার। নইলে, প্রজাদের জন্যে ভাবনার অধিকার তো আর আর কারুরই নেই!'

এই বলে রাজাবাহাদুর হাত দিয়ে তুলি চালান আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পা দিয়ে বাজনার পর্দার উপর আঘাত করেন···সারা ঘর নানা রকম বিচিত্র শব্দে ভরে ওঠে—মনে হয় যেন চারিদিক থেকে কারা গুলি ছুঁড়ছে—ধুপ ধাপ শব্দ উঠছে···শেষকালে একটা তুমুল জয়ধ্বনিতে সঙ্গীত থেমে গেল।

সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এ সঙ্গীতের নাম কি রাজাবাহাদুর?'

রাজাবাহাদুর উল্লসিত হ'য়ে জবাব দিলেন:

'এটি আমার সর্বপ্রথম সঙ্গীত রচনা, নাম দিয়েছি "নরপতির জন্ম", এই সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে প্রজাদের মধ্যে রাজার সার্বভৌমত্ব প্রচার করবার চেষ্টা করেছি—সঙ্গীতকে কাজে লাগিয়েছি, বুঝলে?'

নিজের কৃতিত্বে আত্মতৃপ্তভাবে রাজাবাহাদুর বৃহৎ গুম্ফের দুই প্রান্তে বেশ ভাল ক'রে চুমড়ে নিয়ে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন:

'আমার প্রজাদের মধ্যে দু' চারজন বড় বড় সঙ্গীতকার আছে বটে কিন্তু আমি আমার সঙ্গীতে নিজেই সুর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি, কেননা তাহ'লে প্রজারা আমার সুরে সুর মিলিয়ে চলতে পারবে।'

অতপর রাজাবাহাদুরের আঁকা ছবির দিকে নজর পড়লো, দেখলাম, শাদা চিত্রপটে কটকটে লাল রঙের মস্তকহীন এক রাক্ষসের ছবি ফুটে উঠেছে। কবন্ধের অসংখ্য হাত, প্রত্যেক হাতে বিদ্যুৎ-তুল্য এক একটি অস্ত্র—কোন

অস্ত্রের গায়ে লেখা অরাজকতা, কোনটির গায়ে লেখা নাস্তিকতা, কোনটির গায়ে লেখা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংস, কোনটির গায়ে রক্তপাত। বিশাল পদক্ষেপে সেই বিরাটকায় রাক্ষস গ্রাম আর নগরের উপর দিয়ে বীর বিক্রমে চলেছে, যেখান দিয়ে চলেছে তার দু'ধারে হস্তস্থিত বজ্রবানে আগুন জ্বলে উঠছে ; আর সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে চারিদিক থেকে কালো কালো পোকার মতন সব মানুষ আর্তনাদ ক'রে ছুটে পালাচ্ছে। রাক্ষসের পিছনে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একদল লাল রঙের জীব আসছে, দেখতে লাল গেরিলার মতন।

সগর্বে সেই ছবির দিকে চেয়ে রাজাবাহাদুর বলে উঠলেন :

'কি বীভৎস, না ?'

গম্ভীরভাবে বললাম : 'সত্যিই বীভৎস !'

রাজাবাহাদুর আমার মন্তব্যের অর্থ বুঝতে না পেরে সগর্বে বলে উঠলেন :

'তাহ'লে আমার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে, কি বল ? ছবিটা থেকে নিশ্চয়ই আমার অন্তরের কথা বুঝতে পারছো ! ঐ যে দেখছো রাক্ষসের মূর্তি…ঐ হলো সাম্যবাদ ! তার মাথা নেই…যেখান দিয়ে চলেছে দু'ধারে ছড়িয়ে চলেছে পাপ আর অনাচার…আর হাহাকার…মানুষকে ক'রে তুলেছে পশু ! এই হলো সাম্যবাদের আসল চেহারা ! আমার রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে আমি যেমন চেষ্টা করেছি এই রাক্ষসকে বধ করবার, তেমনি শিল্পকলার ভেতর দিয়েও চেষ্টা করছি, যাতে লোকে এই রাক্ষসের স্বরূপ বুঝতে পেরে সতর্ক হ'তে পারে। লোকের সেবায় আর্টকে আর কেউ এমন সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারে নি !'

স্তব্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি :

'রাজাবাহাদুরের প্রজারা কি আপনার এই মহান আর্টের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে ?'

রাজাবাহাদুর বলে উঠলেন :

'নিশ্চয়ই, উপলব্ধি করা উচিত। আমি তাদের জন্য বড় বড় যুদ্ধের জাহাজ তৈরি করিয়েছি, তাদের জন্যে অপরাজেয় সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছি…তাদের রক্ষার জন্যে দুর্ভেদ্য সব দুর্গ গড়েছি…সমস্ত শিল্পকলাকে তাদের শিক্ষা দানে ফুটিয়ে তুলেছি ! তবে…মাঝে মাঝে আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, আমার

প্রজাদের মধ্যে যারা মূর্খ, তারাই আমাকে ভালবাসে, আর প্রজাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, যাদের খ্যাতি আছে, তারা শুনছি নাকি সবাই সাম্যবাদী হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা আমাকে মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তুলছে…'

বল্‌লাম :

'রাজারা যে স্বয়ং ভগবানের অংশ, এ-সম্বন্ধে আপনার প্রজাদের মধ্যে তাহ'লে সন্দেহ দেখা দিয়েছে বলুন…'

গম্ভীরভাবে রাজাবাহাদুর বল্‌লেন :

'যারা এই সুগভীর সত্যে বিশ্বাস হারিয়েছে, তারা শুধু মূর্খ নয়, হতভাগ্য ! হাজার হাজার বছর যে সত্যকে পৃথিবী স্বীকার ক'রে নিয়েছে, আজ কি ক'রে তা মিথ্যে হ'য়ে যেতে পারে ? তবে, আমার প্রজাদের মধ্যে অধিকাংশ তেমন মূর্খ নয়…অধিকাংশ প্রজাই অন্তর থেকে উপলব্ধি করে যে অলৌকিক ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হলেন ভগবান এবং যেহেতু রাজারাই একমাত্র সেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, সেহেতু দিবালোকের মতন স্বচ্ছ এই সত্য যে রাজারা হলো ভগবানেরই অংশ…' একটা আত্ম-তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে রাজাবাহাদুরের চোখে। কিন্তু সে শুধু ক্ষণকালের জন্য। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন রাজাবাহাদুর, যেন একটা বৃদ্ধ জাহাজ ভিতরের বাষ্প বের ক'রে দিচ্ছে…

আসন থেকে উঠে দাঁড়ালাম। বল্‌লাম :

'রাজাবাহাদুরের মহামূল্য সময়ের আর অপব্যয় করতে চাই না !'

রাজাবাহাদুর বললেন :

'বেশ !…বিদায়। আমি তোমার জন্য কামনা করি…তোমার জন্য কি চাইতে পারি আমি ?…আচ্ছা, আমি কামনা করি আর একজন রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য যেন তোমার হয় !'

তারপর মহামহিমান্বিত রাজাধিরাজ রাজকীয় কায়দায় নিচের ঠোঁটটা স্ফীত ক'রে ঝুলিয়ে দিলেন এবং বাদশাহী কায়দায় গোঁফ জোড়া চুমড়ে দিলেন। আমার মনে হ'ল এটাই বোধহয় রাজাদের শুভ ইচ্ছা প্রদর্শনের রীতি। আমি চল্‌লাম

চিড়িয়াখানার দিকে যাতে বুদ্ধিমান জন্তুজানোয়ারদের দেখে আমার চোখ একটু আরাম পেতে পারে···হ্যাঁ, কোন কোন লোকের সঙ্গে কথা বলার পর আপনারও বোধহয় খুব ইচ্ছে হয় আপনার পোষা কুকুরের পিঠ চাপড়াতে অথবা বাঁদরের দিকে তাকিয়ে হাসতে কিংবা মাথার টুপি খুলে হাতীকে অভিবাদন জানাতে···হয় না কি ?···

[অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জীবনের অধিদেবতারা

'চলতি সমাজ-ব্যবস্থায় মূল বুঝতে চাও তুমি? তবে এস আমার সঙ্গে সত্যের উৎস-মূলে...' হাসতে হাসতে শয়তান আমাকে নিয়ে এল গোরস্থানে।

পুরানো সমাধি স্তম্ভ এবং ঢালাই লোহার স্মৃতি-সৌধের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। শ্রান্ত বৃদ্ধ প্রফেসরের নিষ্ফলা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মত ক্লান্তস্বরে বলে উঠল শয়তান: 'বুঝেছ বন্ধু, তোমার পায়ের নিচে আজ যারা সমাধিস্থ হ'য়ে আছে, তাদেরই তৈরি আইন-কানুনে কিন্তু তোমরা শাসিত হচ্ছ। তোমাদের মধ্যেকার হিংস্রপশুকে বন্দী ক'রে রাখবার জন্য খাঁচা তৈরি করেছিল যারা, সমাজ-যন্ত্রের সেই সব মহারথী মিস্ত্রীদের ভস্ম তুমি দু'পায়ে মাড়িয়ে চলেছ—' বলতে বলতে হেসে উঠল সে—অদ্ভুত সে-হাসি, মানুষের প্রতি ঘৃণার কষাঘাত ফুটে উঠল সেই হাসিতে। তাকিয়ে দেখলাম, তার সবুজ চোখ দু'টোর আনন্দ-হীন হিম-শীতল দৃষ্টি ভেসে গেল গোরস্থানের দূর্বার উপর দিয়ে। আমার পায়ে ঠোকর লাগল উর্বরা ধরণীর তাল তাল মাটি; মৃতের পার্থিব জ্ঞান-সমৃদ্ধি সম্বলিত স্মৃতি-সৌধের পাশের সর্পিল পথ দিয়ে হাঁটা অসুবিধাজনক হ'য়ে উঠল।

'আচ্ছা বন্ধু, যারা তোমাদের সত্তাকে ছাঁচে ঢেলে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা করেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তুমি তো মাথা নোয়ালে না?' শরৎকালের স্যাঁতসেঁতে একটানা বাতাসের মত মিইয়ে-পড়া আর্দ্র কণ্ঠস্বর শয়তানের। সে-কণ্ঠস্বর শুনে আমার মেরুদণ্ড পর্যন্ত শিউরে উঠল, হৃদপিণ্ডে লাগল কাঁপন, একটা তীব্র অস্বচ্ছন্দতায় মোচড় খেয়ে উঠল সমস্ত হৃদয়। গোরস্থানের বিষণ্ণ গাছগুলিও যেন নড়ে উঠে তাদের ভিজে শীতল ডাল আমার মুখের উপর বুলিয়ে দিল।

'প্রবঞ্চকদের প্রতি সম্মান দেখাও বন্ধু! নগন্য ফ্যাকাশে চিন্তাধারার মেঘজাল বিস্তার করেছে এরাই যার কানাকড়ির আয়ত্ব করাই হ'ল তোমার

বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তোমার অভ্যাস, তোমার সংস্কার, যা কিছু নিয়ে তুমি বেঁচে আছ, এসব কিছুই এদেরই পরিকল্পিত ধাঁচে ফেলে তৈরি হয়েছে। এইসব মৃত মহারথীদের ধন্যবাদ জানাও বন্ধু! কি বিরাট ওয়ারিসী-স্বত্বই না রেখে এসেছে এরা তোমাদের জন্য!—'

শুকনো পাতা ঝরে পড়ল আমার মাথায়, লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ে। কবরের ভুখা মাটি অট্টহাস্যে গোগ্রাসে গিলতে লাগল সেই তাজা খাদ্য: শরতের ঝরে-পড়া শুকনো পাতা।

'এই যে, এখানে যিনি শুয়ে আছেন, জীবিতকালে তিনি ছিলেন একজন দরজী—মানুষের তাজা মনকে কুসংস্কারের ভারী ধূসর নামাবলী দিয়ে আচ্ছাদিত ক'রে দেওয়ার কাজ ছিল এই মহাত্মার।—এর সঙ্গে কথা বলতে চাও তুমি?'

রাজী হ'য়ে মাথা ঝাকালাম আমি। একটা মরচে ধরা সমাধিস্তম্ভের উপর লাথি মেরে হাঁক দিল শয়তান: 'হে—এই কেতাব-লিখিয়ে, উঠে এস—'

স্মৃতিসৌধ কঁকিয়ে উঠে ফাঁক হ'য়ে গেল—কানে এসে লাগল একটা ভারী দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ—যেন কাঁদার গোলা গড়িয়ে পড়ছে নিচে। উইয়ে-খাওয়া থলের মত অগভীর কবরটা খুলে গেল। ঘনান্ধকার স্যাঁতসেঁতে গহ্বর থেকে অসন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল:

'রাত বারটার পর মৃতকে এভাবে ডেকে কে তোলে?'

'হুঁ! দেখলে, জীবনের রীতি-নিয়ামক যারা মরে গেলেও তারা কেমন নিজেদের কাছে ঠিক থাকে—' দাঁতে দাঁত ঘষে বল্‌ল শয়তান।

'ও! তুমি প্রভু!' বলতে বলতে একটা কঙ্কাল উঠে বসল কবরের কিনারে। শুধু তার শূন্য করোটিটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল শয়তানকে।

'হ্যাঁ, আমি।...আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি তোমাদেরকে দেখাবার জন্য। তোমাদের তৈরি বিদগ্ধ সমাজের মধ্যে বাস করতে করতে সে কেমন ভোঁতা মেরে যাচ্ছে। তাই এখন এসেছে এর উৎস সন্ধানে যাতে তার সংক্রাম থেকে আরোগ্য হ'তে পারে—'

বিনয়ে অবনত হ'য়ে আমি তাকিয়ে দেখলাম সেই ঋষি প্রবরের দিকে। করোটির উপরে একটুও মাংস নেই, কিন্তু আত্ম-সন্তুষ্টির ভাব তখনও মুছে যায়নি তার মুখ থেকে। প্রত্যেকটি অস্থিটুকরোর মধ্যে, পরমপূর্ণতালব্ধ অস্থি-সমষ্টির অংশ হিসেবে, একটা অনুপম ব্যবস্থার অংশ বিশেষ ব'লে কেমন আত্ম-সচেতনার ছাপ রয়েছে…

শয়তান জিজ্ঞাসা করল তাকে :

'পৃথিবীতে তুমি কি কি ক'রে এসেছ বল আমাদের।'

গর্ব ও আড়ম্বরের সঙ্গে কঙ্কালটা তার হাতের হাড় দিয়ে নিঃস্বের ছিন্নবস্ত্রের মত পাঁজরের উপর ঝুলে-থাকা শবাধারের টুকরো ও নিজের দেহের চিমসে মাংসের উপর বুলিয়ে নিল। তারপর গর্বের সঙ্গে কাঁধ বরাবর দক্ষিণ বাহুটি তুলে কোনমতে লেগে-থাকা আঙুল দিয়ে গোরস্থানের ঘনান্ধকারের দিকে দেখিয়ে বলতে লাগল ধীর নির্বিকার কণ্ঠে :

'শ্বেতাঙ্গরা যে কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে শ্রেষ্ঠ, এই মহান চিন্তাধারা আমি দশখানা সুবৃহৎ বই লিখে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছি—'

'অর্থাৎ, সত্যকথায় বলতে গেলে,' ঋষি প্রবরের কথার মাঝে ব'লে উঠল শয়তান : 'তোমার বক্তব্য যা দাঁড়ায় তা হ'লো : একজন বন্ধ্যা বয়স্কা কুমারী সমস্ত জীবন ধরে কেবল তার মনের ভোঁতা ছুঁচ দিয়ে গেঁথে গিয়েছে এঁদো ভাবধারা ভর্তি কতগুলি কাগজের পর কাগজ। এবং এগুলো সে গেঁথেছে তাদের জন্য যারা পূর্ণ আন্তরিকতার মাঝে সুস্থ স্থির মস্তিষ্কে বসবাস করতে চায়—'

'এভাবে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছ ওকে?' ফিস ফিস ক'রে আমি বললাম শয়তানকে।

'ও!—' বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল সে : 'জীবিত অবস্থায়ও তো বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সত্যকথায় কান দেয় না।'

ঋষি বলতে থাকে : 'এ রকম উন্নত ধরণের সভ্যতা সৃষ্টি একমাত্র শ্বেতাঙ্গদের দ্বারাই সম্ভব। আমি প্রমাণ করেছি যে শ্বেতাঙ্গদের চামড়ার রং এবং দেহের রক্তের রাসায়নিক সংযুক্তিই এই সূক্ষ্ম নীতিবোধের মূলে—'

'শোন, শোন, সে প্রমাণ করেছে!' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শয়তান

বলে ওঠে : 'নৃসংশতা করার অধিকারে বিশ্বাস য়ুরোপীয়দের মত কিন্তু বর্বরদের মনে অত পাকা পোক্ত ভাবে নেই—'

'খৃষ্ট ধর্ম ও মানবতাবোধ তো সৃষ্টি করেছে শ্বেতাঙ্গরাই—' কঙ্কাল বলে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবদূতের বংশধররা যারা ছুনিয়া শাসন করবে!' শয়তান কঙ্কালের কথার মাঝে বলে ওঠে : 'সেই জন্যেই বুঝি অতি উৎসাহের সঙ্গে এই সভ্যতাকে রক্তের লাল রংএ বারে বারে ছোপ খাইয়ে নিতে হয়—'

আঙ্গুলের হাড়গুলো মটকাতে মটকাতে মৃত ব্যক্তি বলতে থাকে : 'সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তারা, অদ্ভুত অদ্ভুত যান্ত্রিক আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়েছে তারা…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোটা তিরিশেক ভাল বই এবং মানুষ ধ্বংসের জন্য অগুন্তি বন্দুক…' হাসতে হাসতে বলে শয়তান : 'মানুষের জীবনে এত ভাঙন, এত অবনতি, অবনমন শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ছাড়া আর কোথায় হয়েছে বলতে পার?'

'শয়তান যা বলছে তা কি মিথ্যে?' আমি বললাম।

উখা-ঘষা বিষণ্ণ কণ্ঠে বির বির ক'রে বলে কঙ্কাল : 'য়ুরোপীয়দের শিল্প-কলা উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছে—'

'তাহ'লে বল যে শয়তান ভুল বুঝতেই চায়!…উঃ স্পষ্টবাদী হওয়া যে কী ক্লান্তিকর! আমার বিদ্রূপের কষাঘাতের জন্যই যেন মানুষের বাঁচা!…মিথ্যা ও ইতরতার বীজই তো দেখছি ছুনিয়ায় সবথেকে ফলপ্রসূ। এই বীজ যারা ছড়ায়, তাদেরই একজন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নতুন কিছু এরা কেউই করতে পারে না, পুরানো কুসংস্কারের শবকেই এরা নতুন কথার মারপ্যাঁচে সাজিয়ে তুলে ধরে। এই তো এদের কাজ।…কি হয়েছে এই পৃথিবীতে বলতে পার? বিরাট বিরাট ইমারত গড়ে উঠেছে জনকয়েকের জন্য, আর বহুর জন্য প্রস্তুত হয়েছে গির্জা, ধর্মমন্দির এবং কারখানা। মানুষের মনের জবাই হয় ধর্মমন্দিরে আর দেহের জবাই হয় কারখানায়, যাতে ইমারতগুলো অক্ষত থাকে।…মাটির নিচের গভীর গর্ত থেকে মানুষ তুলে আনে সোনা কয়লা—আর এই হীন কাজের বদলে কি দেওয়া হয় তাকে জান? দেওয়া হয় শিশে ও ইস্পাতের মশলা দিয়ে পাকানো এক টুকরো রুটি।'

'তুমি কি সাম্যবাদী ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম শয়তানকে।

'আমি চাই মানুষ মিলেমিশে বাস করুক। মানুষ হ'ল সজ্ঞানসত্ত্ব জীব। তাকে যদি ভেঙে চুরমার ক'রে পরিণত করা হয় দীপশলাকায়, স্বার্থান্বেষী লোভাতুরের হাতের অস্ত্রে যদি সে পরিণত হয়, আমার ভারী বিশ্রী লাগে। গোলাম আমি পছন্দ করি না—গোলামী আমি ঘৃণা করি···এবং এই জন্যেই আমি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলাম। যেখানে দেবমূর্তি সেখানেই আধ্যাত্মিক গোলামী, সেখানেই মিথ্যার প্রচার। পৃথিবী বাঁচুক—সব কিছু নিয়ে দুনিয়া বেঁচে থাকুক! প্রেম ভালবাসা আসে মানুষের জীবনে···অন্ততঃ একটিবারও তো আসে, আসে সুন্দর স্বপ্নের মত···ঐ একটিবারের জন্যও তো আসে মানুষের জীবনে আনন্দ, আসে বেঁচে থাকার পূর্ণ সার্থকতা।—'

ঘনকৃষ্ণ পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কঙ্কালটি···তার শূন্য পাঁজরার খাঁচার মধ্য দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে বাতাস বয়ে যায়। শয়তানকে উদ্দেশ ক'রে আমি বলি : 'শীতে কঙ্কালটি কাঁপছে, ওর কষ্ট হচ্ছে—'

'অপ্রয়োজনীয় সবকিছু পরিত্যাগ করেছেন যে বৈজ্ঞানিক, তাকে দেখতে আমার ভাল লাগে, বন্ধু। আর এ-কঙ্কাল যে দেখছ, এ তো তার আদর্শের কঙ্কাল ···একেবারে মৌলিক জিনিসটি চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।···এর পরের কবরটাতে যিনি শুয়ে আছেন, তিনিও ছিলেন আরেকজন সত্যের বীজ বপনকারী। ওঁকেও জাগিয়ে উপরে তুলে আনছি।···বুঝলে বন্ধু, জীবিতকালে এরা সকলেই কিন্তু শান্তি ও নির্বিঘ্নতার পূজারী ছিল। এবং এই উদ্দেশ্যে মানুষের চিন্তাধারা, ভাব-উচ্ছ্বাস, তার জীবন-পথের গতি-নিয়ামক কত সব নিয়মকানুন তৈরি ক'রে এসেছে! মানুষের কত সজীব নতুন চিন্তাধারাকে এরা বিকৃত ক'রে বেশ সুষ্ঠুভাবে কফিনে ভ'রে কবর-চাপা দেবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আশ্চর্য, মৃত্যুর পর মানুষের স্মৃতিপটে এরা সকলেই বেঁচে থাকতে চায়!··· হেই—করোটি-বিশারদ, উঠে এস! একজন মানুষকে আমি নিয়ে এসেছি। ওর নতুন চিন্তাধারাকে কবর-চাপা দেবার জন্যে একটা কফিন চাই।'

এবং আগের মতই কবরের অভ্যন্তর থেকে একটা দন্তহীন কঙ্কাল উঠে এল। তার শূন্য করোটিটা হলদে হ'য়ে গেছে, তবুও দেখে মনে হয় একটা আত্ম-তৃপ্তির

ছোঁয়ায় যেন সেটা জ্বল জ্বল করছে। কঙ্কালটার কোন জায়গায় একটুও মাংস লেগে নেই—অনেকদিন হ'ল নিশ্চয়ই সে মাটির নিচে শুয়ে আছে। সমাধি-স্তম্ভের পাশে এসে সে দাঁড়াল। কালো পাথরের গায়ে তার পাঁজরের হাড়গুলো সরকারী দেহরক্ষীর পোষাকের ডোরার মত দেখায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: 'আচ্ছা, ওর চিন্তাগুলোসব ও রাখে কোথায়?'

'ওর হাড়ের মধ্যে, বন্ধু, ওর হাড়ের মধ্যে! ওদের চিন্তা ভাবনা হলো বাতের মত—পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ওগুলো ঢুকে থাকে।'

শুষ্ক কণ্ঠে কঙ্কাল জিজ্ঞাসা করে: 'আমার বই কেমন বিক্রি হচ্ছে, প্রভু?'

'তোমার বইসব শেলফে জমে পড়ে আছে, প্রফেসর।' শয়তান উত্তর দেয়।

একটু ভেবে নিয়ে কঙ্কাল আবার প্রশ্ন করে: 'মানুষরা কী তবে লেখাপড়া ভুলে গেল?'

'না না, লেখাপড়া তারা ভোলে নি। এখনও নানারকম বাজে জিনিস তারা পরম উৎসাহেই পড়ে থাকে—তবে, আরও ক্লান্তিকর বাজে জিনিসের দিকে তাদের মনযোগ আকর্ষণ করাতে হ'লে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে, প্রফেসর।'

আমার দিকে তাকিয়ে শয়তান আবার বলল: 'এই যে প্রফেসরকে দেখছ, বন্ধু, জীবিতকালে এ কি করত জান? মেয়েরা ঠিক মানুষ নয়, মানবতর জীব, এইটে প্রমাণ করবার জন্য সমস্ত জীবন ধরে সে কেবল মেয়েদের করোটি মেপেছে, একটা দুটো নয়, শ'য়ে শ'য়ে করোটি মেপেছে, একটা একটা দাঁত গুনে গুনে পরীক্ষা ক'রে দেখেছে, কানের মাপ নিয়েছে, মৃত মেয়েদের মগজ ওজন ক'রে দেখেছে। বুঝলে, সমস্ত জীবন ধ'রে এই একমাত্র কাজই সে করেছে। মৃতের মগজ ওজন করা ছিল প্রফেসরের প্রিয় কাজ। তার সমস্ত বইয়েই এই সবের ছড়াছড়ি দেখবে। তুমি কি প্রফেসরের লেখা কোন বই পড়েছ?'

উত্তর দিলাম: 'শুঁড়ীখানার গলি দিয়ে আমি মন্দিরে প্রবেশ করি না। মানুষের সম্বন্ধে জানতে হবে বই পড়ে—এটা ঠিক আমার জানা নেই। আর বইয়ের মধ্যে মানব চরিত্র—সে তো সব সময়েই ভগ্নাংশ। আমি আবার অঙ্কে

দুর্বল। তবে একটা জিনিস আমি ভালভাবেই জানি এবং তা হ'লো এই যে শ্মশ্রুগুম্ফহীন মানুষ শাড়ী-গাউন পরা হলেও ধুতি-লুঙ্গী-স্যুট পরা শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত মানুষের থেকে কোন অংশেই ছোট কিংবা বড় নয়…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলেছ—, বলদামী ও ইতরামী কী আর পরনের বাস ও মাথার দীর্ঘ কেশ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় ?…মেয়েদের প্রশ্নটা কিন্তু অদ্ভুত ভাবে রাখা হ'ল—' বলতে বলতে হো হো ক'রে শয়তান হেসে উঠল, যে-ভাবে সে সাধারণতঃ হেসে ওঠে। এবং এই জন্যেই তার সঙ্গে কথা ব'লে আমার ভাল লাগে। গোরস্থানে দাঁড়িয়ে এইভাবে যে হাসতে পারে সে ভালবাসে জীবনকে, ভালবাসে মানুষকে—সত্যিই ভালবাসে…

শয়তান বলতে থাকে: 'একদল লোক আছে যারা মেয়েদের শুধু স্ত্রী, ক্রীতদাসী হিসেবেই পেতে চায়, মেয়েদের কখনই তারা মানুষ বলে গণ্য করে না। আরেক দল আছে যারা মেয়েদের কর্মক্ষমতা শোষণ করে, মেয়ে হিসেবে তাদের ব্যবহারও করে এবং এরা বলে যে কর্মক্ষেত্রে পুরুষ থেকে মেয়েরা মোটেই অনুপযুক্ত নয়—সমান ভিত্তিতে তার সঙ্গে অর্থাৎ তার জন্যে তারা কাজ করবে। কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চিত যে এই দুই দলের কেউই এদের দ্বারা ধর্ষিতা মেয়েদের কখনও সমাজে গ্রহণ করে না—একবার যখন ছোঁয়া গেছে, সে-কলঙ্কের দাগ কি আর মোছা যায় কোন দিন? এই হ'লো এদের স্থির বিশ্বাস।…মেয়েদের নিয়ে সমস্যা সত্যি সত্যিই চমকপ্রদ! সহজ সরল মিথ্যা কাহিনী সাজিয়ে যখন পুরুষরা আবোল-তাবোল বকতে থাকে, তখন আমার ভারী হাসি পায়—আমার মনে হয় শিশুদের কলকাকলির কথা।…তবুও আশা থাকে মনে যে সময়ের পদক্ষেপে এই বুড়ো-শিশুরা বড় হ'য়ে উঠে বুঝবে—'

শয়তানের মুখের দিকে আমি মুখ তুলে তাকালাম। আমার মনে হলো যে মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আকাশ-কুসুম রচনা করার বাসনা তার নেই। আকাশ-কুসুম না ভেবে আজকের মানুষকে নিয়ে আমিও অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু এই সহজ সুখকর বিষয়ের আলোচনায় শয়তানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে আমার এখন ইচ্ছে হ'লো না। তাই তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলাম:

'একটা চল্‌তি প্রবাদ আছে যে শয়তানের যেখানে যাওয়ার সময়ের অভাব হয় সেখানে সে পাঠায় মেয়েদের। কথাটার মধ্যে সত্য আছে কী?'

কাঁধদু'টো নাচিয়ে সে বলে: 'তা হয় বটে···ধূর্ত এবং সংকীর্ণ মনের লোক যদি না থাকে চারপাশে যারা—'

'অসৎকর্মের প্রতি শয়তানের স্বাভাবিক প্রবণতা যেন দেখছি না তোমার মধ্যে!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে জবাব দেয়: 'অসৎকর্ম! অসৎকর্ম বলে তো কিছু নেই আজকাল! শুধু অসভ্যতা, শুধু ইতরতা! এককালে এই অসৎকর্মের একটা শক্তি ছিল, সৌষ্ঠব ছিল। কিন্তু এখন!—মানুষ হত্যা করতে হলেও তা করা হয় এখন অত্যন্ত স্থূলভাবে: হাত পা বেঁধে আবদ্ধ অবস্থায় তাকে ফেলে দেওয়া হয় জল্লাদের হাতে। আসল দুর্জনদের কেউ থাকে না সামনে। আর, জল্লাদ তো ক্রীতদাস—ভীতির শক্তির দ্বারা চালিত, পীড়ন-ভয়ে পরিচালিত একটা হাত ও একটা কুঠার মাত্র।···যাদের ভয় করে, তাদেরই এই দুর্জনেরা হত্যা করে···'

কবরের কিনারে কঙ্কাল দুটো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে···শরতের ঝরা-পাতা ঝরে পড়ে তাদের উপরে, ধীরে ধীরে বেয়ে নামে তাদের হাড়ের গা ছুঁয়ে। পাঁজরের হাড়ের স্পর্শে বিষাদের সুর লাগে বাতাসের গানে, করোটির শূন্য-গর্ভে সে-বাতাস গর্জে ওঠে। চোখের গভীর গর্ত থেকে ঠিকরে বেরোয় স্যাঁতসেঁতে কড়া-গন্ধের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। শীতে কাঁপছে কঙ্কাল দুটো। বেদনায় আমার মন দুলে উঠল। বললাম:

'ওদের কবরে ফিরে যেতে বল, বন্ধু, শীতে ওরা কাঁপছে।'

'হা-হা-হা—, গোরস্থানে এসেও দেখছি, বন্ধু, তুমি মানব-দরদী! তবে হ্যাঁ, ওটার উপযুক্ত স্থান গোরস্থানই বটে। এখানে ওর জন্যে কেউ বিরক্ত হয় না। কয়েদখানায় এবং খনিতে, কারখানায়, শহরের পথে ও পার্কে, যেখানে জীবন্ত মানুষের বাস, সেখানে কিন্তু এই মানবতাবোধ পরিহাসের বিষয়; শুধু কি তাই, ক্রোধের উদ্রেক পর্যন্ত করে। এখানে এই গোরস্থানে ও-নিয়ে কিন্তু পরিহাস করবার কেউ নেই। কারণ, মৃতরা সকলেই সিরিয়স্। মানবতার উপর বক্তৃতা

শুনতে এরা ভালবাসে—এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি—কারণ, এটা এদের মৃত-জাত সন্তান।…না, না এদের বোকা ভেব না, এরা কেউ বোকা নয়। মানুষের জীবনে জমকাল পার্শ্ব-দৃশ্য অবতারনা ক'রে যারা মানুষের বিরুদ্ধে তাদের নারকীয় নির্যাতন আড়াল করতে চায়, মানুষের অজ্ঞানতার আড়ালে থেকে যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী শক্তিমান হ'য়ে উঠে নির্মম হিংস্রতা চালায়, তারা আর যাই হোক্, বোকা নয়…' বলতে বলতে শয়তান হো হো ক'রে হেসে উঠল—স্পষ্টবাদীর কর্কশ হাসি।

অসিতবরণ আকাশের গায়ে তারারা মিটমিট চায়…গত-আয়ুর কবরের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে নিথর ঘনকৃষ্ণ পাথরগুলো। একটা গলিত পচা দুর্গন্ধ মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে আসে…মৃতের নিঃশ্বাস বাতাসে ভর ক'রে ছোটে নিস্তব্ধ রাত্রির কোলে শায়িত ঘুমন্ত পুরীর পথে পথে।

'হ্যাঁ, মানব দরদীদেরও কেউ কেউ এখানে শুয়ে আছে বৈ কি। এদের মধ্যে কেউ কেউ জীবিতকালে সত্যি সত্যি বিশ্বস্ত ছিল—জীবনে তো কতরকম অন্তঃবিরোধই রয়েছে এবং এটাও খুব বিস্ময়ের বিষয়ও নয়…এদেরই ও-পাশে যারা বেশ মিলে মিশে পরম শান্তিতে শুয়ে আছে, তারা হ'ল ঠিক আরেক রকমের লোক, আরেক রকমের জীবন-দর্শন শিক্ষক—যারা হাজার হাজার মৃতের কষ্টে ও পরিশ্রমে তৈরি এই পুরানো মিথ্যার বনিয়াদের নিচে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনার চেষ্টা করেছিল—'

একটা গানের রেশ ভেসে আসে দূর থেকে…গোরস্থানের ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে গড়িয়ে আসে দু'চারটে আনন্দের শব্দ। বোধ হয় কোন দিল-খোলা লোক নিজের অন্ধকার কবরের গহ্বরে আনন্দচিত্তে গান গাইছে।

'দেখ, এখানে এই ভারী পাথরের নিচে যে মহা-পণ্ডিতের দেহ পচ্ছে, তিনি জীবিত কালে শেখাতেন, যে সমাজটা হ'ল একটা বাঁদর কিংবা শুয়োরের বাচ্চার দেহের মত—তুলনায় ঠিক কোন্‌টা বলেছিলেন, এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। এই সমাজের মধ্যে যারা মাথা হ'য়ে থাকতে চায়, তাদের কাছে এই পাণ্ডিত্যের কিন্তু খুবই প্রয়োজন। এই সমাজের প্রায় রাজনীতিবিদরাই, এবং গুণ্ডাদলের সর্দারদের প্রায় সকলেই এই মতে বিশ্বাসী। যদি সমস্ত কিছুর মাথা হই আমি,

ইচ্ছানুযায়ী যখন তখন আমি হাত উঠাতে পারি। মাংসপেশীর স্বাভাবিক প্রতিরোধ আমি অতিক্রম করতে পারি—পারি না! হুঁ!…এইখানে যিনি ধূলোয় মিশে আছেন, তিনি জীবিতকালে বলতেন যে মানুষের ফিরে যাওয়া উচিত সেই সাবেক কালে যখন মানুষ চলাফেরা করত চতুর্অঙ্গের উপর ভর ক'রে, বাঁচত পোকা মাকড় খেয়ে। এই মহা-পণ্ডিতের মতে সেই আদিম যুগই বলে ছিল অত্যন্ত সুখের! সুন্দর দামী পোষাক পরিধান ক'রে, দু' পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে, মানুষের আদিম পুরুষদের মত চুল দাড়ি গজাবার জন্য বক্তৃতা করা —কি বলে, তোমরা যাকে মৌলিক বলো, তাই নয় কি? সঙ্গীত ও কাব্য চর্চা, যাদুঘরে ঘুরে ঘুরে দেখা, দিনে শ' মাইল ছুটে ভ্রমণ করা—এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণকে আদিম আরণ্যক জীবনে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেওয়া, হাতে পায়ে ভর ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বলা—বক্তৃতা হিসেবে চমৎকার, কি বল!…এই যে এখানে যিনি শুয়ে আছেন, জীবিতকালে তার প্রচেষ্টা ছিল জনসাধারণকে শান্ত রাখা। সাধারণের দুঃসহ জীবিকা ব্যবস্থাকে এই মহান পণ্ডিতটি ন্যায্য ব'লে বলতেন কারণ তাঁর মতে অপরাধীরা তো সমাজের অন্যান্যদের মত নয়, তারা হলো দুর্বল চিত্তের মানুষ, একটা অদ্ভুৎ অসামাজিক প্রকৃতির। সমাজের এই সব স্বভাব শত্রুরা সামাজিক নীতি ও নিয়মকানুন তো মানে না, সুতরাং এদের জন্যে অতশত কিছু মানবার প্রয়োজন নেই। তিনি জোর দিয়ে বলতেন যে পাপ কার্যের সঙ্গে যারা জড়িত, মৃতুদণ্ড তাদের শোধরাবার একমাত্র উপায়। চমৎকার চিন্তাধারা! বহুর অপরাধের জন্য কোন একজনকে দায়ী করা, অপরাধপ্রবণ ব'লে ছাপ মেরে দেওয়া,…একেবারে নির্বুদ্ধি ব্যক্তির চিন্তা নয়। হৃদয় বিধ্বংসী কুৎসিৎ জীবন-ব্যবস্থা সমর্থন করার চেষ্টা করছে এমন লোক দেখা যায় অনেক সময়েই। এদের মধ্যে যারা আবার বেশী বুদ্ধিমান তারা তো কারণ দেখিয়ে আসর জমান। অ—, হ্যাঁ, শহুরে জীবন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য হরেক রকমের চিন্তাধারা সমাহিত রয়েছে এই গোরস্থানে…'

দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে চারদিক একবার দেখে নেয় শয়তান। মহাশ্মশানের মৌনতা ভেদ ক'রে বিরাট কঙ্কালের আঙ্গুলের মত একটা শ্বেত গির্জার চূড়া মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নক্ষত্র খচিত ঘনকৃষ্ণ আকাশের নিচে…এই

মহাজ্ঞানের প্রস্রবনের ওপরে ঐ চিমনিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রসস্ত প্রস্তর-প্রাচীর…মানুষের যত প্রার্থনা আর নালিশের তীব্র ধূম্র বেরিয়ে যায় ঐ চিমনি দিয়ে। বাতাসে বয়ে আসে পচনের দুর্গন্ধ, গাছের ডালগুলো দুলে ওঠে সে-দুর্গন্ধে, শুকন মৃত পাতাগুলো ডাল থেকে ঝরে পড়ে নীরবে সমাজ-জীবনের স্বর্গীয় অধিদেবতাদের আবাস-ভূমের উপরে…

স্মৃতি-সৌধের মধ্য দিয়ে সর্পিল পথ দিয়ে আমার আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে শয়তান বলে : 'আচ্ছা, এক কাজ করা যাক! মৃতদের নিয়ে শেষ-বিচারের দিনের প্যারেডের একটা মহলা করা যাক, কি বল! শেষ-বিচারের দিন একটা আসবে এবং আসবে এই পৃথিবীতেই! সেদিনের সেই দিনটি মানুষের কাছে সত্যিকারের একটা সুখের দিন হবে! যেদিন সব মানুষ বুঝতে পারবে কী সাংঘাতিক ক্ষতি করছে এইসব শিক্ষক ও সমাজের নীতি-নিয়ামকরা যারা মানুষের জীবনকে ছিড়ে টুকরো টুকরো ক'রে পরিণত করেছে তাকে শুধুমাত্র রক্ত মাংসের দেহে, সেদিন আসবে সেই সুদিন। মানুষ বলতে আজ যা বোঝায়, তা হ'ল মানুষের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পূর্ণ সত্বার মানুষ আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি এদের কল-কাঠির দৌরাত্বের জন্য। দুনিয়ায় পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার স্তূপ থেকে সেই মানুষ উঠে আসবে ; সূর্যের কিরণ সমুদ্র যেভাবে গ্রহণ করে নিজের সত্বার সঙ্গে মিশিয়ে, মানুষও সেইভাবে সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে দ্বিতীয় সূর্যের মত তার সব উজ্জ্বলতা নিয়ে পৃথিবীর উপরে উদয় হবে। সেদিনের অপেক্ষায় আমি বসে আছি। সেই মানুষই আমি সৃষ্টি করব এবং সে-মানুষ আসবে!'

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে যেন একটু অহঙ্কারের রেশ ফুটে ওঠে, ভবিষ্যতের বর্ণনা করতে গিয়ে গীতিকাব্যের ভাবধারায় যেন একটু অভিভূত হ'য়ে পড়ে সে। এরকমটি কিন্তু শয়তানের সচরাচর হয় না। শয়তানের এই বিচলিত ভাবকে আমি ক্ষমা করলাম। আর এই বিচলিত হওয়াটাও কি খুব আশ্চর্যজনক? বর্তমানের জীবন-ব্যবস্থা শয়তানকেও দুমড়িয়ে দেয়, চারধারের বিষাক্ত ব্যবস্থা তারও সুগঠিত মনকে কুঁকড়ে খায়। তারপর আর একটা কথা…সকলের মাথাই তো গোলাকার, কিন্তু চিন্তাধারাগুলো সব কোণা মেরে চলে…আয়নায় নিজের মুখ দেখে তো প্রত্যেকেরই নিজেকে সুন্দর মনে হয়।

কবরের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শয়তান হঠাৎ দাঁড়িয়ে রাজকীয় কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে :

'বিজ্ঞ ও সাচ্চা কারা আছে তোমাদের মধ্যে ?'

নিথর নিস্তব্ধ চারিদিক…। হঠাৎ আমার পায়ের নিচে মাটি তুলে উঠল, মনে হ'ল যেন নোংরা তুষার জমে উঠছে পাহাড়ের চূড়ায়, যেন সহস্র বিদ্যুৎ তাই ফেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে ; মনে হ'ল যেন একটা বিরাট দৈত্য তার গহ্বরের চারিদিক প্রকম্পিত ক'রে নড়ে উঠছে। আমাদের চারধারের সব কিছু যেন নোংরা হলদেটে হ'য়ে উঠল ; ঝড়ের মুখে শুকন খড়কুটোর মত গোরস্থানের চারদিক থেকে কঙ্কালরা উঠে আসতে লাগল ; গোরস্থানের নিথর নিস্তব্ধতা মুহূর্তে শেষ হ'য়ে চারিদিক ভরে গেল হাড়ের মট মট শব্দে, সমাধিস্তম্ভের ও কঙ্কালগুলোর পরস্পরের হাড় ঠোকাঠুকির খট খট শব্দে। গোরস্থানের চারিদিকে করোটি উঁচিয়ে বেরোতে লাগল কঙ্কালরা ; পরস্পরকে ধাক্কা মেরে তারা বেরিয়ে আসতে লাগল কবর থেকে। আমার চারদিকে কঙ্কালের পাঁজরগুলো ঘিরে ধরল…সংকীর্ণ খাঁচায় আমি যেন বন্দী…। কঙ্কালগুলোর কটিদেশের ভীতিজনক বেরিয়ে-আসা হাড়ের ভারে তাদের পায়ের নলিগুলো কাঁপছে…চারদিকে একটা মূক কর্মব্যস্ততার আলোড়ন…সবকিছু যেন টগবগ ক'রে ফুটছে…

হিমশীতল অট্টহাস্যে সবকিছু ডুবিয়ে দিয়ে শয়তান বলে উঠল :

'দেখলে, দেখলে ! সবগুলো উঠে এসেছে, একটা কঙ্কালও আর বাকী নেই…এমন কি শহরের নির্বোধগুলো পর্যন্ত উঠে এসেছে !…এদের জ্ঞানের ভারে অসুস্থা বসুমতী তার অভ্যন্তর থেকে সবগুলোকে উগরিয়ে বের ক'রে দিয়েছেন…'

ক্রমশঃ শব্দ বেড়েই চলে…একটা অদৃশ্য হস্ত যেন ভিজে স্যাঁতসেঁতে জঞ্জালের মধ্যে কী একটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছে…

'পৃথিবীতে এত জ্ঞানী ও সাচ্চা লোক বাস করত, তুমি আগে জানতে !' তার পাখাদুটো বিস্তৃত ক'রে শয়তান বলে উঠল। তারপর কঙ্কালদের উদ্দেশ ক'রে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল সে :

'মানুষের উপকার তোমাদের মধ্যে কে সব থেকে বেশী করেছে ?'

বিরাট কড়াতে ফুটন্ত তেলে ব্যাঙের ছাতা ফেলে দিলে যেরকম ছ্যাক ছ্যাক শব্দ হয় সেইরকম শব্দ উঠতে লাগল চারদিক থেকে।

নাকিস্বরে একটা কঙ্কাল বলে উঠল :

'অনুগ্রহ ক'রে আমাকে একটু এগোতে দাও ভাই তোমরা—!'

'প্রভু, আমি সেই লোক, আমি সেই লোক! আমিই প্রমাণ করেছিলাম যে সমাজে একক ব্যক্তি হ'ল একটা শূন্য, আর কিছু নয়—'

একটু দূর থেকে একটা প্রতিবাদ ভেসে এল :

'উঁহুঁ, উঁহুঁ, আমি তার থেকেও এগিয়ে গিয়েছিলাম প্রভু! আমি বলেছিলাম যে সমস্ত সমাজটাই হ'ল শুধু শূন্যের যোগফল এবং এইজন্যে জনসাধারণকে সব সময়েই কোন না কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হুকুমে কাজ করতে হবে।'

বেশ জাঁকাল মোটা গলায় আরেকজন চেঁচিয়ে উঠল : 'এবং গোষ্ঠী চালক হ'ল ব্যক্তি, নেতা—অর্থাৎ আমি!'

'তুমি কেন ?' কয়েকটি সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর একসঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

'আমার কাকা ছিলেন রাজা!'

'অ! তাহ'লে মহামহিমান্বিত হুজুরের কাকার মাথাটাই অকালে কাটা পড়েছিল!'

কোন্ এক রাজবংশধর গর্বিতকণ্ঠে বলে ওঠে :

'হ্যাঁ, রাজাদের মাথা ঐ ভাবে কাটা যায় বৈকি।'

'ও হো! আমাদের মধ্যে তবে একজন রাজা আছেন! কোন্ গোরস্থান এরকম রাজার গর্ব করতে পারে ?' আনন্দ-বিহ্বল ফিসফিসানি শোনা যায় একটি কঙ্কালের মুখ থেকে।

ন্যুব্জ মেরুদণ্ডের একটা কঙ্কাল জিজ্ঞাসা করে :

'আচ্ছা, রাজরাজরাদের হাড়ের রং বলে নীল হয়—?'

'শোন বলছি···' পা ঝুলিয়ে বসেছিল একটা কঙ্কাল, সে বলতে সুরু করল। পিছন থেকে আরেকটা কঙ্কাল চেঁচিয়ে উঠল :

'বাজারের সব থেকে ভাল পায়ের কড়া সারবার মলম আমি আবিষ্কার করেছিলাম !'

'আমি ছিলাম একজন স্থপতি—' আর একটা কঙ্কাল বলে উঠল আর এক কোণ থেকে। একটা বেটে মোটা কঙ্কাল তার মোটা মোটা আঙ্গুলের হাড় দিয়ে সকলকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠে :

'হে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভাইসব ! তোমাদের নীতিবোধের চিকিৎসক কে ছিল ভুলে গেলে ? ছিলাম আমি। জীবনের দুঃখ দৈন্যের আঘাতে মনের উপরে যে ক্ষত হয় তার উপর সান্ত্বনার মলম প্রলেপ ক'রে দিত কে ? এই যে আমি। মনে পড়ে কি ভাইসব ?'

বিরক্ত মেশানো কণ্ঠে একজন বলে উঠল : 'দুঃখ দৈন্য আবার কি ? ওসব কিছু নেই…ওসব হলো মনের ব্যাপার…সবকিছু তো শুধু মানুষের কল্পনার মধ্যেই বিরাজ করে…'

'…যে-স্থপতি নিচু দরজার বাড়ীর পরিকল্পনা করেছিল…'

'এবং মাছিমারা কাগজের উদ্ভাবক আমি—!' আরেকটি কঙ্কাল বলে।

'হুঁ, যাতে গৃহ-প্রবেশের সময় কর্তার কাছে মাথা নুইয়ে প্রত্যেককে প্রবেশ করতে হয়—' সেই বিরক্তি মেশানো কণ্ঠ বলে ওঠে।

'প্রথম সুযোগ আমি পাব না কেন, ভাইসব ! আড়ম্বরপূর্ণ অনিত্ব যা কিছু চারধারের, যা কিছু পার্থিব, তা ভুলে থাকার জন্য মনের খোরাক যোগিয়েছে আমার চিন্তাধারা…'

উখ-ঘষা কণ্ঠে কে একজন গুন গুন ক'রে ওঠে : 'যা আছে—তাই তো থাকবে চিরদিন !'

একটা ধূসর পাথরের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিল খঞ্জ কঙ্কাল একটা। তার পা-খানা সোজা টান ক'রে তুলে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে :

'ঠিক, ঠিক ! কোন সন্দেহ নেই তাতে !'

গোরস্থান যেন হাটে পরিণত হ'য়ে গেল। পসরা বিকিকিনির হৈ হুল্লোড় চিৎকার সুরু হ'য়েছে চারদিকে। এ যেন চাপা-চিৎকারের পঙ্কিল নদী বয়ে চলেছে, যেন স্থূল অহঙ্কার ও দুর্গন্ধ দম্ভের দুকূলপ্লাবী বান এসে নিস্তব্ধ অন্ধকার

রাত্রিকে ডুবিয়ে দিচ্ছে···যেন এক পচা দুর্গন্ধ জলাভূমির উপর উড়ছে এক ঝাঁক ডাশ···তাদের ভন ভন শব্দে এবং বোঁ বোঁ গুনগুনানি ও কান্নায় চারধার মুখরিত···এদের বিষদুষ্ট নিঃশ্বাসে ও নিচের কবরের বিষাক্ত বাষ্পে উপরের বাতাস ভরপূর। শয়তানকে ঘিরে চারধার থেকে কঙ্কালরা সব ভিড় ক'রে আসছে···ওদের দাঁতগুলো কড়মড় করছে, চোখের অন্ধকার গহ্বরগুলো শয়তানের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টিতে স্তব্ধ হ'য়ে আছে,···শয়তান যেন লোনা মাংসের কারবারী।···এদের পুরোনো স্মৃতি সব যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠে আসছে, বসন্তের বিষণ্ণ ঝরাপাতার মত যেন তারা বাতাসে উড়ছে।

সবুজ চোখ মেলে শয়তান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কঙ্কালদের এই কর্মব্যস্ততার বুদ্ বুদ্ ফাটা, তাকিয়ে দেখে তাদের ঐ হিমশীতল দৃষ্টি প'ড়ে হাড়ের গাদায় যে ফসফরাসের ঝিকিমিকি উঠছে সেই দিকে।

শয়তানের পায়ের কাছে যে কঙ্কালটি বসেছিল সে তার খুলির উপরে হাতের হাড় তুলে বেশ ছন্দোবদ্ধ ভাবে নাড়তে নাড়তে আস্তে আস্তে বলে উঠল :

'প্রত্যকটি মেয়ের এক একটি পুরুষের আওতায় থাকা উচিত—'

এরই কথার মধ্যে আরেকটি কণ্ঠস্বর অদ্ভুৎভাবে মিশে গিয়ে ফিসফিস ক'রে বেরিয়ে এল : 'সত্য-জ্ঞান লাভ করা একমাত্র মৃতের পক্ষেই সম্ভব !'

আরেকটি ফিসফিসানির শব্দ শোনা যায় :

'আমি ঘোষণা করেছিলাম যে বাপ হলো মাকড়সার মত—'

'মানুষের জীবনটাই ভ্রম, শুধু ভ্রম, পূর্ণ অজ্ঞানতার আকর!' আরেকটি কণ্ঠস্বর।

'আমি তিন তিনবার বিয়ে করেছি এবং তিনবারই বৈধভাবে···'

'এবং প্রত্যেকবারেই সে বেশ সুষ্ঠুভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করবার চেষ্টা করেছে···!'

'হুঁ···এবং প্রতিবারই এক একটি মেয়েকে নিয়ে···!'

হঠাৎ এই সময়ে একটা হলদেটে শতছিদ্র বিশিষ্ট কঙ্কাল এসে হাজির হলো। শয়তানের চোখ বরাবর তার প্রায়-ক্ষয়ে-যাওয়া মুখটা তুলে বলে উঠল :

'আমি মরেছিলাম সিফিলিস রোগে। কিন্তু তা হলেও সামাজিক নীতি নিয়মের প্রতি আমার সম্মানবোধ ছিল। যখন দেখলাম যে আমার স্ত্রী আমার

প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমি নিজে এই ব্যাপারটা তুলে ধরলাম বিচারালয়ে ও সামাজিক বিচার-বুদ্ধির দরবারে। স্ত্রীর এই চরিত্রদোষের জন্য বিচার হয়েছিল…'

চারদিক থেকে অন্যান্য কঙ্কালের ধাক্কা খেয়ে সে সরে গেল। চিমনির ভিতরের বাতাসের গোঙানির মত আবার সুরু হ'ল একসঙ্গে কঙ্কালদের চাপা গুনগুনানি:

'আমি কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক্ চেয়ার আবিষ্কার করেছিলাম! এতে কষ্ট না দিয়ে বেশ সুষ্ঠুভাবে মানুষের জীবন নিয়ে নেওয়া যায়…'

'মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বলতাম মৃত্যুর পর তোমার জন্য রয়েছে স্বর্গীয় আনন্দ…'

'সন্তানের জীবন ও খাদ্য দেয় বাপ…বাপ হওয়ার পরেই মানুষ ঠিক পূর্ণ সত্ত্বা পায়, তার পূর্ব পর্যন্ত সে থাকে শুধু পরিবারের একজন হ'য়ে…'

একটা ডিমাকৃতি খুলিওলা কঙ্কালের মুখে তখনও কিছু কিছু মাংস লেগে ছিল। অন্যসব কঙ্কালের মাথার উপর দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:

'আমি প্রমাণ করেছি কেন শিল্প-কলাকে সমাজের নানা ধরণের জগাখিচুড়ী মতবাদ, মন্তব্য, অভ্যাস ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে…'

পাথরের তৈরি একটা ভাঙ্গা গাছের স্মৃতি-সৌধের ওপরে পা ঝুলিয়ে বসেছিল একটি কঙ্কাল। সে বক্রোক্তি ক'রে উঠল:

'বিশৃঙ্খলার মধ্যেই মাত্র মানুষের আজাদী থাকতে পারে—'

'কর্ম ও জীবনে যে লোক ক্লান্ত, তার পক্ষে শিল্প-কলা একটা ভাল ওষুধ…'

দূর থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়: 'জীবন মানেই কাজ, শুধু কাজ, এ কথা আমিই বলেছিলাম…'

'বুঝলে হে, বই হওয়া উচিত ওষুধের দোকানের সুন্দর ছোট ছোট বড়ির বাক্সের মত…'

'কাজ করবে সকলেই কিন্তু সেইসব কাজের তদারক করার জন্য তাদের সকলের ওপরে থাকা উচিত কিছু লোকের …'

'শিল্প-কলা হওয়া উচিত সংগতিপূর্ণ এবং নিঃস্বার্থ…পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়লে আমি চাইব শিল্প-কলার কাছে বিশ্রামের সঙ্গীত…'

শয়তান বলে ওঠে : 'কিন্তু আমি চাই সেই শিল্প-কলা যা শুধু সৌন্দর্যের উপাসনাই করে, অন্য কোন দেবীর পূজারী সে নয়। আমার ভাল লাগে যখন দেখি এই শিল্প সচ্চরিত্র যুবকের মত অমর অক্ষত সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখে সেই আকাঙ্খিত সৌন্দর্য দেখতে চেয়ে জীবনের উপর থেকে চক্‌চকে আবরণ উন্মোচন ক'রে দেখে যে অনাবৃত জীবন দাঁড়িয়ে আছে সামনে তা হলো এক স্মরাতুর লম্পটের···তার সমস্ত দেহটার ওপরে দগদগে ঘা, দেহের ত্বক কুঞ্চিত···এ চিত্র দেখে তখন কেমন একটা উদ্দাম ক্রোধ, সৌন্দর্যের প্রতি উদগ্র স্পৃহা, অনড় জীবনের পাঁকের প্রতি তীব্র ঘৃণা জেগে ওঠে···। হ্যাঁ, আমি চাই এই চিত্র, আমি চাই শিল্প-কলার কাছে এই জিনিসই।···জান তো, একজন সত্যিকারের কবির বন্ধু হ'ল শয়তান ও নারী···'

ঘুমটি ঘরের ঘন্টার বিলাপ উচ্চৈঃস্বরে গোঙাতে গোঙাতে গড়িয়ে চলে নির্জীব শহরের উপর দিয়ে, বিরাট পাখীর স্বচ্ছ ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার মত সে-বিলাপ অন্ধকারে অতীন্দ্রিয়···। ঘুমন্ত প্রহরী হয়তো অলসভরে শিথিল হাতে ঘন্টির দড়ি ধরে টান দিয়েছে। ঘন্টার কাংস্য আওয়াজ গলে গলে বাতাসে মিশে গেছে। কিন্তু এর শেষ রণন মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে রাত্রির সজাগ সতর্ক ঘন্টা স্পষ্ট ও তীব্রভাবে বেজে ওঠে। আর্দ্র বাতাস মৃদু কম্পনে শিউরে ওঠে আর কম্পমান ঘণ্টার গুন গুন শব্দের থমথমানির মধ্যে শোনা যায় হাড়ের মড়মড়ানী ও কঙ্কালের চাপা শুকনো কলকাকলি।

আবার শুনতে পাই সেই স্থূল অসহনীয় নিন্দাবাদ, সেই চট্‌চটে এটেল ইতর কথাবার্তা, সেই জাকজমকপূর্ণ ভণ্ডামীর প্রগলভতা, সেই বিরক্তিপূর্ণ আত্মম্ভরিতার নির্লজ্জ লম্বা বক্তৃতা। সেইসমস্ত চিন্তাধারা যার মধ্যে শহুরে লোকদের বাস করতে হয়, একে একে সবগুলো আওড়ানো হলো কিন্তু হলো না তার একটাও যা নিয়ে সত্যি সত্যি গর্ব করা যায়। মানুষের মনকে, মানুষের সত্ত্বাকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যেসব মরচে-ধরা শৃঙ্খল সেগুলো সব কান ঝালাপালা শব্দে ঝন ঝন করতে লাগল, কিন্তু মানুষের জীবনের সেই অন্ধকারকে বিদূরিত করবার জন্য যে আলো জ্বলে থাকে, তার বর্ণনা একটিবারও হলো না।

আমি শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'আচ্ছা, বীর যোদ্ধারা সব কোথায় ?'

'তারা তো বিনয়ী ব্যক্তি, তাদের সমাধির কথা তো কেউ মনে ক'রে রাখে না। জীবিতকালেও তারা অত্যাচারিত হয়, মরার পরেও এইসব কঙ্কালরা তাদের চূর্ণ ক'রে দেয়!' পচনের তৈলাক্ত দুর্গন্ধের মধ্যে পোকার মত এদের কর্কশ স্বর আমাদের ঘিরে ধরেছে। তাই সরিয়ে দেবার জন্য ডানা নাড়তে নাড়তে শয়তান উত্তর দিল।

একজন মুচী বলল যে মুচী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সর্বপ্রথম চোখা-মুখো বুটের পরিকল্পনা করেছিল যার জন্য জুতো প্রস্তুতকারীদের সকলেরই তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। হাজার রকমের মাকড়সার বর্ণনা দিয়ে যে বৈজ্ঞানিক বই লিখেছিলেন তিনি উচ্চৈঃস্বরে দাবী করতে লাগলেন এই বলে যে তিনিই হলেন বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ। নকল দুধের আবিষ্কারক যিনি তিনি দ্রুত-গুলিবর্ষী বন্দুকের নির্মাতার প্রচার মুখর বক্তৃতাকে থামিয়ে দিয়ে, তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে, ক্রোধে কাঁদতে সুরু করলেন। সাপের ফণার মত হাজার হাজার পিচ্ছিল সূক্ষ্ম দড়ির বাঁধন তাদের মগজের উপর যেন আরও শক্ত হ'য়ে এঁটে বসতে লাগল। এবং হাজার হাজার মৃত, তাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, নীতি-বাগীশদের মত বক্তৃতা সুরু করল, জীবনের কয়েদখানার অধিকর্তাদের মত নিজেদেরই কর্মকুশলতার বাণী শুনিয়ে আত্মবিনোদন সুরু করল।

শয়তান গর্জে ওঠে: 'হয়েছে, হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে! আর না···তোমাদের এই বকবকানি শুনে শুনে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি···গোরস্থানের এই মৃতদের দেখে এবং সুষুপ্ত জীবিতদের গোরস্থান শহরের সবকিছু দেখে আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।··· হ্যাঁ, তোমরা সত্যের রক্ষক যারা, এবারে সব কবরে ফিরে যাও দেখি!···'

রাজার আদেশের সুর শয়তানের কণ্ঠস্বরে, যে-রাজা তার নিজের ক্ষমতায় নিজেই বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে।

শয়তানের হুকুম শুনে ধূসর ও হলদে বস্তুগুলো ঘূর্ণীর-মধ্যে-পড়া রাস্তার ধূলোর মত উড়তে উড়তে গড়াতে গড়াতে হিসহিস শব্দে ছুটে চলল যার যার কবরের দিকে। অন্ধকার চোয়াল ব্যাদান ক'রে কবরগুলো কঙ্কাল-গুলোকে মুখের মধ্যে গিলে নিয়ে হা বন্ধ ক'রে দিল। একটা শব্দ উঠল প্রতিটি কবর থেকে, অলস ককানো শব্দ, পেটপুরে খাওয়ার পর শুয়োর যেরকম

শব্দ করে সেইরকম। যে খাদ্যগুলো উগরিয়ে দিয়েছিল তাই আবার গিলে খেয়ে নতুন ক'রে হজম করার কাজ সুরু করল পৃথিবী…। মুহূর্তে সবকিছু মুছে গেল এবং স্মৃতিসৌধগুলো নড়েচড়ে আবার নিজ নিজ স্থানে শক্ত হ'য়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ভারী ভিজে হাতের চাপের মত কেমন একটা দম-বন্ধ-করা দুর্গন্ধ তখনও আমার গলায় চেপে বসে আছে।

হাঁটুর ওপর কনুই রেখে একটা স্মৃতিসৌধের ওপরে শয়তান বসে তার কালো হাতের লম্বা আঙুল দিয়ে মাথা টিপতে থাকে। চারদিকের নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে স্মৃতিসৌধ এবং সমাধিগুলোর উপর তার দৃষ্টি স্থির হ'য়ে থাকে…উপরের আকাশে তারারা জ্বল জ্বল করে; সেখানকার ঘন অন্ধকারও পাতলা হ'য়ে আসছে …ঘন্টার ধীর ধ্বনি সেখানে গিয়ে পৌঁছোয়…ঘুম থেকে জেগে ওঠে রাত্রি…

শয়তান ধীর কণ্ঠে বলে : 'দেখলে তো বন্ধু! কেমন বিপজ্জনক, চট্‌চটে, বিষাক্ত, ছাতা-পড়া বলদামীর উপর অকৃত্রিম ভণ্ডামী ও আঠালো অন্ধ ইতরামীর কাঠামোর মধ্যে তৈরি হয়েছে মানুষের মনকে আবদ্ধ ক'রে রাখবার নিয়মাবলী, তৈরি হয়েছে একটা খাঁচা যার মধ্যে তোমরা সকলে বন্দী হচ্ছ বলির পাঁঠার মত…। মানুষের মনের মন্থরগতি এবং ভয় হ'লো ধর্মযাজকের পরিচ্ছদের উপরের নমনীয় দড়ির মত। তোমাদের কয়েদখানার খাঁচাকে এই দিয়েই আবদ্ধ ক'রে রাখে। তোমাদের জীবনের সত্যিকারের অধিদেবতারা কারা জান? এই মৃতরা।…জীবন্ত লোকেরা তোমাদের শাসক হলেও, তারা আসলে কিন্তু মৃতদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত। পার্থিব অভিজ্ঞানের গোমুখী হ'ল এই সমাধিস্থান। কিন্তু আমি কি বলি জান! আমি বলি যে তোমাদের সাধারণ জ্ঞান-অভিজ্ঞান হ'ল ফুলের মত; এবং এসব জন্মায় যে-মাটির উপরে সে-মাটি উর্বরা হয় মৃতদেহের রস গ্রহণ ক'রেই। মাটির নিচে মৃতদেহগুলো তো অতি শীঘ্রই পচে যায়। তবুও এইসব মৃতদেহের অধিকারীরা জীবিতদের মনের কন্দরে চিরদিন বেঁচে থাকার কামনা করে। মৃত চিন্তাধারার শুকনো চূর্ণগুলো অতি সহজেই জীবিতদের মগজে প্রবেশ ক'রে থাকে; সেইজন্যেই, বুঝলে বন্ধু, তোমাদের সামাজিক অভিজ্ঞানের প্রচারক পণ্ডিত মশাইরা সর্বসময়েই মানুষের সত্ত্বার অনিত্ব সম্বন্ধে গাল ভরা বক্তৃতা ক'রে থাকেন।'

শয়তান তার হাতটা উর্ধ্বে তুলে ধরে…তার সবুজ চোখ দুটো হিমশীতল নক্ষত্রের মত আমার মুখের উপর স্থির হ'য়ে থাকে…

'খেয়াল করেছ কি বন্ধু, এই পৃথিবীতে সব থেকে তৎপরতার সঙ্গে কোন্ জিনিসটা প্রচার করা হ'য়ে থাকে? অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত নিয়ম ব'লে কোন্ জিনিসটার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়ে থাকে? সেটি হ'ল মানুষের জীবনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ক'রে রাখা…একদিকে সাধারণের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা জীইয়ে রাখার আইনী ব্যবস্থা রাখা, আর একদিকে সকলের আত্মার একাত্মতার উপর জ্ঞানের ধারা-বর্ষণ করা…যারা শাসক গোষ্ঠী তাদের ইচ্ছানুযায়ী জ্যামিতিক নক্সায় যাতে এইসব একঘেয়ে আত্মার-ঐকাত্ম্যে-বিশ্বাসী সব মানুষের মনকে সাজিয়ে ফেলা যায়। এই সব ভণ্ডামিপূর্ণ উপদেশামৃত শিক্ষা দেয় গোলামী জীবনের তিক্ততা ভুলে গিয়ে মনিব গোষ্ঠীর হিংস্র কপটতার সঙ্গে সমঝোতা করতে; এদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিবাদ যাতে ভাষা না পায় তার জন্যই এই হীন চক্রান্ত। কি বলবে একে? মানুষের মুক্ত জীবনী শক্তিকে মিথ্যার গম্বুজের নিচে সমাহিত ক'রে রাখবার হীন পরিকল্পনা ছাড়া এ আর কিছুই নয়…'

উষার ক্ষীণ আলো দেখা যায় দিকচক্রবালে। সূর্যের আলোর আশায় নক্ষত্ররা সব নীরবে আকাশের কোলে পাণ্ডুর হ'য়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু শয়তানের চোখ দুটো যেন আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

'কি শিক্ষা পেলে মানুষ তার জীবন আরও সম্পূর্ণ আরও সুন্দর করতে পারে?…সকলের একরকম অবস্থা এবং মনের উন্নতির বিভিন্ন ব্যবস্থা—এ হ'লেই দেখবে মানুষের জীবনে প্রস্ফুটিত হবে ফুল…পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধের রস পান ক'রে বেড়ে উঠবে সেই ফুলের দল। উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠবার জন্য পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ ও সহৃদয় বন্ধুত্বই হবে এই রসপ্রস্রবনের মূলাধার। তখন দেখবে শুধু আদর্শ, শুধু চিন্তাধারা নিয়ে কত হৃদ্যতামূলক আন্দোলন…মানুষ থাকবে সব সময়েই সুহৃদ, বন্ধু হ'য়ে। তোমার কি মনে হয় এই ভবিষ্যৎ চিত্র অবাস্তব?—আমি কিন্তু বলি যে এইটেই ঘটবে!…'

পূব দিগন্তে তাকিয়ে শয়তান আবার বলে: 'দিন হ'য়ে এলো।…মানুষের মনে যখন রাত্রির অন্ধকার, সূর্যের আগমনে কি তার জীবনে আনন্দ আসবে না?

দিবসের আনন্দ উপভোগ করতে পারে কই মানুষ—প্রায় সকলেই তো ব্যস্ত থাকে জীবিকা যোগাড়ের চেষ্টায়…। কেউ কেউ চেষ্টা করে এই প্রচেষ্টার কথা যত কম ক'রে প্রকাশ করতে; কেউ কেউ একাকী ঘুরে বেড়ায় মুক্তির সন্ধানে জীবনের এই হৈ-হুল্লোড় গোলমালের মধ্যে…কিন্তু এটা তাদের জীবিকা সংগ্রহের কঠিন বাস্তব সংগ্রাম থেকে পালিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই নয়। দুঃস্থ, আশাহত, একাকী জীবনের তিক্ততা তারপর তাদের চালিত করে এই অসঙ্গত সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমঝোতা ক'রে নিতে। এবং এইভাবে অনেক ভাল ভাল সাচ্চা লোক জঘন্য মিথ্যার দহে ডুবে যায়—প্রথমে সুরু করে না-বুঝেই, নিজেদের সঙ্গেই যে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাও তখন তারা ধরতে পারে না। কিন্তু এ-অজ্ঞানতা কত দিন?…তারপরে বেশ বুঝেসুঝে স্থির মস্তিষ্কে নিজেদের পূর্ব বিশ্বাস ও আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে…'

উঠে দাঁড়ায় সে। তার বিরাট ডানা দুটো মেলে দাঁড়ায়।

'আমিও, বন্ধু, বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খার পথে যাব…'

এবং, তাম্রঘণ্টার বিষণ্ণ ঢং ঢং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে, শব্দের রণন মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সে উড়ে গেল পশ্চিমের দিকে…

* * *

আমার এই স্বপ্ন-কাহিনী আমি গল্প করলাম একজন আমেরিকানের কাছে। অন্যান্য আমেরিকানদের থেকে তাকে একটু বেশী মানব-গুণ বিশিষ্ট বলে আমার ধারণা হয়েছিল। আমার কাহিনী শুনে বসে বসে সে কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর একটু হেসে আনন্দের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল:

'বুঝেছি, বুঝেছি! শয়তান হ'লো কোন শবদাহ-কলের-চুল্লী কোম্পানীর এজেন্ট! হুঁ, নিশ্চয়ই তাই! তার বক্তব্য থেকে শব যে দাহ করা দরকার এটাই বেশ পরিষ্কার ফুটে বেরিয়ে আসে।…কিন্তু তোমাকে মানতেই হবে যে অত্যন্ত উপযুক্ত এজেন্ট সে! তার কোম্পানীর জন্যে সে মানুষের স্বপ্নে পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে…! সত্যিই উপযুক্ত এজেন্ট…'

[অনুবাদ : পার্থ কুমার রায়

চেলকাশ

ডকের ধুলোয় দক্ষিণের নীল আকাশ সীসে রংএর হয়ে উঠেছে ; পাতলা ধূসর আবরণের ভেতর দিয়ে রক্তিম সূর্যের ক্ষীণ কিরণ পড়েছে নিচের সবুজ সমুদ্রের উপরে। জলের উপরে সূর্যের আলো যেন আর প্রতিফলিত হয় না। জনাকীর্ণ বন্দরকে চষে ফেলে জাহাজের চাকা, তুর্কী ফেলুকার চোখা হাল, নৌকোর দাঁড় ও নানাধরণের জলযান সমস্ত জলকে অবিরত আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে যাতায়াত করছে। মাথার উপরের বিরাট বোঝায় নুয়ে পড়ে পাথরের দেয়ালে আবদ্ধ ক্ষুব্ধ ফেনিল জলরাশি বারে বারে আঘাত করছে জাহাজের পার্শ্বদেশে, ফুলে ফুঁসে আছড়ে পড়ছে তটভূমিতে।

নোঙরের শেকলের ঝন্‌ঝন্, মালবাহী রেলগাড়ীর বাফারের সংঘর্ষ, পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণে প'ড়ে লোহার পাতের আর্তনাদ, কাঠের উপরে কাঠের ধুপধাপ ভারী শব্দ, ভাড়াটে গাড়ীর ক্যাঁচক্যাঁচ, জাহাজের সাইরেনের তীক্ষ্ণ গর্জন আর ডকের কুলি মজুর, নাবিক, শুল্ক-কর্মচারীদের চিৎকার—কর্মমুখর দিবসের কানে-তালা লাগানো ঐকতান !···বন্দরের ওপরে সে-চিৎকার যেন মেঘের মত ঝুলে আছে। আর সেই সঙ্গে মাটি থেকে উঠে তাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে শব্দের নতুন নতুন তরঙ্গ। চারদিকে একটা গুম্ গুম্ ধ্বনি ! সব যেন কাঁপছে। কান ফাটানো তীক্ষ্ণ ভয়ংকর শব্দ ধুলিধূসর আর্দ্র বাতাসকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিচ্ছে।

পাথর, লোহা, বন্দরের শান-বাঁধানো আঙিনা, জাহাজ আর মানুষ—সম্মিলিত ভাবে যেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উদ্দেশে উন্মত্ত স্তবগান ক'রে চলেছে। কদাচিৎ শোনা যায় মানুষের কণ্ঠস্বর। কী অদ্ভুত দুর্বল ! এই সব বিরাট শব্দের উৎস সৃষ্টিকারী মানুষকে কত দুর্বল মনে হয়, করুণা করতে ইচ্ছে করে। পিঠের বোঝায় ন্যুব্জ মানুষ ভাবনা চিন্তায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায় এখানে সেখানে, ধুলোবালি, গুমট গরম আর কোলাহল-চিৎকারের মহাসমুদ্রে···মানুষের নিজের

হাতে গড়া বিরাট লৌহদানব, পাহাড়-উঁচু গাঁট আর ভীষণ গর্জন রেলগাড়ী ও চারিদিকের কত কিছুর তুলনায় কত ক্ষুদ্র কত তুচ্ছ মনে হয় তার শীর্ণ মলিন অবসন্ন দেহ! তার নিজেরই সৃষ্ট সমস্ত কিছু যেন তার ব্যক্তিত্ব হরণ ক'রে গোলাম ক'রে রেখেছে তাকে।

জাহাজগুলো বিরাট দৈত্যের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গর্জে উঠে হিস্ হিস্ শব্দে মর্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে; তাদের প্রতিটি শব্দে বিষণ্ণ মানুষগুলোর উপর বিদ্রূপমাখানো ঘৃণা যেন ঝরে পড়ে; ডেকের উপর গুড়ি মেরে জাহাজের গভীর গহ্বর ভর্তি করে তারা তাদের হাড়-ভাঙ্গা গোলামীর শ্রমে। সার বেঁধে চলেছে ডকের মজুররা…কী করুণ চিত্র…! নিজেদের উদরপূর্তির জন্য এক মুঠো ভাতের আশায় হাজার হাজার মন ধান পিঠে বয়ে জাহাজের লৌহ-উদর ভরে তুলছে জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত ঘর্মাক্ত লোকগুলো; উত্তাপ, কোলাহল আর ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। রোদে চক্‌চক ক'রে উঠছে তাদেরই হাতের তৈরি শক্তির আধার এই যন্ত্রগুলো। যন্ত্রের সর্বশেষ আশ্রয় তো মানুষই। বাষ্প তাকে চালায় না; চালায় যন্ত্রের স্রষ্টিকর্তা মানুষেরই রক্ত আর পেশী। মানুষকে নিয়ে কী নিষ্ঠুর ব্যঙ্গকাব্য…!

সর্বগ্রাসী কোলাহল, নাক জ্বালা-করা, চোখ-ধাঁধানো ধুলো, শরীর ঝলসানো অসহ্য তাপ চারদিকের সব কিছু উত্তপ্ত ক'রে দিয়ে ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে দেয়, সর্বধ্বংসী প্রলয় ঘটবে যেন এই মুহূর্তে। তারপর সেই প্রলয়ের পরে স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারবে মানুষ; পৃথিবীতে নেমে আসবে শান্তি। যে জঘন্য কোলাহল-চিৎকারে মানুষের কান আজ বধির হয়ে ওঠে, সমস্ত স্নায়ু হয় পীড়িত, বিষণ্ণ ক্ষোভ জাগে মনে, সে-কোলাহল চিৎকার সেদিন যাবে মুছে। শহর, সমুদ্র আর আকাশ হয়ে উঠবে শান্ত-শ্রীমণ্ডিত, নির্মল, মনোরম…

ঢং ঢং ক'রে বারোটার ঘন্টা পড়ল। ঘন্টার কাংস্য শব্দের শেষ রণনটুকু যখন মিলিয়ে গেল, ঢিমে তালে চল্‌ল গোলামী শ্রমের বর্বর সঙ্গীত, ঐকতান সুরের অনেকখানি তখন থেমে গিয়েছে। তারপরেই জেগে উঠল একটা থমথমে অসন্তোষের সুর। মানুষের কণ্ঠস্বর, সমুদ্রের গর্জন জেগে উঠল…। মধ্যাহ্ন আহারের সময় হ'ল।

॥ ১ ॥

ডক-মজুররা কাজ ফেলে রেখে ডকের চারদিকে ছোট ছোট দলে জটলা শুরু করেছে; খাবারউলীর কাছ থেকে খাবার কিনে পাথর বাঁধানো উঠানের কোণের ছায়ায় তাই খেতে বসেছে। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হ'লো গ্রীশ্‌কা চেলকাশ। পুরোনো দাগী চোর। পিপে মাতাল ও বেপরোয়া দুর্দান্ত বলে ডকের সবাই তাকে ভালোভাবে চেনে। খালি পা। পরনে শতছিন্ন পায়জামা আর নোংরা ছিটের সার্ট। মাথায় কিছু নেই। সার্টের ছেঁড়া কলারের ভেতর দিয়ে তার শুক্‌নো চামড়া ও কঠার হাড় দেখা যাচ্ছে। মাথার কালো উস্কো-খুস্কো চুল আর থমথমে মুখে নিদ্রালু চোখ দেখে বোঝা যায় এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে সে। তার বাদামী গোঁফে ও কামানো বাঁ-গালের ছোট্ট আঁচিলে একটা কুটো লেগে রয়েছে; সগু ভাঙা ছোট্ট একটা লেবুর ডাল তার কানে গোঁজা। লোকটা ঢেঙ্গা, কাঁধদুটো ঈষৎ গোল। একটু খুড়িয়ে মন্থর গতিতে পাথুরে পথের ওপর দিয়ে সে হাঁটছে। গরুড়-নাক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চারিদিক সে দেখছে। চক্‌ চক্‌ ক'রে উঠছে তার ধূসর চোখ দুটো। ডক-মজুরদের মধ্যে কাউকে খুঁজছে সে। দীর্ঘ মোটা বাদামী গোঁফ জোড়া বিড়ালের গোঁফের মত খাড়া হ'য়ে উঠছে বারেবারে। হাত দুটো তার পেছনে ঘষাঘষি করছে, হাতের লম্বা বাঁকা মোটা আঙ্গুলগুলো ভীতভাবে পরস্পরকে জড়াজড়ি করছে। ছন্নছাড়া লোকের ভিড় এখানে অনেক; তবু সবার আগে তার ওপরেই নজর পড়ে। ধু ধু প্রান্তরের শকুনের মত কেমন একটা তীক্ষ্ণ ক্ষুধার্ত দৃষ্টি, একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গি—যেন শিকারের ওপর এখুনই লাফিয়ে পড়বে। বাইরে থেকে সে শান্ত ও সহজ দেখতে, কিন্তু তার ভেতরটা উড়ন্ত শিকারী পাখীর মতই প্রখর ও সতর্ক।

স্তূপাকার কয়লার ঝুড়ির ছায়ায় বসেছিল ছেঁড়া কাপড় পরা একদল ডক-মজুর। চেলকাশ তাদের কাছাকাছি আসতেই একজন জোয়ান লোক তার কাছে উঠে এল। ব্রণে ভরা কেমন বোকা বোকা মুখ, ঘাড়ের ওপর কাটা

দাগ—সন্ত আঘাতের গভীর চিহ্ন। লোকটা উঠে চেলকাশের পাশে হাঁটতে হাঁটতে চাপা স্বরে বলল: 'ডকের অফিসাররা মালের পেটি ছুটোর কথা টের পেয়েছে। খোঁজ করছে।'

তার আপাদমস্তক নির্বিকারভাবে দেখে নিয়ে চেলকাশ বলল: 'হুঁ, তারপর?'

'তারপর আর কি? তারা খোঁজ করছে শুনলাম।'

'না, না,—ওদের সাহায্য করার জন্য আমায় খুঁজছিল কি!' একটু হেসে চেলকাশ "ভলাণ্টিয়ার ফ্লিট" মালবাহী জাহাজ কোম্পানীর গুদামঘরের দিকে তাকাল।

'মরগে যাও!' সঙ্গীটি ঘুরে দাঁড়াল।

চেলকাশ তাকে থামিয়ে চেঁচিয়ে বলে:

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও! এভাবে সং সাজালে কে তোমায়? এযে দেখছি একেবারে দোকানের সাইনবোর্ড!...মিশকাকে দেখেছ নাকি?

'না, অনেকক্ষণ দেখিনি!' চিৎকার ক'রে উত্তর দিয়ে সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল।

আবার হাঁটতে শুরু করে চেলকাশ। পুরোনো পরিচিত ব'লে প্রত্যেকেই অভিবাদন জানায় তাকে। কিন্তু স্ফূর্তিবাজ ব্যঙ্গপ্রিয় চেলকাশ আজ একটা রসিকতাও করল না। অন্যদের প্রশ্নের জবাবে ছোট ছোট কাটাকাটা কথায় উত্তর দিয়ে গেল শুধু।

হঠাৎ একটি গাঁটের স্তূপের পেছন থেকে শুল্কবিভাগের একজন প্রহরী বেরিয়ে এল। গায়ে তার গাঢ় সবুজ রংয়ের নোংরা পোষাক, কেমন একটা নিষ্ঠুর ভাব তার সোজা দণ্ডায়মান দেহে। উদ্ধতভাবে চেলকাশের সামনে দাঁড়িয়ে সে পথ আটকাল। কুরকীর হাতলের ওপর বাঁ হাত রেখে, ডান হাত দিয়ে চেলকাশের জামার কলার টেনে থামাতে গেল।

'দাঁড়া! কোথায় যাচ্ছিস্?'

এক পা পিছিয়ে গিয়ে চোখ তুলে প্রহরীর ভদ্র কিন্তু ধূর্ত মুখের দিকে তাকিয়ে চেলকাশ একটু শুকনো হাসি হাসল। গাম্ভীর্য ফুটাতে গিয়ে প্রহরীর

মুখখানা ফুলে গোল লাল টকটকে হ'য়ে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে চোখ পাকিয়ে তাকাল বটে সে কিন্তু তার এই চোখ-পাকানো হাসির উদ্রেক করল মাত্র। চেঁচিয়ে বলল :

'এই ব্যাটা ! তোকে বলেছি না, ডকে ঢুকলে পাঁজরা ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে দেব ? আবার ঢুকেছিস্ ডকে ?'

'এই যে ! কেমন আছ সেমিয়নিচ ? অনেক দিন পরে দেখা হ'ল !' বেশ শান্তভাবে হাত বাড়িয়ে অভিবাদন জানাল চেলকাশ।

'তোর সঙ্গে দেখা না হ'লে আমি মরে যাব না ব্যাটা। যা এখান থেকে, ভাগ্ !'

তবুও চেলকাশের প্রসারিত হাতখানি টেনে নিয়ে মৃদুভাবে ঝাঁকাল সেমিয়নিচ।

তার শক্ত আঙ্গুলে সেমিয়নিচের হাতখানি ধরে পরিচিত বন্ধুর মত নাড়তে নাড়তে চেলকাশ বলল : 'আচ্ছা, মিশকাকে দেখেছ তুমি ?'

'মিশকা ? মিশকা আবার কে ? মিশকা ফিশকাকে চিনি না আমি। এবার যাও দেখি এখান থেকে বন্ধু। গুদামের দরোয়ান তোমাকে দেখতে পেলে—'

'আরে, সেই যে, মাথায় কটা চুল যে ছেলেটার···। গতবার "কস্ট্রোমাতে" যার সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করেছিলাম।'

'একসঙ্গে চুরি করেছিলে বল। তোমার মিশকা এখন হাসপাতালে। কিসে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে গিয়েছে। এবার যাও দেখি ; ভাল কথায় বলছি, নইলে ঘাড় ধরে বের ক'রে দিতে হবে।'

'হুঁ ! বললে, মিশকাকে তুমি চেনো না ! বেশ চেনো দেখছি ! কিন্তু তোমার মেজাজ আজ এত চড়া কেন, সেমিয়নিচ ?'

'আরে ! বার বার বলছি যা এখান থেকে। ঘাড় ধাক্কা খেতে না চাস্ তো দূর হ' বলছি।'

রেগে ওঠে সেমিয়নিচ। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চেলকাশের শক্ত মুঠো থেকে হাতখানা টেনে নেবার চেষ্টা করে। ঘন ভ্রূর নিচ দিয়ে নির্বিকারভাবে তাকিয়ে দেখে চেলকাশ। হাত ছেড়ে না দিয়ে বলে :

'তাড়া দিচ্ছ কেন বন্ধু? তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তবে তো যাবো। তারপর! কেমন চলছে বল। বৌ ছেলে মেয়ে সব ভাল তো?'

দুষ্টুমিভরা চোখে দাঁত বের ক'রে হাসল।

'কতদিন ধরে ভাবছি, দেখা করব একবার তোমার সঙ্গে! তা সময়ই কি পাই ছাই! মদে এমন চুর হ'য়ে থাকি সব সময়...'

'এই! চোপরাও বলছি! ঠাট্টা রাখ! হাড়গিলে শয়তান কোথাকার! তোর ইয়ারকির পাত্র আমি!...তা, আজকাল পথে ঘাটে বাড়ীবাড়ী চুরি ক'রে বেড়াচ্ছিস্ তো?'

'কোন্ দুঃখে? যথেষ্ট মাল তো এখানে পড়ে আছে,...সত্যি বলছি সেমিয়নিচ্, প্রচুর মাল! তা, ঐ কাপড়ের গাঁট দুটি তো তুমিই সরিয়েছ! চারদিকে নজর রেখো। কোন্দিন আবার ধরা পড়ে না যাও!'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেমিয়নিচ্ কি যেন বলবার চেষ্টা করে। মুখ দিয়ে থুথু ছিট্তে থাকে। তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে চেলকাশ নিশ্চিন্ত মনে ডকের গেটের দিকে ফিরল। জঘন্য ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে সেমিয়নিচও পেছন পেছন চল্ল। বেশ খুশি হয়ে উঠেছে চেলকাশ। কোন কাজকর্ম নেই, এমনিভাবে ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা গানের কলি শিস দিতে দিতে চলেছে সে। দু' পাশের লোকদের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ারকি করতে করতে এগোতে থাকে, তারাও উত্তর দেয় ওর ঠাট্টা ইয়ারকির।

খাওয়া শেষ ক'রে একদল ডক-মজুর মাটিতে শুয়ে বিশ্রাম করছিল। ওদের মধ্য থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল:

'আরে-রে, গ্রীশ্কা যে! কর্তারা তো তোমায় বেশ আদর যত্ন করছে দেখছি আজকাল!'

চেলকাশ উত্তর দেয়: 'খালি পা কিনা, জুতো নেই...তাই সেমিয়নিচ্ নজর রাখছে যাতে কোন কিছুর ওপর যেন আবার পা না ফেলে দুঃখু পাই!'

গেটের কাছে তারা পৌছল। দু'জন প্রহরী চেলকাশের জামা কাপড় ভাল করে অনুসন্ধান ক'রে ধাক্কা দিয়ে তাকে বাইরে রাস্তায় ঠেলে দিল।

রাস্তা পার হ'য়ে সরাইখানার দরজার উল্টো দিকে একটা পাথরের ওপরে চেলকাশ এসে বসল। ডকের গেট থেকে অসংখ্য মাল বোঝাই ঠেলা গাড়ী শব্দ করতে করতে বাইরের দিকে চলেছে। উল্টো দিক থেকে চলেছে খালি ঠেলা গাড়ীগুলো ঘড়্ ঘড়্ শব্দে। গাড়ীর গাড়োয়ানদের শরীর ঝাঁকুনিতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। ডকের ভেতর থেকে উন্মত্ত কোলাহল আর গা-বিড়বিড়-করা ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।...

এই উন্মত্ত কোলাহলে চেলকাশ যেন নিজেকে নিজের কাছে পায়। বেশ কিছু হাতে পাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। পরিশ্রম বিশেষ নেই, কিন্তু দক্ষতার প্রয়োজন। দক্ষতা যে তার যথেষ্ট আছে সে-সম্বন্ধে চেলকাশের সন্দেহ নেই। অর্ধনিমিলিত চোখে কল্পনা করে সে, কাল সকালে কেমন ভাবে স্ফূর্তি করতে বেরুবে, পকেটে কেমন খস্‌খস্ করবে নোটগুলো। সহকর্মী মিশকার কথা মনে হয়। পা না ভাঙলে আজ রাতটা খুব কাজে লাগত সে। একেবারে একা, সমস্ত ব্যাপারটা সামলাতে পারবে তো সে?—কেমন সন্দেহের দোলা লাগে মনে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আঁচ করবার চেষ্টা করল কেমন থাকবে রাতটা। তারপর চোখ নামিয়ে তাকিয়ে দেখল পথের দিকে।

কয়েক পা দূরে পাথুরে রাস্তার উপরে একটা থামে হেলান দিয়ে বসেছিল একটি ছেলে; পরনে তার গাঢ় নীল রংয়ের সুতীর সার্ট আর ঐ কাপড়েরই পায়জামা, পায়ে গাছের ছালের এক জোড়া কুঁচকে-যাওয়া জুতো, মাথায় ছেঁড়া বাদামী রংয়ের একটা টুপি। পাশে পড়ে রয়েছে ছোট্ট একটি ঝোলা ও একটি হাতলহীন কাস্তে। এক আঁটি খড় দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে বাঁধা রয়েছে সেটি। ছেলেটির কাঁধ বেশ চওড়া, শক্ত সমর্থ চেহারা, মাথার চুলগুলো শনের মত কটা, মুখটি রোদে পোড়া, বড় বড় নীলাভ দুটি চোখের নিশ্চিন্ত সরল দৃষ্টিতে চেলকাশের দিকে সে তাকিয়ে দেখছে।

চেলকাশ জিভ বের ক'রে তাকে ভেঙচাল। মুখখানা ভয়ংকর ক'রে বড় বড় চোখে তার দিকে তাকাল।

প্রথমে ছেলেটি কেমন থতমত খেয়ে গেল; পরমুহূর্তে হো হো ক'রে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল:

'আরে, ভারী মজার লোক দেখছি তুমি !'

আধশোওয়া অবস্থায় চেলকাশের কাছে ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে চলে এল সে। পাথরের উপর দিয়ে কাস্তের হাতলটা গড়িয়ে আনতে আনতে এবং ধুলোবালির উপর দিয়ে ঝোলাটা টানতে টানতে নিয়ে এল।

চেলকাশের পাজামায় একটু টান দিয়ে বলল :

'বেশ বোঝা যাচ্ছে স্ফূর্তি করতে বেরিয়েছ, না ?'

'ঠিক ধরেছ দেখি খোকা !'

হাসতে হাসতে উত্তর দেয় চেলকাশ। এই বলিষ্ঠ ছেলেটির শিশুর মত সরল স্বচ্ছ চোখ দুটি বেশ ভাল লাগে চেলকাশের। জিজ্ঞাসা করে :

'ধানকাটার কাজের খোঁজে বেরিয়েছ বুঝি ?'

'হুঁ !...কিন্তু পয়সা নেই ভাই। কিচ্ছু পাই নি। অজস্র লোকের ভীড়। দুর্ভিক্ষ এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে প্রচুর লোকজন এসেছে। দর একেবারে কমিয়ে দিয়েছে তারাই। এখন আর আয় নেই এ-কাজে। কুবানে এখন দিচ্ছে ষাট কোপেক মাত্র ; অদ্ভুৎ কম মজুরী !...এই কাজের দাম আগে দিত তিন থেকে পাঁচ রুবল্ পর্যন্ত।'

'আগের দিনের কথা বলছ ! সেসব দিনের কথা ছেড়ে দাও ভাই। তখন তো তারা একজন খাঁটি রুশকে দেখার জন্যই শুধু তিন রুবল ক'রে দিত ! দশ বছর আগে তো আমি এই কাজই করতাম। কোন কশাক গ্রামে গিয়ে যদি বলতে—আমি একজন রুশ, অমনি দলে দলে লোক এসে অবাক হয়ে তোমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, তারপরে তোমায় তিন রুবল গুরুদক্ষিণা দিয়ে দিত। এর উপর তো খাওয়া দাওয়া...যত দিন খুশি সেখানে থাকো না কেন !'

চেলকাশের কথা শুনতে শুনতে ছেলেটির মুখ হাঁ হ'য়ে গেল ; তার চেপ্টা মুখে বিস্ময়ের ছাপ আঁকা। কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝতে পারল লোকটা আজগুবী গল্প ফেঁদে বসেছে তখন হো হো ক'রে হেসে উঠল। গোঁফের আড়ালে হাসি ঢেকে মুখটা গম্ভীর ক'রে রইল চেলকাশ।

'আমায় বোকা পেয়েছ, না ?...মনে করেছ আমি শুনে বিশ্বাস করেছি, কেমন !...মাইরী বলছি, বছর কয়েক আগে সত্যিই দিনকাল ভাল ছিল।...'

'আরে, আমি কি ঠাট্টা করছি নাকি! সত্যি বলছি, কয়েক—'

'থাম, থাম!' হাত নাড়িয়ে ছেলেটি থামিয়ে দিল চেলকাশকে।

'কি কাজ কর? মুচী, না, দর্জী?'

'কে, আমি?' চেলকাশ জিজ্ঞাসা করে। একটু ভেবে যোগ দেয়: 'আমি হলুম জেলে।'

'জেলে! সত্যি বল্‌ছ? মাছ ধর তুমি?'

'মাছ, শুধু মাছ? এখানকার জেলেরা শুধু মাছ ধরে না। কত কিছু ধরে তারা!—তারা ডুবে-যাওয়া জিনিসপত্র, পুরোনো নোঙ্গর, জাহাজ—সমস্ত কিছুই ধরে। অবশ্য আলাদা রকমের বঁড়শি আছে এ সব কাজের জন্য!...'

'ও! সব মিথ্যে!...সেই রকমের জেলে বুঝি তুমি? ওই যে যারা নিজেদের সম্বন্ধে গান গায়:

শুকনো গাঙ্গে জাল ফেলি আর
টেনে তুলি ঝাঁকা-ভরা মাল...

'হুঁ! ঐরকমের কাউকে দেখেছ কখনও?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে চেলকাশ।

'না, দেখব আর কোথায়, তবে শুনেছি...'

'লোকগুলো কিরকম?'

'বেশ লোক কিন্তু তারা! কেমন বেপরোয়া, মুক্ত!'

'মুক্ত? মুক্তিতে তোমার কি এসে যায়? তুমিও কি স্বাধীনতা চাও নাকি?'

'হ্যাঁ, চাই বৈ কি! নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব থাকবে; খুশি মত যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও...নিশ্চয়ই চাই স্বাধীনতা। তোমার ঘাড়ের ওপর কোন কিছুর চাপ নেই এ যদি তুমি জান, তাহ'লে তার চাইতে ভাল আর কি থাকতে পারে? শুধু ভগবানে বিশ্বাস রেখে যা পারো ভোগ ক'রে নাও।'

ঘেন্নায় থুথু ফেলে চেলকাশ। মুখ বন্ধ ক'রে সে পেছন ফিরে বসে।

ছেলেটি আবার সুরু করে: 'আমার জীবনী যদি শোন...। বাবা মারা গেলেন, রেখে গেছেন ছোট্ট এক টুকরো জমি আর বুড়ী মাকে! জমিগুলো

একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কি করি আমি তখন? বাঁচতে তো হবে! কিন্তু কেমন ক'রে? সে-জবাব কে দেবে? উদ্ভট চিন্তাসব মাথায় আসে: 'কোন অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েকে বিয়ে করার কথা মনে হয়। তা হ'লে কিন্তু মন্দ হয় না, যদি অবশ্য তাদের মেয়ের অংশটা তারা আলাদা ক'রে দেয়। নিজেদের সংসারটা বেশ চালিয়ে নিতে পারব…কিন্তু কোন্ শয়তান শ্বশুর আর তাতে রাজী হয়, বল! এতটুকুও দেবে না। বরং শ্বশুর ব্যাটা উল্টো চাইবে—চিরজীবন ধরে কেনা গোলাম হ'য়ে তার খামারে থাকতে বলবে সে।…চমৎকার ব্যবস্থা! যদি শ'-খানেক বা শ'-দেড়েক রুবল কামাতে পারতাম কোন মতে, তাহ'লে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম! বুড়ো ভাবী শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতাম—তোমার সম্পত্তি তুমি আলাদা ক'রে রাখ কিন্তু মারফাকে তার অংশ আলাদা ক'রে দেবে কিনা পরিষ্কার বল!…দেবে না? বেশ! ভগবানের কৃপায় মারফাই তো আর গাঁয়ের একমাত্র মেয়ে নয়! আমিও তাহ'লে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কোন দায়িত্ব নেই আমার…হুঁ!'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছেলেটি আবার বলে: 'কিন্তু যা অবস্থা দেখছি তাতে এসব কিছুই হবে ব'লে মনে হয় না। বিয়ে ক'রে শ্বশুরের কাছে থাকা ছাড়া আর উপায় দেখি না। ভেবেছিলাম, কুবানে চ'লে যাব। সেখানে যেমন করে হোক শ'-দুই রুবল আয় ক'রে বেশ ভদ্র ভাবে জীবন যাপন করতে পারব। কিন্তু যেতে পারলাম কই। সমস্ত কল্পনা উড়ে গেল। দিনমজুরিই কপালে লেখা…। জমি আর জুটবে না আমার। ওঃ—'

ভাবী শ্বশুরের কাছে গোলামীর বন্ধনকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছিল না ছেলেটি। তার মুখখানা একেবারে কালো হ'য়ে কেমন বিষণ্ণ দেখায়। আড়ষ্টভাবে মাটিতে সে বসে রইল।

চেলকাশ জিজ্ঞাসা করে: 'কোথায় যাবে ঠিক করেছ?'

'কোথায় আর যাব! বাড়ী!'

'একটা কথা, ঠিক জানি না, মনে হ'ল বল্‌ছি। ফেরার পথে তুরস্ক হ'য়ে যেতে পার তুমি…?'

'তু-র-স্ক!' কেমন টেনে টেনে বলে ছেলেটি: 'কোন সাচ্চা খ্রীষ্টান সেখানে কখনও যায় নাকি? আমি যাব না সেখানে।'

'ওঃ, আহাম্মক!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চেলকাশ তার সঙ্গীর দিকে পেছন ফিরে বস্‌ল। তার মনের গভীরে এই জোয়ান গ্রাম্য ছেলেটি কেন জানি নাড়া দিয়েছে, কেমন একটা বিরক্তি ভাবও জমে ওঠে তার মনের কোণে। রাত্রে তাকে যে-কাজে বেরুতে হবে তার প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়াল দেখি ছেলেটা।

কিন্তু এমনি ক'রে হটিয়ে দেওয়ায় ছেলেটির আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে। আপন মনে কি যেন সে বিড়বিড় ক'রে বলে; সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বারে বারে তাকায় চেলকাশের দিকে। গাল দুটো তার এমন ভাবে ফুলে উঠেছে যে দেখলে হাসি পায়। চোখ দুটো কুঁচকিয়ে মিটমিট ক'রে সে তাকায়। এই খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা বাউণ্ডুলেটার সঙ্গে কথায় কথায় হঠাৎ এইরকম একটা অপমানকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তা সে ঠিক ভাবতে পারেনি।

কিন্তু বাউণ্ডুলেটা তাকে আমলই দিল না! পাথরের উপর বসে খালি পায়ের নোংরা গোড়ালিটা দিয়ে তাল ঠুকতে ঠুকতে বেশ আমেজ ক'রে সে শিস দিচ্ছে।

চেলকাশের সঙ্গে মিটমাট ক'রে ফেলতে চাইলে ছেলেটি।

'ওহে, ও জেলে! প্রায়ই কি এমনি মদে টং হ'য়ে থাক নাকি তুমি?'

বলতে না বলতেই চেলকাশ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল: 'ওহে খোকা, আজ রাতে আমার সঙ্গে কাজ করবে? তাড়াতাড়ি জবাব দাও।'

'কি কাজ?' ছেলেটির সুরে সন্দেহ উপচে পড়ে।

'কি কাজ? যা করতে দেব তাই। মাছ ধরতে যাব আমরা, তুমি দাঁড় টানবে।'

'বেশ, রাজী আছি। যে-কোন কাজ আমি করতে পারি, আমার আপত্তি নেই। তবে কি জান, তোমার সঙ্গে কোন গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চাই না। যে মেজাজী তুমি!...তোমাকে কিছু বোঝান মুশকিল।'

চেলকাশের বুকটায় কেমন জ্বালা ধরে যায়। নিরুদ্ধ ক্রোধে, চাপা কণ্ঠে বলে:

'যা খুশি ভাব না কেন, কিন্তু কথা বলবে মুখ সামলে।...যখন মাথায় গাঁট্টা মারব তখন সব কিছু বেশ সাফ্ হ'য়ে যাবে।'

চোখ দু'টো জ্বলে উঠল। পাথরটা থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বাঁ হাত দিয়ে গোঁফজোড়া একবার চুমড়ে নিয়ে বলিষ্ঠ ডান হাতে লোহার মত শক্ত মুঠো বাগিয়ে ধরল।

ছেলেটি ভয় পেল। চারিদিকে তাড়াতাড়ি একবার তাকিয়ে দেখে নিল। অসহিষ্ণুভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে-ও মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। কোন কথা বলল না। শুধু দু' চোখ দিয়ে নীরবে তারা পরস্পরকে দেখতে লাগল।

'হুঁ—?' ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল চেলকাশ।

রাগে সে টগবগ্ ক'রে ফুটছে। ছোকরাটা তাকে অপমান করেছে। রাগে রীতিমত কাঁপছে সে। কথা বলার সময় চেলকাশ তাকে বিশেষ আমল দেয়নি। কিন্তু এখন তার ঐ স্বচ্ছ নীলাভ চোখ, রোদে-পোড়া মুখ ও তার শক্ত পেশীবহুল হাত দু'খানি দেখে চেলকাশের কেমন যেন ঘৃণা হয়। চেলকাশের ঘৃণার আসল কারণ—কোথাকার কোন্ গ্রামের এই ছেলেটা অবস্থাপন্ন কোন্ এক কৃষকের জামাই হবে না কি, ছেলেটার অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিরক্তিকর—কিন্তু সব চাইতে বড় কথা, ছেলেটার স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্খা। চেলকাশের সঙ্গেই তুলনা চলে ছেলেটার এই আকাঙ্খার দুঃসাহস—অথচ স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধিও তার নেই, এবং তার কোন প্রয়োজনও নেই। যাকে হীন এবং তোমার চাইতে ছোট বলে মনে কর, সে যদি ঠিক তোমার মতই সমস্ত জিনিসের ভালমন্দ বিচার করে, নিজেকে তোমার একই পর্যায়ভুক্ত মনে করে, সেটা কোন সময়েই ভাল মনে হবে না।

চেলকাশের দিকে ছেলেটি তাকায়। তার মনে হয় এই লোকটা এখন থেকে তার মনিব...! বলে :

'ঠিক আছে। ওতে আর মনে কিছু করার নেই। আমি চাই কাজ। কাজ করছি তোমার কাছে, না, আর কারও কাছে—তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম ...তোমাকে ঠিক কাজের লোক বলে

মনে হয় না আমার, এই আর কি…কেমন যেন একটু ছন্নছাড়া তুমি…তা ও-রকম তো যে-কোন লোকেরই হতে পারে। কত মাতালই তো দেখেছি আমি !…হুঁ, কত দেখেছি, তোমার চাইতেও পাড় মাতাল দেখেছি।'

'বেশ, বেশ ! তাহ'লে তুমি রাজী ?' নরম সুরে বলে চেলকাশ।

'আমি ? নিশ্চয়ই ! খুশি মনে ! তা' মজুরি কত দেবে ?'

'কাজ বুঝে মজুরী। যেমন কাজ হবে।…অর্থাৎ, কি রকম আমরা ধরব তাই বুঝে। বুঝলে ? পাঁচ রুবল পেতে পার। হবে না তাতে ?'

এবারে টাকার ব্যাপার। কৃষকের ছেলে এ বিষয়ে একেবারে পরিষ্কার কথাটা বুঝে নিতে চাইলে। তার মনিবের সাফ্ কথাটাই সে শুনতে চায়। অবিশ্বাস ও সন্দেহ আবার মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে।

'না ভাই, ও-রকমভাবে আমি কাজ করি না।'

চেলকাশও সুরু করল :

'তর্ক কোরো না। দাঁড়াও একটু। চল, ওই রেস্তোরাঁয় যাই।'

রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি চলল তারা। গোঁফজোড়া পাকাতে পাকাতে মনিবী চালে চেলকাশ চলেছে ; আর ছেলেটি যেন চেলকাশকে পথ ক'রে দেবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে সঙ্গে হাঁটছে। কিন্তু তবুও তার মনে অস্বস্তি ও সন্দেহ রয়েছে।

'কি নাম তোমার ?' চেলকাশ জিজ্ঞসা করে।

ছেলেটি উত্তর দেয় : 'গাভ্রিলা।'

নোংরা ধোঁয়াটে রেস্তোরাঁয় ঢুকেই চেলকাশ দোকানীর কাছে গেল। অভ্যস্ত লোকের মত পরিচিত স্বরে এক বোতল ভডকা, সব্জীর ঝোল, মাংসের রোস্ট ও চায়ের অর্ডার দিল ; সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশককে বলল : 'সব নিয়ে এস।' পরিবেশক নিঃশব্দে মাথা নেড়ে চলে গেল। মনিবের প্রতি গাভ্রিলার মনে হঠাৎ সম্ভ্রম জেগে উঠল। ছন্নছাড়ার বেশে থাকলেও এখানে পরিচিত সে, তাকে বিশ্বাস করে সবাই।

'এস, এবার খেতে খেতে কথাবার্তা শেষ ক'রে নেওয়া যাক। অ—, একটুখানি বস তুমি, আমি আসছি এক্ষুণি।'

চেলকাশ বেরিয়ে গেল। গাভ্রিলা চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। রোস্তারঁাটা অবস্থিত নিচের তলায়; স্যাঁতসেঁতে ও অন্ধকার। ভডকা, তামাকের ধোঁয়া, আলকাতরা, ও আরও হরেকরকমের উগ্র দম-বন্ধ-করা গন্ধে ঘরটা ভর্তি। গাভ্রিলার মুখোমুখি অন্য একটি টেবিলে নাবিকের পোষাক পরা জনৈক মাতাল বসে আছে। তার গালের দাড়ী ঈষৎ লাল; কয়লার গুঁড়ো ও আলকাতরায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাখা। হেঁচকি উঠছে লোকটার, ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে অদ্ভুৎ হিস্‌হিস্‌ ও ঘড়ঘড় শব্দে জড়িয়ে জড়িয়ে আবোল তাবোল গান গাইছে। লোকটা নিশ্চয়ই রুশ নয়।

তার পেছনে বসেছে মলদাভিয়ার দুটি মেয়ে। কালো চুল, তামাটে রং, কেমন ছন্নছাড়া ভাব চেহারায়…তারাও গান গাইছে গুনগুন ক'রে।

অন্ধকার থেকে উঠে আসছে নানা মূর্তি—সবাই কম বেশী মাতাল—সবাই নিজের মনে বক্‌বক্‌ ক'রে চলেছে, কেমন অস্থির ভাব।…

একা একা বসে কেমন ভয় করে গাভ্রিলার। বারে বারে তার মনে ইচ্ছে হয় যে তার মনিব তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক। খাবার ঘরের গোলমাল ক্রমশই বাড়তে থাকে। মনে হয়, কোন অতিকায় জানোয়ার তার অগুন্তি বিভিন্ন কণ্ঠে গর্জে উঠছে; অন্ধ ক্রোধে সে যেন এই স্যাঁতসেঁতে গুহা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য লড়াই করছে, কিন্তু কিছুতেই তার মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। গাভ্রিলার মনে হয় কেমন এক অসুস্থ অবসাদ তার দেহ এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে ফেলছে। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'রে উঠছে, দৃষ্টি স্তিমিত হ'য়ে আসছে…। খাবার ঘরের চারিদিকে সেই দৃষ্টি ফেলে সে বারে বারে দেখছে।…

চেলকাশ ফিরে এল। সুরু হ'ল পান ভোজন এবং কথাবার্তা। তিন গ্লাশ ভডকাতেই মাতাল হ'য়ে পড়ে গাভ্রিলা। স্ফূর্তিতে টগবগ করে তার মন; মনিবকে দুটো মিষ্টি কথা শোনাবার ইচ্ছে হয়। বেশ লোক কিন্তু মনিবটি! কেমন চমৎকার আদরযত্ন করছে তার। কিন্তু মনের এই কথাগুলো গলা পর্যন্ত বেশ সাবলীল গতিতে এসে কি জানি কেন জিভ দিয়ে আর বেরুতে চায় না, আটকে যায় জিভের জড়তায়…হঠাৎ জিভটা যেন ভারী হ'য়ে উঠেছে।

তার দিকে তাকিয়ে একটু ঠাট্টা ক'রে চেলকাশ বলে হাসতে হাসতে: 'এরই

মধ্যে মাতাল !···হুঁ ! একেবারে দুধে-খোকা ! পাঁচ গ্লাশের পরে কি হাল হবে তোমার !···কাজ করবে কেমন ক'রে ?'

'বন্ধু—ভয়—পেয়ো—না। তোমার কাজ—ঠিক ক'রে দে—বো। তোমায় ভালবাসি—আমি—। দাও, তোমায় একটা চুমু দি।' জড়িয়ে জড়িয়ে বলে গাভ্রিলা।

'হাঃ হাঃ—, উঁহুঁ ! আর এক ঢোক খাও।'

আর এক চুমুক খেল গাভ্রিলা, তারপর আর এক চুমুক, চুমুকের পর চুমুক··· তার চোখের সামনে সমস্ত কিছুই তালে তালে একবার উঁচুতে আর একবার নিচুতে দুলছে। কেমন অস্বস্তি বোধ হয় তার, সমস্ত শরীর গুলিয়ে ওঠে, বমি বমি আসে, একটা বোকা বোকা ভাব ফুটে ওঠে তার অবয়বে। কি যেন বলতে গিয়ে ঠোঁট দিয়ে অদ্ভুৎ শব্দে গোঁ গোঁ ক'রে ওঠে। গাভ্রিলাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল চেলকাশ···কি যেন চিন্তা করছে সে···চিন্তা করতে করতে গোঁফজোড়া চুমড়ে নিয়ে একটু ম্লান হাসে।

মাতালের হল্লা-চিৎকারে গম্‌গম্ করছে সমস্ত ঘরটা। টেবিলের উপর কনুই রেখে লাল চুলওলা নাবিকটি ঘুমিয়ে পড়েছে।

'চল, এবার ওঠা যাক্।' চেলকাশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে।

চেষ্টা করে গাভ্রিলা উঠতে, পারে না। একটা শপথ উচ্চারণ ক'রে হাসতে থাকে—মাতালের অর্থহীন প্রলাপ মিশ্রিত হাসি।

তার উল্টোদিকে বসে পড়ে চেলকাশ বলে : 'একেবারে টৈ-টম্বুর মাতাল !'

নতুন মনিবের দিকে তাকিয়ে গাভ্রিলা তখনও হো হো ক'রে হাসছে। গভীর সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছে তাকে চেলকাশ আর ভাবছে সামনের এই ছেলেটার জীবন একেবারে তার মুঠোর মধ্যে···যা খুশি তাই একে দিয়ে এখন সে করাতে পারে। তাসের মত তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে পারে, আবার তার চাষী-জীবনের খাদে তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়েও দিতে পারে ! সে এই লোকটার মনিব। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় চেলকাশের জীবনে যে-তিক্ত-অভিজ্ঞতা জমেছিল, সে-তিক্ততার জীবন এ-ছেলেকে পোয়াতে নাও হ'তে পারে।···এই তরুণ জীবনের ওপর তার কেমন হিংসা হয়, করুণা হয়, কেমন

একটু তাচ্ছিল্য ভাবও আসে। চেলকাশের মত অন্য কারও কবলে পড়ার আশঙ্কার কথা ভেবে কেমন কষ্ট হয় তার।…কিন্তু সর্বশেষে এই সমস্ত অনুভূতি এক সঙ্গে মিশে জেগে ওঠে একটি মাত্র মনোভাব—পিতৃস্নেহ। দুঃখ হয় ছেলেটার জন্য। কিন্তু ছেলেটাকে চেলকাশেরও প্রয়োজন! গাভ্রিলাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হাঁটু দিয়ে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিতে দিতে খাবার ঘরের বাইরে খোলা প্রাঙ্গণে নিয়ে আসে। চলা কাঠের স্তূপের ছায়ায় তাকে শুইয়ে দেয়। তারপর পাইপটা ধরিয়ে তার পাশে বসে চেলকাশ। গাভ্রিলা একটু নড়েচড়ে উঠে কি যেন বিড়বিড় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ ২

'সব ঠিক তো?' ফিস্‌ফিস্ ক'রে গাভ্রিলাকে জিজ্ঞাসা করে চেলকাশ। গাভ্রিলা তখন একমনে দাঁড়টা ঠিক করছিল।

'হুঁ, একটু অপেক্ষা কর, এক্ষুণি হ'য়ে যাবে। দাঁড়ের বাঁধনটা কেমন আলগা হ'য়ে গিয়েছে। একটু ঠুকে দেবো এটাকে?'

'না-না! একটুও শব্দ যেন না হয়! হাত দিয়ে জোরে ঠেলে দাও, ও এমনিতেই ঠিক হ'য়ে যাবে।'

নৌকোটাকে নিঃশব্দে বের ক'রে নিচ্ছিল ওরা দুজনে। ওক কাঠে বোঝাই ছোট ছোট নৌকোর সারি এবং জলপাই-তেল, চন্দন কাঠ, ও সাইপ্রেস গাছের মোটা মোটা গুড়িতে বোঝাই বড় বড় তুর্কী ফেলুকার পেছনে এই নৌকোটি বাঁধা ছিল।

তামসী রাত্রি…উপরের আকাশে জড়ো হচ্ছে ঘন টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘ। নিচের সমুদ্র শান্ত…কালো…তেলের মতো জমাট সমুদ্রের জল, কেমন একটা আর্দ্র নোনা গন্ধ। জাহাজগুলোর দু'পাশে ও তীরের উপরে সমুদ্রের ঢেউ আছড়িয়ে পড়ছে। সেই দোলার তালে তালে দুলছে চেলকাশের নৌকো।

তীর থেকে অনেক দূরে সমুদ্রের ভেতরে দেখা যায় জাহাজগুলোর আবছা মূর্তি ; তাদের তীক্ষ্ণ আকাশচুম্বী উঁচু মাস্তুলগুলো নানা রংয়ের আলোয় শোভিত। এই রঙীন আলোর প্রতিফলন পড়েছে সমুদ্রের মখমলের মত নরম বুকে। দিনভর খাটুনির পর কর্মক্লান্ত শ্রমিকের মত গভীর সুখনিদ্রায় মগ্ন যেন সমুদ্র…

'বেরিয়ে এসেছি আমরা ?' জলের ভেতরে দাঁড় ফেলে গাভ্রিলা প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ!' হালটাকে জোরে ঠেলে দুটো বজরার ভেতর দিয়ে চেলকাশ সংকীর্ণ জলপথে নৌকো চালিয়ে দিল। সমুদ্রের মসৃণ বুকের ওপর দিয়ে তরতর বেগে চলেছে তারা। দাঁড়ের আঘাতে ঝলকে উঠ্‌ছে আলোর নীলাভ দ্যুতি। নৌকার পেছনে থরথর কাঁপছে সেই আলোর রেখা।

'মাথার যন্ত্রণা আছে এখনও ?' নরম সুরে জিজ্ঞাসা করে চেলকাশ।

'খুব !…মনে হচ্ছে যেন মাথায় লোহা পিটছে।…মাথাটা জলে ভিজিয়ে নেবো একটু।'

'উঁহুঁ, ওতে কি হবে।…তার চাইতে ভেতরটা ভিজিয়ে নাও। ভেতর ঠিক থাকলে মাথার যন্ত্রণা ছাড়তে কতক্ষণ!…'

একটা বোতল বের ক'রে গাভ্রিলাকে দিল চেলকাশ।

'তা কি আর হবে ?…যাকগে দাও…আঃ, ভগবানের কি দয়া!'

ক্ষীণ ঢক্ ঢক্ শব্দ হয় একটা।

'কেমন লাগছে ? আরে, আর না, আর না অতটা এক সঙ্গে খায় না…।' চেলকাশ থামিয়ে দেয় তাকে।

আবার নৌকো ছোটে, জাহাজগুলোর ভেতর দিয়ে পথ ক'রে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে ছোটে…। হঠাৎ এক সময়ে জাহাজের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল তারা সমুদ্রে…সীমাহীন, উত্তাল, নীল দিগন্ত-ছোঁয়া সমুদ্র তাদের সামনে…যেখান থেকে মনে হয় যেন উঠে গিয়েছে মেঘের পর্বত-চূড়ারাসব…কোনটা গাঢ় নীল রংয়ের, পেঁজা তুলোর মত নরম, প্রান্ত ছুঁয়ে রয়েছে হরিৎ আভা ; কোনটা বা সমুদ্রের জলের মত সবুজ ; আবার কোনটার রং নিরেট সিসের মত… এদের ছায়াগুলো পর্যন্ত ভারী মুখ-ভার-করা থমথমে। ধীরে সারি সারি চলেছে তারা, পরস্পর মিশে একাকার হ'য়ে যায় তাদের

রং ; মিলিয়ে যায় তারা, আবার দেখা দেয় নতুন রূপে···কখনও উদ্ধত, কখনও বা কপাল কুঁচকোনো···এই প্রাণহীন পুঞ্জীভূত মেঘের শোভাযাত্রার মধ্যে কি যেন একটা রয়েছে।···সমুদ্রের সীমারেখায় জমা হয় অগণিত মেঘের পুঞ্জ ; ধীর মন্থরগতি তাদের, যেন আকাশের বুকে চিরকাল তারা এমনি ক'রেই গুটি গুটি চলবে। সেইখান থেকে তারা যেন ঘোমটা টেনে দেবার চেষ্টা করবে সমস্ত আকাশের মুখে, যাতে ঘুমন্ত সমুদ্রের দিকে সোনালী চোখ মেলে অগুন্তি তারার দল উঁকি দিতে না পারে···যে-সোনালী আলো আশা জাগায় ধরার মানুষের মনে।

'ভারী সুন্দর সমুদ্র, না ?' জিজ্ঞাসা করে চেলকাশ।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর, তবে আমার কেমন যেন ভয় করে।' জলে সজোরে এলো-মেলোভাবে দাঁড়ের আঘাত করতে করতে গাভ্রিলা উত্তর দেয়। লম্বা দাঁড়ের আঘাতে জল ছিটকে পড়ে, অস্ফুট কল্লোল জাগে, উজ্জ্বল, নীলাভ ফস্‌ফরাসের দ্যুতি যেন ঠিক্‌রে বের হ'তে থাকে।

'ভয় করে! বোকা কোথাকার!' বিদ্রূপের সুর চেলকাশের কণ্ঠে।

চোর চেলকাশ সমুদ্রকে ভালবাসে। লোকটা ভাবপ্রবণ। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশাল, আদিগন্ত, নীলাম্বুর দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে তার, ক্লান্তি আসে না কখনও। তার এই প্রিয়বস্তুর সৌন্দর্য সম্বন্ধে এই উত্তর শুনে মনে মনে চেলকাশ আহত হয়। নৌকোর পেছন দিকে বসে দাঁড় দিয়ে জল কাটতে কাটতে নির্বাক হয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। ইচ্ছে হয়, সমুদ্রের এই রেশমী বুকের উপর দিয়ে বহু দূরে ঐ দিগন্ত ছোঁয়া শেষ প্রান্তে নৌকো বেয়ে সে চলে যায়, সমুদ্র থেকে যেন তাকে তাড়াতাড়ি উঠতে না হয়।

সমুদ্রের বুকে এলেই সব সময় তার মনে আবেগময় এক অনুভূতির সঞ্চার হয় ; অদ্ভুৎ উদারতায় মন যায় ভরে ; তার সমস্ত অন্তরের সে-অনুভূতি জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছতা থেকে মনকে মুক্ত ক'রে দেয়। অমূল্য অনুভূতি। এই জলরাশির উপরে ভাসলে জীবনের মূল্য, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা যেন তুচ্ছ হ'য়ে যায়, নিজেকে সাচ্চা মানুষ ব'লে মনে হয় ; ভারী ভাল লাগে চেলকাশের তখন। নিদ্রালু নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ সমুদ্রের ওপর ভেসে বেড়ায় ; এই অনন্ত শব্দ

মানুষের অন্তরকে আচ্ছন্ন ক'রে তার সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি রোধ ক'রে তার মনে সম্ভাবনার স্বপ্ন জাগায়।

'কিন্তু বঁড়শি কোথায় তোমার?' সন্দিগ্ধভাবে নৌকোর ভেতর চেয়ে দেখে হঠাৎ প্রশ্ন করে গাভ্রিলা।

চমকে ওঠে চেলকাশ। 'বঁড়শি? আছে। নৌকোর পেছনে আছে।'

ছেলেটির কাছে মিথ্যা বলতে লজ্জা হয় চেলকাশের। একটি প্রশ্নে তার সমস্ত চিন্তা ও অনুভূতি চুরমার ক'রে দিল ছেলেটি। কেমন একটা জ্বালা, বিক্ষোভ জমে ওঠে চেলকাশের মনে। রাগ হয়। গাভ্রিলাকে রূঢ়ভাবে বলে ওঠে: 'কথা না বলে চুপচাপ বসে থাক। নিজের কাজ ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যে নাক ঢোকাতে যাবে না। দাঁড় টানবার কাজ তোমার, তাই করবে। বেশী ফর্ ফর্ করবে তো ফল খারাপ হবে, মনে থাকে যেন!'

নৌকোটা হঠাৎ পাক খেয়ে থেমে গেল। জলের ওপর দাঁড়খানা নিশ্চল হয়ে রইল, জলের ফেনা জমে উঠল দাঁড়ের নিচে। ঝোঁক সামলিয়ে নিয়ে নিজের জায়গায় নড়ে চড়ে বসল গাভ্রিলা।

'দাঁড় টান!'

একটা বিশ্রী শপথ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। গাভ্রিলা দাঁড় টানতে লাগল। নৌকোটা যেন ভয় পেয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ছুটতে লাগল। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে জল কেটে এগোতে লাগল নৌকো।

'সামলে, সামলে—!' নৌকোর পেছন দিকটায় সোজা উঠে দাঁড়াল চেলকাশ। হাতের মুঠোয় হালের দাঁড়টা শক্ত ক'রে ধরা, হিমশীতল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল গাভ্রিলার বিবর্ণ মুখের দিকে। বেড়ালের মত গুটি গুটি মেরে এগিয়ে এল চেলকাশে, এখনই যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে। রাগে তার দাঁত কড়মড় শব্দ করছে। ভয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে গাভ্রিলার দাঁত।'

সমুদ্রের দিক থেকে একটা কর্কশ আওয়াজ ভেসে এল: 'কথা বলছে কে ওখানে?'

'দাঁড় টান, দাঁড় টান, শয়তান···শিগ্‌গির শিগ্‌গির···শব্দ করিস না, শব্দ হ'লে খুন ক'রে ফেলব তোকে হারামী ব্যাটা! দাঁড় টান্!···এক! দুই!

শব্দ হয়েছে কি টেনে ছিড়ে ফেলবে তোকে!' ফুঁসতে লাগল চেলকাশ। কিছুক্ষণ পরে ব্যঙ্গস্বরে বলল : 'কি খোকা ভয় পেয়েছ? এঁ্যা…!' ক্লান্তিতে ও ভয়ে হতবাক গাভ্রিলা বিড়বিড় করতে থাকে : 'মেরী…মা মেরী…'

নিঃশব্দে বন্দরের দিকে ফিরে চলল নৌকো। জাহাজের উদ্ধত মাস্তুল ও বন্দরের অগুন্তি আলোর মালা চোখে পড়ে।

'কে কথা বলছে?' আবার সেই প্রশ্ন। কিন্তু এবার শব্দটা অনেক দূরে।

বিস্মিত হ'ল চেলকাশ।

শব্দটার দিকে লক্ষ্য রেখে সে বলে : 'আরে তুমিই চিৎকার করছ!' গাভ্রিলার দিকে ফিরে দাঁড়ায় চেলকাশ। গাভ্রিলা তখনও বিড়বিড় ক'রে 'মা মেরী, মা মেরী' করছে।

'বরাত তোমার ভাল! শয়তানগুলো ধরতে পারলে তোমার দফা রফা করত! ধরা পড়ার অবস্থা হ'লে, হুঁ, তোমায় একেবারে মাছেদের মুখের টোপ ক'রে জলে ফেলে দিতাম।'

বেশ রসিয়ে শান্তভাবে চেলকাশ কথা বলছিল। তখনও গাভ্রিলা ভয়ে কাঁপছে। মিনতি মাখা স্বরে চেলকাশকে বলে : 'আমায় যেতে দাও। দোহাই যিশুর, যেতে দাও আমায়। যেখানে হোক আমায় নামিয়ে দাও। ওঃ-ওঃ-ওঃ!…আমি মারা গেলাম। ভগবানের নামে বলছি আমায় ছেড়ে দাও ভাই। তোমার কোন্ কাজে লাগব আমি?…এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।…এ সব কাজ করার অভ্যেস আমার নেই।…এই-ই প্রথম। ভগবান! সর্বনাশ হবে আমার!…কেমন ক'রে তোমার খপ্পরে যে পড়লাম আমি! এ যে অন্যায়, পাপ কাজ।…তোমার নিজের সর্বনাশ তুমি নিজেই করছ!…'

'কি কাজ?' গম্ভীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে চেলকাশ। 'কি কাজ পাপ, শুনি?'

ছেলেটির ভয় দেখে আমোদ পায় চেলকাশ; ভয়ানক লোক সে—এই কথা ভেবে নিজেরই আনন্দ হয়।

'এই যে, এই সব চুপি চুপি লুকোন কাজকম্ম!…দোহাই ভগবানের, আমায় ছেড়ে দাও!…তোমার কোন্ কাজে লাগব আমি? ভাই, পায়ে পড়ছি তোমার…'

'চুপ! কাজে না লাগলে আমি তোকে কুড়িয়ে আনতাম? হাবা বোকা কোথাকার! মুখ বুজে চুপটি ক'রে বসে থাক!'

'হা, ভগবান!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গাভ্রিলা।

'চুপ, ছিচ কাঁদুনে, চুপ না করলে গলায় এক ধাক্কা দেব।' তাকে বাধা দিয়ে চেলকাশ বলে।

গাভ্রিলা আর নিজেকে চেপে রাখতে পারে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কাঁদছে বটে তবে বেপরোয়াভাবে দাঁড় টেনে চলেছে সে। তীরের মত নৌকো ছুটল। আবার তাদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো কালো কালো প্রকাণ্ড জাহাজ; সেই জাহাজগুলোর মাঝখানের সংকীর্ণ জলে সর্পিল জল রেখায় ঘুরপাক খেয়ে নৌকোটা মিলিয়ে গেল।

'এইবার কথা শোন্! যদি বাঁচতে চাস্, তাহ'লে কেউ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলে একেবারে চুপচাপ থাকবি, একটি কথাও বলবি না, বুঝলি।'

'উঃ—! গেলাম।' চেলকাশের এই আদেশে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিক্ত কণ্ঠে বল্‌ল গাভ্রিলা: 'আমার সর্বনাশ হ'ল!'

'এই চপ্! ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করবি না!' চাপা কণ্ঠে ধমক দেয় চেলকাশ।

চাপা কণ্ঠের এই ধমকানীতে গাভ্রিলার চিন্তা করার ক্ষমতাও যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়, একটা প্রাণহীন যন্ত্রে যেন সে পরিণত হয়ে যায়। কেমন একটা ভীতিজনক অমঙ্গল আশঙ্কায় তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। পেছন দিকে একটু হেলে যন্ত্রের মত দাঁড়টাকে ছপ্ ছপ্ শব্দে একবার জল থেকে নামাতে আর ওঠাতে থাকে। সারাক্ষণ শুধু তার পায়ের জুতো জোড়াটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে। জলের মর্মর ধ্বনির মধ্যে শোনা যায় চাপা ক্রোধ। ডকে এসে পৌঁছল তারা।...পাথরের দেয়ালের ওদিক থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়; জলের ছল্‌ছলানি, গান ও তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ ভেসে আসে।

'থাম!' ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে চেলকাশ: 'দাঁড় তুলে নে। হাত দিয়ে দেয়াল ধরে ধাক্কা সামাল দে।...আহাম্মক!'

হাত দিয়ে পাথরটা ধরে গাভ্রিলা দেয়ালের পাশে নৌকোটাকে ঠেলে দিল।

পুরু শ্যাওলায় ধাক্কা লেগে কোনরকম শব্দ না হ'য়ে পাথরের পাশ কেটে নৌকোটা এগিয়ে গেল।

'এই থাম দেখি! দাঁড়গুলো আমার এখানে দিয়ে দে। কই তোর পাশপোর্ট দেখি! থলের মধ্যে? দে, দে, থলেটা আমাকে দে দেখি তাড়াতাড়ি।...হুঁ—বন্ধু, যাতে পালাতে না পার, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা।... এখন আর পালাতে পারবে না, হুঁ...দাঁড় না নিয়েও কোনমতে চম্পট দিতে পারবে, কিন্তু পাশপোর্ট ছাড়া পালাবার সাহস হবে না তোমার। বসো এখানে, কিন্তু খবর্দার! উঁকি ঝুঁকি মেরেছ তো একেবারে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে দেব, বুঝেছ মনি!'

হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে কি একটা হাত দিয়ে ধরে শূন্যে ঝুলে পড়ল চেলকাশ; তারপর দেয়ালের ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আঁতকে উঠল গাভ্রিলা।...এক লহমায় এই ঘটনাগুলো ঘটে গেল। লিকলিকে রোগা গোঁফওলা চোরটার উপস্থিতিতে যে আতঙ্ক তার ওপর চেপে বসে তাকে শেষ ক'রে দিচ্ছিল, এতক্ষণ পরে তা শিথিল হ'য়ে যেন ছেড়ে যাচ্ছে। হাঁফ ছাড়ে সে।...পালাতে হবে এইবার!...একটা স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাস বুক ভরে টেনে নিয়ে চারদিকে তাকায় সে। তার বাঁ দিকে মাস্তুলবিহীন জাহাজের একটা চাপা কালো খোল জেগে রয়েছে, যেন একটা শূন্য পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড কফিন।...প্রতিটি ঢেউএর আঘাতে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত তার ভিতর থেকে প্রতিধ্বনিত হয় একটা গোঙানির শব্দ।

গাভ্রিলার দক্ষিণে বাঁধের দীর্ঘ পাথরের দেয়ালটা প্রকাণ্ড সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। তার পেছন দিকে কালো কালো কি যেন কতগুলো অস্পষ্ট আবছামূর্তি দেখা যায়, সামনের দিকে সেই কফিন আর প্রাচীরের মাঝে মৌন সমুদ্র। মাথার উপরে জড়ো হচ্ছে কৃষ্ণকালো মেঘ, বিরাট, ও ভয়ংকর; অন্ধকারের বুক চিরে ধীর পদক্ষেপে তারা এগিয়ে আসছে, যেন ধ্বংস ক'রে দেবে নিচের সবকিছু তার বিপুল ওজনের চাপে। সবকিছুই যেন অশুভ। গাভ্রিলা আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে, চেলকাশ তার মনে যে ভীতির সঞ্চার করেছিল, এ তার চাইতেও ভয়ানক; তীব্র আতঙ্ক তার বুকে বিঁধে থেকে তাকে একটা

জড়পিণ্ডে পরিণত ক'রে দিচ্ছে ; তাকে যেন নৌকোর আসনের সঙ্গে কে বেঁধে রেখে দিয়েছে।

নিরন্ধ্র নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু সমুদ্রে দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাপা শব্দ। আগের মতই ধীর গতিতে মাথার উপর উঠে আসছে মেঘের দল ; অগুন্তি তারা সংখ্যায় ; যেন সমুদ্র থেকে উঠে আসছে সব। উপরের আকাশও যেন সমুদ্র—এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, নিচের এই তন্দ্রাচ্ছন্ন নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্রকে আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছে। এলোকেশ উড়িয়ে মেঘেরা সব যেন নিচে নেমে আসছে নীলাম্বুর বিস্তৃতির উপরে ; যেখান থেকে বাতাস তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে আবার তারা নামে নতুন উর্মিমালার মাঝে যাদের মাথায় এখনও তীব্র বিক্ষোভের নীলাভ ফেনা জমে ওঠে নি।

এই বিষণ্ণ মৌন সৌন্দর্যে গাভ্রিলা নিষ্পিষ্ট হতে থাকে। মনিবের প্রত্যাগমনের জন্য তার মন আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি ফিরে না আসে চেলকাশ?...সময় অতিবাহিত হয় অতি ধীর গতিতে...আকাশের মেঘের চলা থেকেও যেন সময়ের গতি ধীর।...আর যতই সময় যায় ততই যেন এই তামসী নীরবতা ভীতিজনক হয়ে ওঠে।...বাঁধের দেয়াল থেকে ভেসে আসছে ঢেউএর ছলাৎছলাৎ শব্দ, শোনা যায় একটা কেমন চাপা ফিসফিসানি। মনে হয় এই মুহূর্তে বুঝি মরে যাবে গাভ্রিলা।

'ঘুমুলে নাকি? ধর, ধর। সাবধানে!' চেলকাশের সাবধান কণ্ঠস্বর শোনে গাভ্রিলা।

দেয়ালের ওপর থেকে চারকোণা মত কি একটা ভারী জিনিস নামিয়ে দিল চেলকাশ। গাভ্রিলা সেটা নিয়ে নৌকোয় রাখল। আবার আর একটা নামিয়ে দিল ঐ ভাবেই। তারপরেই দেয়াল বেয়ে নেমে এল চেলকাশের দীর্ঘ দেহ ; দাঁড়গুলো বেরুলো অন্য কোন্ এক জায়গা থেকে, আর গাভ্রিলার পায়ের কাছে ঝুপ ক'রে পড়ল তার থলেটা। জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে চেলকাশ হালের কাছে বস্‌ল।

চেলকাশের দিকে তাকিয়ে রইল গাভ্রিলা ; মুখে ভয়মাখা আনন্দের মৃদু হাসি।

'খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, না?'

হ্যাঁ, একটু। এখন এস, প্রাণপণে দাঁড় টান। তোমার কাজ তুমি বেশ করেছ বন্ধু। অর্ধেক কাজ হয়ে গিয়েছে, এখন শয়তান ব্যাটাদের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই বাস্! তারপরেই তুমি তোমার টাকা নিয়ে তোমার মাশার কাছে চলে যেতে পারবে। তোমার তো আবার একজন মাশা আছে, কি গো, আছে না!'

'ন্-নাঃ—!' প্রাণপণে দাঁড় টানে গাভ্রিলা। হাঁপরের মত ওঠানামা করছে তার বুক, হাত দুটো ইস্পাতের স্প্রিংয়ের মত লাফাচ্ছে। নৌকোর নিচে জলের কল্‌কল্ শব্দ, পিছনের নীলাভ রেখা আরও বিস্তৃত হ'য়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে গাভ্রিলার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে ওঠে। তবুও প্রাণপণে দাঁড় টানে সে। এই একই রাত্রে দু'দুবার ভয়াবহ আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হ'ল তাকে, এইবার আশঙ্কা হয় তৃতীয়বারও বুঝি কাটাতে হবে। মনে মনে কামনা করে সে—এই বিশ্রী কাজ এক্ষুণি শেষ হ'য়ে যাক; এই লোকটার খপ্পর থেকে পালাতে পারলে বাঁচে সে। মনে মনে ঠিক করে গাভ্রিলা যে চেলকাশের সঙ্গে কোন বিষয়েই আর সে কথা বলবে না, কোন কথার প্রতিবাদও করবে না; যা বলবে চেলকাশ, তাই-ই সে ক'রে যাবে, কোনমতে যদি এর কবল থেকে পালাতে পারে সে, তবে আগামী কাল অদ্ভুতকর্মা সেন্ট নিকোলাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিনে নিশ্চয়ই সে কৃতজ্ঞতা জানাতে যাবে। একটা আকুল প্রার্থনা তার বুক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু নিজেকে সংযত করে সে; স্টিম ইঞ্জিনের মত একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ ক'রে চেলকাশের দিকে সে তাকিয়ে দেখে।

কিন্তু চেলকাশ, উড়বার পূর্ব মুহূর্তের পাখীর মত, তার দীর্ঘ ছিপছিপে দেহটা সামনে ঝুঁকিয়ে নৌকোর সামনের অন্ধকারের দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, চোখের দৃষ্টির সঙ্গে ঘুরছে তার হিংস্র গরুড়-নাকটা। এক হাতে নৌকোর হালটা ধরে অন্য হাতে তার গোঁফে চাড়া দিচ্ছে। মুখের মৃদু হাসিতে তার গোঁফজোড়া মৃদু কাঁপছে, পাতলা ঠোঁট দুটো কুঞ্চিত হচ্ছে। সাফল্যের জন্য চেলকাশ আজ খুশি হ'য়ে উঠেছে নিজের উপরেই, এবং এই ছেলেটার উপরেও। ছেলেটা ভয় পেয়েছিল তাকে; তারপরে এখন একেবারে গোলাম হ'য়ে

গেছে। কি পরিশ্রমই না করছে ছেলেটা! দরদ উপচে ওঠে চেলকাশের মনে, একটু উৎসাহ দেবার ইচ্ছে হয় ছেলেটাকে।

দাঁত বের ক'রে নরমভাবে বলে: 'কি, খুব ভয় পেয়েছ, না?'

'না, না।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গাভ্রিলা গলাটা পরিষ্কার ক'রে বলে।

'এখন আর অত জোরে দাঁড় টানবার প্রয়োজন নেই। আর একটিমাত্র ঘাটি পার হ'তে পারলেই, বাস্।...একটু বিশ্রাম ক'রে নাও।...'

গাভ্রিলা থামল, যেন বাধ্য ছেলে। সার্টের হাতা দিয়ে তার মুখের ঘাম মুছে আবার জলের মধ্যে দাঁড় দুটো নামিয়ে দিল।

'এবার আস্তে আস্তে দাঁড় টেনে চল, জলের শব্দ যেন না হয়। গেটটা পার হতে পারলেই বাস্! আস্তে, আস্তে। এখানকার লোকগুলো কিন্তু ভারী পাজী এবং সাংঘাতিক।...যে-কোন মুহূর্তে গুলি ছুঁড়তে পারে। এমন গুলি ছোঁড়ে যে কপাল লেগে 'ও!'—ব'লে চিৎকার করবার অবসরও মিলবে না।'

নিঃশব্দে জলের ওপর দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে নৌকো। দাঁড় থেকে টপ্ টপ্ ক'রে নীল জলের ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ছে। যেখানে পড়ছে, মুহূর্তের জন্য সেখানটায় জ্বলে উঠছে আলোর নীলাভ দ্যুতি। মসীকৃষ্ণ রাত্রি আরও নিস্তব্ধ হ'য়ে এল। আকাশকে আর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র ব'লে মনে হয় না। মেঘগুলো ছড়িয়ে পড়েছে; মসৃণ ভারী কম্বলে আকাশটা যেন ঢেকে গিয়েছে। নিচু হ'য়ে ঠিক জলের ওপরে ঝুলছে, কাঁপছে না একটুকুও। আরও শান্ত, আরও কালো হয়েছে সমুদ্র। আগের চাইতে অনেক বেশী তীব্র হয়ে উঠেছে সমুদ্রের লোনা জল। আগের মত বিস্তৃত মনে হয় না যেন সমুদ্রকে।

'যদি বৃষ্টি নামতো!' ফিস্ ফিস্ ক'রে চেলকাশ বলে: 'পর্দার মত বৃষ্টির আড়ালে আমরা কেটে পড়তে পারতাম।'

নৌকোর ডাইনে ও বাঁয়ে বজরাগুলো দাঁড়িয়ে আছে, যেন ওগুলো কালো জল থেকে ভেসে ওঠা বাড়ীসব...কেমন বিষণ্ণ, স্তব্ধ। একটি আলো নড়ছে একটা নৌকোয়। লণ্ঠন নিয়ে কেউ চলাফেরা করছে ডেকের ওপরে। সমুদ্রের জল ছল ছল ক'রে নৌকোগুলোর দু'পাশে আঘাত করছে—যেন মৃদু অনুনয়ের সুর...

নিরাসক্ত প্রতিধ্বনি শোনা যায় সেই ছলছলানিতে, যেন কোনো অনুনয় শুনতে রাজী নয়।

'এই আস্তে! আস্তে দাঁড় টান…!' ফিসফিসিয়ে বলে চেলকাশ।

যখন থেকে চেলকাশ তাকে আস্তে আস্তে দাঁড় টানতে বলেছে তখন থেকেই সেই প্রতীক্ষিত উৎকণ্ঠা গাভ্রিলাকে পেয়ে বসেছে। একটু ঝুঁকে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে দেখল সে। ক্রমশই তার দেহটা যেন দীর্ঘ হ'য়ে উঠছে… হাড় এবং মাংসপেশীতে টান লেগে কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে; একটিমাত্র দুর্বিসহ চিন্তায় মাথা ধরে উঠেছে; পিঠের চামড়া যেন কুঁকড়ে ছিড়ে যাচ্ছে, পায়ের তলায় এসে যেন বিঁধছে অসংখ্য সূঁচ। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ব্যথায় টনটন্ ক'রে উঠছে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হ'তে থাকে, এই বুঝি কেউ চিৎকার ক'রে ওঠে: 'চোর! চোর!'

চেলকাশের চাপা গলার হুঁসিয়ারী শুনে গাভ্রিলার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল; একটা তীব্র অনুভূতি তার মগজকে নাড়া দিয়ে বয়ে গেল; সমস্ত দেহের টনটনে স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে ইচ্ছে করে গাভ্রিলার।…হা ক'রে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গাভ্রিলা নিঃশ্বাস নেয় বুক ভ'রে—কিন্তু হঠাৎ সর্বাঙ্গে কষাঘাতের কেমন একটা তীব্র যাতনা অনুভব করে। চোখ বুঁজে অজ্ঞান হ'য়ে গড়িয়ে পড়ে সে।

দূরে, দিগন্তে, সামনের দিকে, হঠাৎ সমুদ্রের কালো জল থেকে ঝলসে উঠে প্রকাণ্ড এক নীল তলোয়ার বিদীর্ণ ক'রে দিল রাত্রির অন্ধকার; আকাশে মেঘের কোলে সে-ধারালো তলোয়ার ঝলমলিয়ে উঠল, সমুদ্রের বুকে এসে পড়ল তার নীলাভ রেখা। সেই প্রসারিত আলোর ফালির মধ্যে অন্ধকারের বুক থেকে জেগে উঠল অদৃশ্য সব জাহাজ, নীরব রাত্রির বিষণ্ণতায় যেগুলো ছিল আচ্ছন্ন। ঝড়ে ডুবে-যাওয়া জাহাজগুলো যেন সমুদ্রের অতল থেকে সব উঠে আসছে; সমুদ্রোদ্ভূত এই জ্বলন্ত ধারালো তলোয়ারের ইঙ্গিতে উপরের আকাশ ও জলের উপরের ভাসমান সব কিছু উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে সেই আলোয়…। জালে উঠে-আসা এই সব কালো কালো দৈত্যেদের মাস্তুলে ফেষ্টুনের মত সমুদ্রের শেওলা জড়িয়ে আছে। আবার সমুদ্র থেকে সেই ভয়ংকর

তলোয়ার উঁচুতে ঝলসে উঠে রাত্রিকে বিদীর্ণ ক'রে দিয়ে অন্য আর এক জায়গায় গিয়ে পড়ল···সেখানে অন্ধকার থেকে জেগে উঠল অদৃশ্য সব জাহাজেরা।

চেলকাশের নৌকো হতভম্ব হ'য়ে জলের উপর নিশ্চুপ অনড় অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ল। পাটাতনের উপরে দু' হাতে মুখ ঢেকে প'ড়ে আছে গাভ্রিলা। জুতো দিয়ে ঠোক্কর মেরে ক্রুদ্ধ চাপা গলায় চেলকাশ ধমকিয়ে ওঠে : 'ওঠ, আহাম্মক! ওটা শুল্ক-বিভাগের জাহজের সার্চলাইট। ওঠ, বুদ্ধু ব্যাটা!···ওরা চোর খুঁজছে। আমাদের ওপর আলো ফেলবে যে ওরা! শয়তান তুই নিজেও মরবি আমাকেও মারবি। ওঠ্ ওঠ্···'

অবশেষে চেলকাশের জুতোর গোড়ালির ঠোক্কর পিঠে পড়তেই লাফিয়ে উঠল গাভ্রিলা। তখনও ভয়ে তার চোখ বন্ধ। আসনে বসে হাতড়াতে হাতড়াতে দাঁড় টেনে টেনে নৌকো চালাতে শুরু করে সে।

'আস্তে! আস্তে! তোকে মেরে ফেলব একেবারে!···আহাম্মক কোথাকার! অত ভয় কিসের শুনি, হাঁদারাম! আরে, ওটা তো একটা বিজলী লণ্ঠন! আস্তে, আস্তে দাঁড় টান শয়তান!···চোরাকারবারীদের খোঁজ করছে ওরা। আমাদের ধরতে পারবে না। অনেক দূরে চলে গিয়েছে। এবার আমরা—' চেলকাশ চারদিকে একবার বিজয়গর্বে তাকিয়ে তারপর যোগ দেয় : 'বাস্! নাগালের বাইরে চলে এসেছি। ফুঃ—! জবর ভাগ্য তোর, বুদ্ধু খোকা!'

নীরবে দাঁড় টেনে চলেছে গাভ্রিলা। অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিল সে। সেই জ্বলন্ত তলোয়ারটা তখনও যেখানটায় একবার জেগে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে রইল। ঐ তীব্র আলোটার সম্বন্ধে চেলকাশের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে অদ্ভুৎ রূপালী আলোয় সমুদ্রকে আলোকিত ক'রে দিল যে হিমেল নীলাভ দ্যুতি, তাই দেখে এক হৃদয়-ভাঙা আতঙ্কে বিহ্বল হ'য়ে পড়ল গাভ্রিলা। যন্ত্রের মত দাঁড় টেনে চলল সে। কেমন ভয় করছে, আতঙ্ক জমে উঠছে মনে, ওপর থেকে বুঝি কোন আঘাত এসে পড়বে। কোন কিছুর জন্য আকর্ষণ অনুভব আর করে না সে। সব কিছু শূন্য, নিষ্প্রাণ মনে হয়। সেই রাত্রের অনুভূতি তার মধ্যকার মানবোচিত সব কিছুকে যেন একেবারে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে চেলকাশ। উৎকণ্ঠায় অভ্যস্ত তার স্নায়ুগুলো আবার নরম হ'য়ে এল। গোঁফজোড়া চুমরে দিল সে, চোখে তার আগ্রহ-দীপ্তি। ভারী ভালো লাগছে তার। দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস দিতে লাগল। বুক ভরে সমুদ্রের আর্দ্র বাতাস টেনে নিয়ে চারদিকের অন্ধকারে সে তাকাল। গাভ্রিলার উপরে চোখ পড়তেই ভালমানুষের মত হেসে উঠল।

বাতাস নিচে নেমে এল। সমুদ্রের জলে ধাক্কা দিল সেই বাতাস। আরও হাল্কা স্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে মেঘগুলো, সমস্ত আকাশকে ছেয়ে ফেলেছে তারা। সমুদ্রের বুকে বাতাস বয়ে চলেছে, কিন্তু মেঘগুলো নিশ্চল, কিসের গভীর চিন্তায় যেন তারা মগ্ন।

'নাও হে ছোকরা, এবার চাঙ্গা হ'য়ে বস! সব ঠিক এইবার। আরে, কেমন লোক তুমি! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তোমার দেহে প্রাণ নেই, শুধু হাড় ক-খানা পড়ে আছে! এখন আর অত দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কাজ হ'য়ে গেছে, বুঝলে!'

চেলকাশের কণ্ঠস্বর হলেও মানুষের আওয়াজ শুনতে চাইছিল গাভ্রিলা। বলল:

'হুঁ, বল শুনছি!'

'একেবারে দুধে-খোকা!...খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ তুমি, না! নাও, তুমি এবার হালে বস, আমি দাঁড় নিচ্ছি।'

নিতান্ত প্রাণহীনের মত স্থান পরিবর্তন করল গাভ্রিলা। চেলকাশ তার পাঁশুটে মুখের দিকে চাইল, লক্ষ্য করল, পা কাঁপছে গাভ্রিলার, ছেলেটা ক্লান্তিতে অবসন্ন। তার কাঁধটা একটু চাপড়ে দিয়ে বলল: ঘাবড়িয়ে গেছ দেখছি...অনেক টাকা উপায় করেছ তুমি। বেশ মোটা টাকা দেবো তোমাকে। কত চাও, পঁচিশ রুবল?'

'কিচ্ছু চাই না আমি। আমাকে শুধু তীরে নামিয়ে দাও...'

বিরক্ত হ'য়ে হাতটা নাড়তে নাড়তে থুথু ফেলল চেলকাশ। তার দীর্ঘ হাত দিয়ে লম্বা টানে সে দাঁড় টানতে লাগল।

সমুদ্র জেগে উঠেছে। নেচে নেচে চলেছে ছোট ছোট ঢেউগুলি, ফেনার ঘাঘরা পরিয়ে দিয়েছে যেন কে তাদের। পরস্পরের ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে, সহস্র বিন্দুতে ভেঙে পড়ছে। অস্ফুট কল্লোল ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দে ফেনাগুলো গলে গলে সৃষ্টি করছে এক সুরেলা আবহাওয়া। সে-গানে অন্ধকারও যেন প্রাণময়ী হ'য়ে ওঠে।

চেলকাশ কথা বলে: 'আচ্ছা, গাঁয়ে ফিরে গিয়েই তো একটা বিয়ে করবে। তারপর জমি আঁচড়াবে আর বীজ ছড়াবে! বৌও ছেলে বিয়োতে শুরু করবে। কিন্তু সকলের জন্য অত খাবার জুটবে কোত্থেকে তোমার? সমস্ত জীবনটা তো নষ্ট করবে এইভাবে···কী এমন সুখের জীবন হে!'

'সুখ!—' ক্লান্ত গাভ্রিলা উত্তর দেয়: 'সুখ বলে কিছু নেই···'

বাতাসে মেঘগুলোর মধ্যে এখানে ওখানে ফাটল দেখা যায়, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে উঁকি মারে নীল আকাশ আর তারই কোলের দু'একটি নক্ষত্র। নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পড়েছে নিচের চঞ্চল সমুদ্রে, নেচে চলেছে সেগুলো ঢেউএর ওপরে ওপরে, এই মিলিয়ে যাচ্ছে, এই জেগে উঠছে।

'ডাইনের দিকে ঘোরাও,' চেলকাশ বলে: শিগ্‌গির পৌঁছে যাব আমরা।···বাস! কাজ শেষ! কেমন চমৎকার কাজ দেখলে তো? এক রাত্রিতেই পাঁচশ রুবল আয়!'

'পাঁ-চ-শ!' টেনে টেনে অবিশ্বাসের সুরে বলে গাভ্রিলা। কেমন ভয় হয় তার। পা দিয়ে নৌকোর ভেতরের বাক্সটাকে ধাক্কা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করে: 'কি এটা?'

'হুঁ দামী জিনিস। হাজার টাকা দাম হবে। কিন্তু আমি সস্তাতেই ছেড়ে দেব।···খুব ভাল ব্যবসা, না?'

'হ্যাঁ—।' গাভ্রিলা অস্পষ্টভাবে বলে: 'আমি যদি সবটা পেতাম!'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে গাভ্রিলা···মনে পড়ে তার গাঁয়ের কথা, ছোট্ট জমি, সংসারের অভাব অনটন আর মায়ের কথা—কত প্রিয় তার সব কিছু···এসব-কিছুর জন্য কাজ খুঁজতে বেরিয়েছিল সে, আজ রাতের এই উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হ'ল। তার মনের মধ্যে প্রবল হ'য়ে উঠল তার গাঁয়ের

স্মৃতি—নদীর উঁচু জায়গা থেকে শুরু হ'য়ে বার্চ, উইলো, এ্যাশ গাছের অরণ্য··· তারই আড়ালে লুকিয়ে থাকা তাদের গ্রাম···পাখীর কল কাকলি···

বিষণ্ণ গাভ্রিলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে : 'আঃ, কি চমৎকার !'

'তাতো বটেই !···আমি ভাবছিলাম তুমি ফিরলে ট্রেনে ক'রে বাড়ী···গাঁয়ের মেয়েরা তোমার প্রেমে পড়ল ! তাদের একজনকে তুমি পছন্দ ক'রে নিলে··· তারপর একটা বাড়ী তৈরি করলে তুমি।···না, একটা বাড়ী বোধ হয় হ'ত না এ-টাকায়···'

'তা' ঠিক।···এ-টাকায় বাড়ী হ'ত না। আমাদের দেশে আবার কাঠের দাম খুব।'

'তাতে কি ? পুরোনো বাড়ীটাই ঠিক ঠাক মেরামত ক'রে নিতে।··· ঘোড়া ? ঘোড়া আছে তোমার ?'

'ঘোড়া ! হ্যাঁ, ঘোড়া আছে একটা আমার।···কিন্তু সেটা বুড়ো হ'য়ে গেছে।'

'তাহ'লে তো একটা ঘোড়াও কিনতে হবে তোমাকে। খুব ভা-ল ঘোড়া একটা ! তারপর একটা গরু, ছাগল···মুরগী···'

'বোলো না ভাই ও-সব কথা !···যদি কোন মতে পেতাম ! ভগবান ! কি সুন্দর জীবন যে আমার হ'ত !'

'হ্যাঁ, ভাই, জীবন তোমার বেশ সুখেরই হবে।—কিছু জ্ঞানগম্য আমার ও আছে জীবনের ব্যাপারে। একসময়ে আমারও একটা সংসার ছিল···আমার বাবা গাঁয়ের একজন বেশ পয়সাওলা লোক ছিলেন।···'

আস্তে আস্তে দাঁড় টেনে চলেছে চেলকাশ। ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে নৌকো, যেন খেলাচ্ছলে নৌকোর গায়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো, সমুদ্রের অন্ধকারে একটু একটু ক'রে এগোচ্ছে শুধু···নিস্তব্ধ সমুদ্র ক্রমশই মুখর হ'য়ে উঠছে। নৌকোর দোলায় দুলতে দুলতে জলের ওপরে এই দুটি মানুষও স্বপ্ন দেখছে···তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে চারদিকে। গাভ্রিলাকে উৎসাহ দেবার জন্যই গ্রামের কথা আরম্ভ করেছিল চেলকাশ। গোঁফের ফাঁকে হাসি লুকিয়ে প্রথমে পরিহাসের সুরেই শুরু করেছিল। কৃষকের জীবনের পরমানন্দের বিষয় নিয়ে

সে কথা বলে, যে-জীবনের স্বপ্ন তার ভেঙ্গে গেছে বহু দিন আগে বলে তারই কথা। কিন্তু আজ সে-সব কথা বলতে গিয়ে গাভ্রিলাকে প্রশ্ন করতে ভুলে গেল, নিজের স্বপ্নে ডুবে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেই শুধু বলতে লাগল :

'কৃষাণের জীবনের সব চাইতে বড় কথা হ'ল স্বাধীনতা! তোমার নিজের মালিক তুমি! তোমার নিজের ঘর হোক না কুঁড়ে, তবু তো নিজের। সামান্য এক টুকরো জমি হলেও তবু তো তুমি তোমার জমির মালিক, তোমার জমির কর্তা তো তুমিই; নিজের একটা সত্তা থাকবে তোমার···সবাই সম্মান করবে তোমাকে···কি বল, তাই না?···'

বিস্ময়াবিষ্ট চোখে গাভ্রিলা তাকিয়ে দেখলো তার দিকে···সে-ও এই আলোচনায় ভেসে গেল। ভুলে গেল কার সঙ্গে সে কথা বলছে, তার সামনে তার সঙ্গীর ভেতরে সে যেন দেখতে পায় তারই মত এক কৃষককে, মাটির সঙ্গে বংশপরম্পরায় যার নাড়ীর বন্ধন, মাটির সঙ্গে যাদের ঘাম মিশে আছে, সেই শিশু বয়স থেকে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই মাটির সঙ্গে···সেই মাটি, বসুমতীর সেই স্নেহস্পর্শ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে আসতে হয়েছে আজ, সেই বিচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবী মর্মজ্বালা আজ তাকে ভোগ করতে হচ্ছে এমনি ক'রে।

'হ্যাঁ ভাই, ঠিক কথাই বলেছ।···দেখ না, জমি হারিয়ে কি হাল হয়েছে তোমার! মাটি হ'লো মার মত! বেশী দিন কি ভুলে থাকা যায়!'

স্বপ্ন ভেঙে গেল চেলকাশের···। বুকের মধ্যে আবার সেই তীব্র জ্বালা অনুভব করে। যখন কেউ, বিশেষ ক'রে তার কাছে এতটুকু দাম নেই যার, তার দুঃসাহসিকতার অহংকারকে আঘাত করে তখনই এমনি যন্ত্রণার দংশন অনুভব করে সে।

'খুব যে খৈ ফুটছে দেখি!' কর্কশ স্বরে চেলকাশ বলে ওঠে : 'তুমি ভেবেছ এগুলো আমার মনের কথা, মোটেই তা নয়। আমায় বোকা ভেবেছ!···'

শঙ্কিত গাভ্রিলা বলে : 'অদ্ভুত লোক দেখছি তুমি! তোমার কথা বলছি নাকি আমি? তোমার মত ও-রকম কত লোক আছে এই দুনিয়ায়···কত হতভাগা লোকই না আছে এই পৃথিবীতে।···ঘুরে বেড়াচ্ছে!···'

'দাঁড় ধর এসে। বোকারাম!' আদেশের স্বর চেলকাশের কণ্ঠে। তার জিভের গোড়ায় জমা হয়েছিল প্রচণ্ড গালাগাল, কি জানি কেন, চেলকাশ তা সামলে নিল, গালাগাল করলো না।

আবার জায়গা বদলায় তারা। মালগুলো ডিঙিয়ে হালের কাছটায় আসতে আসতে চেলকাশের প্রচণ্ড ইচ্ছে হ'ল এক লাথিতে ছোঁড়াটাকে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

আলোচনা বন্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু গাভ্রিলা চুপচাপ থাকাতে এখন যেন বেশী ক'রে দেশের কথা মনে পড়তে লাগল চেলকাশের। অতীতের কথা সব মনে পড়ে, দাঁড় টানতে ভুলে যায়…স্রোতের টানে সমুদ্রে ভেসে চলল নৌকো। ঢেউগুলো যেন বুঝতে পেরেছে যে পথ ভুলে চলেছে নৌকো, তাই জোরে জোরে দোলা দিয়ে ও দাঁড়ের নিচে তাদের জোরালো নীল আলো জ্বালিয়ে যেন খেলা শুরু করে তারা। চেলকাশের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের ছবি, বর্তমানের এই ভবঘুরে জীবনের এগারো বছর আগের ছেড়ে-আসা জীবন। তার মনোশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তার শৈশব, তার গাঁ, তার মা…মা ছিলেন হৃষ্টপুষ্ট, ভারী গাল দুটো লাল, করুণাভরা দুই চোখ…আর বাবা ছিলেন বিরাট বপু দৈত্যের মত, রুক্ষ, দাড়ীগুলো লাল। মনে পড়ে নিজের বিয়ের কথা…তার বৌ আনফিসা…কালো হরিণ চোখ, লম্বা বেণী মাথায়, হাসিখুশি, নরম, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে; নিজের কথা মনে হয়…রক্ষীবাহিনীর প্রিয়দর্শন সৈনিক ছিল সে; বৃদ্ধ বাবার কথা আবার মনে হয়…পরিশ্রমে দেহ তখন তার ভেঙ্গে পড়েছে, বৃদ্ধা মা ন্যুব্জ দেহী হ'য়ে পড়েছেন, সেই স্নেহমাখা মুখের উপর পড়েছে বলিরেখা…মনে পড়ে যুদ্ধের পরে গাঁয়ে ফেরার কথা…যুদ্ধ থেকে গাঁয়ে ফিরল চেলকাশ…সারা গাঁয়ের সামনে তাঁর গ্রেগরীকে নিয়ে বাপের কি গর্ব! গোঁফ কামানো, লম্বাচওড়া সৈনিক। প্রিয়দর্শন যুবক, চটপটে!…দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চেলকাশ…ব্যর্থ জীবনের সুতীব্র যন্ত্রণা সৃষ্টি করে পুরোনো স্মৃতি; অতীতের কঠিন পাথরেও স্পন্দন জাগে, বহুদিন আগে যে বিষ সে পান করেছিল তাতেও মিষ্টি মধুর ফোটা পড়ে।…

নিজের প্রিয় গাঁয়ের বাতাসের স্নিগ্ধ-পরশ যেন অনুভব করে চেলকাশ;

মায়ের স্নেহভরা কথা, তার কৃষক পিতার গম্ভীর উপদেশ, শৈশবের ভুলে-যাওয়া কত কথা, কত শব্দ, নরম রেশমের মত হরিৎ-শ্রী শস্যে-ভরা মাটির সোঁদা গন্ধ যেন পায় চেলকাশ।···সেদিনের হৃদয়বান চেলকাশ একেবারে ভেঙ্গে চূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে, জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছে; কেমন নিঃসঙ্গ, করুণ বলে মনে হয় নিজেকে। তার ধমনীর প্রবহমান রক্তের ধারা যে-জীবনের আশা-আকাঙ্খা একদিন বহন করেছিল, সেই জীবন থেকে কে যেন তাকে ছিন্ন ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে চিরকালের মত।

'হে-ই—! আমরা ভেসে চলেছি কোথায়?' গাভ্রিলা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। চমকে উঠে বাজপাখীর মত সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালো চারদিকে চেলকাশ।

'হায় যিশু, দেখ কোথায় ভেসে এসেছি আমরা! জোরে দাঁড় টান, জোরে! সোজা পৌঁছে যাব আমরা।'

'স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে গাভ্রিলা।

'বড্ড ক্লান্ত···'

'এই মাল নিয়ে এখন ধরা পড়ার ভয় নেই তো আমাদের?' পা দিয়ে নৌকোর ভিতরের মাল ছুটোকে ঠোকর দিয়ে জিজ্ঞাসা করে গাভ্রিলা।

'না, এখন আর ভয়ের কারণ নেই। এইবার সোজা মাল দিয়ে হাতে হাতে টাকা নিয়ে আসব।···বুঝলে!'

'পাঁচশ?'

'তার কম তো নয়ই।'

'উঃ, কতো টাকা! আমি যদি ঐ টাকা পেতাম! এঃ, কত সুখে যে দিন কেটে যেত আমার!'

'কি করতে?···জমি?'

'হুঁ, নিশ্চয়ই! আমি তখন···'

গাভ্রিলা এবার স্বপ্নের পাখায় উড়ে চলল। চেলকাশ চুপ ক'রে বসে রইল। তার গোঁফ জোড়া ঝুলে পড়েছে; দাঁড়ের জলের ছিটেয় তার শরীরের ডান দিকটা একেবারে ভিজে গিয়েছে। চোখ ছুটো কেমন বসে গিয়েছে,

কেমন দীপ্তি হীন হ'য়ে পড়েছে। তার ভিতরের লোলুপতা এক ক্লিষ্ট অবসাদে ঢেকে গিয়েছে, তার ময়লা জামার ভাঁজে ভাঁজে সে-অবসাদ সুপরিস্ফুট।

চেলকাশ সজোরে নৌকোটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে জলের উপর ভাসমান কি একটা কালো মূর্তির দিকে নিয়ে গেল।

সমস্ত আকাশ ছেয়ে আবার মেঘ নেমে এল। বৃষ্টি নামল ঝির ঝির ক'রে, ভারী ভাল লাগে সে-বৃষ্টি…ঝরে পড়তে লাগল সেগুলো ঢেউ-এর চূড়োয়।

'থাম! চুপ!' চেলকাশ আদেশ করে।

একটা জাহাজের খোলে ধাক্কা খেয়েছে নৌকোর মাথাটা।

'শয়তানগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?' বিড়বিড় ক'রে বলে চেলকাশ। জাহাজের পাশে যে দড়ি ঝুলছিল, নৌকোর আঁকশি দিয়ে সেগুলো সে ধরে ফেলল।

'এই—, মইটা নামিয়ে দাও না। বৃষ্টিও দেখি সময় পেল না নামবার, ঠিক সময় বুঝে শুরু হ'ল! এই জানোয়ারের দল! হেই!'

'কে, শেলকাশ?' বিড়ালের মিউ মিউর মত ক্ষীণ কণ্ঠে কে যেন জিজ্ঞাসা করল।

'আরে, মইটা নামিয়ে দাও না!'

'কালিমেরা, শেলকাস!'

'মইটা নামিয়ে দে না, গাঁজা-খোর ব্যাটা!' গর্জিয়ে ওঠে চেলকাশ।

'মেজাজ যে একেবারে সপ্তমে গো…হুঁ ধর…'

'উপরে ওঠে পড়, গাভ্রিলা!' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চেলকাশ বলে।

মুহূর্তের মধ্যে ডেকের উপরে উঠে এল তারা। কালো কালো দাড়িওলা তিনটি লোক ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি যেন সব বলতে বলতে নৌকোর ভেতরে তাকায় বারে বারে। লম্বা পোষাক পরা চতুর্থ ব্যক্তি চেলকাশের কাছে এসে সানন্দে হাতখানা চেপে ধরে, তারপর কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় গাভ্রিলার দিকে।

চেলকাশ শুধু বলে তাকে: 'সকালের মধ্যে টাকা ঠিক ক'রে রাখবে। এখন যাচ্ছি আমি। চলে এস, গাভ্রিলা!…হ্যাঁ, কিছু খাবে?'

'কিচ্ছু চাই না, ভীষণ ঘুম পেয়েছে আমার।' এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জাহাজের একটা নোংরা কোণে শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করল গাভ্রিলা। চেলকাশ তার পাশে বসে কার এক জোড়া জুতো পায়ে লাগে কিনা দেখতে দেখতে তন্দ্রাজড়িত চোখে পিচ্ ক'রে থুথু ফেলল একবার, তারপর দাঁতের ফাঁক দিয়ে বিষণ্ণ সুরের একটা কলি শিস দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে এক সময় মাথার নিচে একটা হাত দিয়ে টান হ'য়ে শুয়ে পড়ল গাভ্রিলার পাশে, শুয়ে শুয়ে আর একটি হাতে গোঁফ চুমরোতে লাগল।

ঢেউএর দোলায় দুলছে জাহাজটি। কোথায় কিসের একটা অস্ফুট আওয়াজ হ'ল। ডেকের উপর বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ…জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ…চারদিকের সব কিছুতে কেমন যেন বিষণ্ণ বিলাপের সুর…সন্তানের আশাহীন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মায়ের করুণ গানের সুরের মত বিষণ্ণ…

দাঁত খিঁচিয়ে মাথাটা তুলল একবার চেলকাশ। চারদিকে তাকিয়ে কি যেন বিড়বিড় ক'রে শুয়ে পড়ল আবার…পা দুটো তার ফাঁক হ'য়ে গিয়েছে… একটা প্রকাণ্ড খোলা কাঁচির মত মনে হয় ঘুমন্ত চেলকাশকে দেখে…

॥ ৩ ॥

ঘুম ভেঙে চেলকাশই আগে উঠল। ত্রস্ত চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মস্থ হ'য়ে গাভ্রিলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। তখনও ঘুমোচ্ছে গাভ্রিলা ; ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে নাক ডাকছে, হাসি লেগে রয়েছে তার শিশুর মত রোদে-পোড়া স্বাস্থ্যবান মুখে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরু রশির মই বেয়ে উপরে উঠে গেল চেলকাশ। জাহাজের পাশের ফুটো দিয়ে সীসে রংএর ধূসর আকাশের একফালি চোখে পড়ে…উষার আলো জেগে উঠেছে আকাশে, কিন্তু শরতের সে-আলো আনন্দ-হীন ধূসর।

দু' ঘণ্টা পরে ফিরে এল চেলকাশ। সারা মুখ তার লাল হ'য়ে উঠেছে ; গোঁফ জোড়া বেশ সুন্দরভাবে পাকিয়ে উপরের দিকে তুলে দিয়েছে। মজবুত

উঁচু বুট জুতো পায়ে, পরনে ছোট জ্যাকেট ও ভেড়ীর চামড়ার ব্রীচেস। শিকারীর মত দেখাচ্ছে তাকে। পোষাকটা নতুন নয়, পুরোনো, তাহ'লেও বেশ শক্ত আছে। চেলকাশকে মানিয়েছে বেশ। তার সমস্ত রুঢ়তা ঢাকা প'ড়ে তার সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে একটা সৈনিকোচিত ভাব।

'হেই বক্না ছোঁড়া, ওঠ্ ওঠ্!' পা দিয়ে ঠোক্কর দিয়ে গাভ্রিলাকে ডাকল চেলকাশ। আচমকা ঘুম ভেঙ্গে লাফ দিয়ে উঠল গাভ্রিলা। তখনও তার চোখে ঘুম লেগে রয়েছে। চেলকাশকে ঠিক ও চিনতে পারে না, ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। হো হো শব্দে হেসে উঠল চেলকাশ।

'বাঃ, বেশ মানিয়েছে তো তোমায়, একেবারে ভদ্র বনে গেছ দেখছি…' আনন্দে বলে ওঠে গাভ্রিলা।

'ওতে আর আমাদের দেরী হয় না। তা', খোকা, এখনও কি ভয় আছে নাকি? কাল রাতে তো হাজার বার মরবে বলে ভেবেছিলে…!'

'হ্যাঁ, তাই মনে হয়েছিল কাল। কিন্তু আমার কথা ভেবে দেখ, আমার জীবনে এ-কাজ এই প্রথম। সমস্ত জীবনটা আমার নষ্ট হ'য়ে যেতে পারতো তো!'

আমার সঙ্গে আবার কাজে আসবে তো?

'আবার?…তা…তা কি ক'রে বলি? এর থেকে কতো পাবো, সেটা আগে বল!'

'আচ্ছা…ধর দুটো "রামধনু" যদি তোমায় দি—?'

'দুটো "রামধনু"! দুশো রুবল!! বেশ মোটা টাকা…তাহ'লে যেতে রাজী আছি।'

'একটু অপেক্ষা কর…কিন্তু তোমার জীবনটা—?'

'হ্যাঁ…হয়তো…জীবনটা নষ্ট নাও হ'তে পারে।' হাসতে হাসতে বলে গাভ্রিলা: 'আর তা যদি নষ্ট না হয়, আমি জীবনে প্রতিষ্ঠাও পেয়ে যেতে পারি।'

চেলকাশ হেসে উঠল খোস মেজাজে, বলল:

'বেশ, বেশ, যথেষ্ট হয়েছে। চল এবার ফেরা যাক।...'

আবার নৌকোয় ফিরে এল তারা। চেলকাশ বস্‌ল হালে আর গাভ্রিলা বস্‌ল দাঁড়ে। মাথার ওপরে ধূসর আকাশ ; তারই কোলে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে মেঘ। নৌকোটার গায়ে আছড়ে প'ড়ে খেলায় মত্ত নিচের সবুজ ঘোলাটে সমুদ্র। ঢেউএর তালে তালে নাচছে নৌকো ; ভেতরে বিন্দু বিন্দু লোনা জলের ছিটে পড়ছে। সামনের দিকে বহু দূরে দেখা যায় বেলাভূমির হলদে রেখা, পেছনে দিগন্ত বিসারী উত্তাল সমুদ্রের বুকে ধাবমান উর্মিমালা, মাথায় রজত ফেনপুঞ্জ...দূরে সমুদ্রের বুকে নিশ্চল জাহাজের সারি। বাম পার্শ্বে শুধু জাহাজের মাস্তুলের অরণ্য এবং শহরের সাদা রংয়ের অগুন্তি বাড়ী। সেদিক থেকে ভেসে-আসা একঘেয়ে গুম্ গুম্ আওয়াজের সঙ্গে উত্তাল ঢেউএর কলোচ্ছ্বাস মিশে উঠছে প্রাণবন্ত সিন্ধু রাগের সঙ্গীত... এবং এসবের উপরে পড়েছে ধূসর কুয়াশার আবরণ...সব কিছুকে কেমন দূরের বলে মনে হয়।...

'সন্ধ্যেয় দেখছি আজ বেশ তাণ্ডব নৃত্য শুরু হবে!' সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চেলকাশ বলে।

'ঝড় উঠবে?' গায়ের জোরে দাঁড় দিয়ে ঢেউ ঠেলতে ঠেলতে গাভ্রিলা জিজ্ঞাসা করে। বাতাসে ভেসে-আসা জলের বিন্দুতে তার আপাদমস্তক ভিজে উঠেছে।

'হুঁ—!' উত্তর দেয় চেলকাশ।

স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় গাভ্রিলা...তাকিয়ে থাকে চেলকাশের দিকে...

'কত পেলে ওদের কাছ থেকে?' চেলকাশ কথা উঠায় না দেখে প্রশ্ন করে গাভ্রিলা।

'এই যে দেখ!' পকেট থেকে মুঠো ক'রে কি বের ক'রে চেলকাশ গাভ্রিলার সামনে মেলে ধরে।

এক তাড়া রঙচঙে নোট দেখল গাভ্রিলা। চোখ দু'টো তার জ্বল জ্বল ক'রে উঠল।

'বাঃ!...কত? কত দিয়েছে ওরা?...'

'পাঁচশ চল্লিশ !'

'বাঃ বাঃ!' বিড়বিড় ক'রে উঠল গাভ্রিলা। নোটগুলো আবার যখন পকেটে রাখছে চেলকাশ, গাভ্রিলা লুব্ধ চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

'ওঃ, কত টাকা! যদি অত টাকা পেতাম আমি!' হতাশভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গাভ্রিলা।

'বেশ স্ফূর্তি করা যাবে!' হর্ষাপ্লুত কণ্ঠে বলে চেলকাশ: 'চল মদের আড্ডায়···মোটা টাকা আছে সঙ্গে!···ভয় নেই, তোমার ভাগ ঠিকই পাবে তুমি।···চল্লিশ রুবল তোমায় দেব, কেমন খুশি তো? চাও তো এখুনি পেতে পার।'

'দিতে পার···যা দিতে চাইছ দিতে পার।'

উৎকণ্ঠা ও আগ্রহে কাঁপছে গাভ্রিলা। আশার উত্তাল চাপে যেন বুক তার ভেঙে যায়।

'ওরে শয়তানের বাচ্চা! কেমন বল্‌ছে দেখ: 'দিতে পার যা দিতে চাইছ! দয়া ক'রে নিতেই হবে ভাই! এত টাকা নিয়ে কি করব আমি! দয়া ক'রে নিয়ে আমায় কৃতার্থ কর! নাও ভাই, নাও!'

গাভ্রিলার দিকে কতকগুলো নোট এগিয়ে দিল চেলকাশ। কম্পিত হস্তে নোটগুলো নিয়ে দাঁড়টা ছেড়ে দিল গাভ্রিলা। নোটগুলো বুকের মধ্যে গুঁজে রাখতে রাখতে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেলকাশকে দেখতে দেখতে জোরে সশব্দে নিঃশ্বাস নিতে থাকে, মনে হয় গরম কিছু পান করছে সে। ব্যঙ্গ-ভরা হাসি ফুটে থাকে তার মুখে···চেলকাশ লক্ষ্য করতে থাকে তাকে। দাঁড়টা আবার তুলে নিল গাভ্রিলা; ঘাবড়ে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে জোরে দাঁড় টানতে আরম্ভ করল। কিসের ভয়ে যেন সে সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছে। তার ঘাড় দুটো ও কান যেন কেউ মুচড়ে দিয়েছে।

'বড় লোভী তুমি!···খুব খারাপ···কিন্তু খুব আশ্চর্যের নয়। চাষা তো, হবেই!···' বিদ্রূপের স্বরে বলে চেলকাশ।

'কিন্তু একবার ভেবে দেখ, টাকা পেলে তুমি কি না করতে পার!' গাভ্রিলা জোরে বলে ওঠে। উত্তেজিত হ'য়ে বলতে শুরু করে গ্রাম্য জীবনে

টাকা থাকলে কি করা যায় আর না-যায়। সম্মান, প্রাচুর্য ও আনন্দ টাকা দিয়ে মানুষ পেতে পারে। এত জোরে আর তাড়াতাড়ি বলে চলল, মনে হ'ল যে তার চিন্তার পেছন পেছন ছুটছে কথাগুলো, একটা কথা যেন ছুটে ধরতে চাইছে তার পূর্বগামী কথাটাকে।

গম্ভীর মুখে মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলো শুনল চেলকাশ। পরিতৃপ্তির হাসি দেখা দিল মুখে।

'এসে গিয়েছি!' গাভ্রিলাকে বাধা দিয়ে চিৎকার ক'রে বলে উঠল চেলকাশ।

একটা ঢেউ নৌকোটাকে তুলে নিয়ে আস্তে বালির উপর ঠেলে দিল।

'এস ভাই, সব কাজ শেষ! নৌকোটাকে আর একটু টেনে তুলে দাও, নইলে স্রোতে ভেসে যাবে। যাদের নৌকো তারা এসে খুঁজে নিয়ে যাবে'খন। এইবার বিদায় পর্ব, কি বল? শহর এখান থেকে আট ভার্স্ট-এর মত দূরে হবে। কিছু বেশীও হ'তে পারে। কি করবে তুমি? শহরে ফিরবে নাকি?'

ধূর্ত হাসি চেলকাশের মুখে। তার হাবভাব দেখে মনে হয় গাভ্রিলাকে চমকে দেবার জন্য কিছু একটা মজার ফন্দী আঁটছে মনে মনে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটগুলো নিয়ে খস্ খস্ করতে লাগল সে।

'না···শহরে আমি যাবো না···আমি···' কোনমতে বলে গাভ্রিলা, গলায় যেন কিসে আটকে ধরেছে।

গাভ্রিলার দিকে তাকিয়ে চেলকাশ জিজ্ঞাসা করে: 'কি হয়েছে তোমার?'

'কিছু না···কেবল···' গাভ্রিলার মুখ একবার রক্তিম হয় আরেকবার সাদা হয়। কেমন ছটফট করতে থাকে সে। ভেতরে ভেতরে কিসের দ্বন্দ্ব চলেছে··· একবার মনে হয়, চেলকাশের উপর লাফিয়ে পড়বে। আবার মনে হয়, অন্য কিছু কষ্টসাধ্য কাজের কথা মনে ক'রে তার মনে ঝড় চলেছে।

ছেলেটার এই উত্তেজনায় মনে মনে উদ্বেগ অনুভব করে চেলকাশ। প্রতীক্ষা করে আশঙ্কা নিয়ে।

হঠাৎ হাসতে সুরু করে গাভ্রিলা···অদ্ভুৎ হাসি···কেমন চাপা বিলাপের মত। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে নিচের দিকে; তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না

চেলকাশ। কান দুটো শুধু দেখা যাচ্ছে, দেখছে চেলকাশ—মুহূর্তে লাল এবং পরক্ষণেই ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠছে সে-দুটো।

হাত নাড়তে নাড়তে বলে উঠল চেলকাশ: 'আচ্ছা আপদ দেখছি! কি হে আমার প্রেমে পড়ে গেলে নাকি? মেয়েদের মত অমন হেলছ দুলছ কেন? আমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে ভেঙ্গে পড়লে নাকি?…ওহে ছোঁড়া, বল না, কি হ'লো তোমার? না বলো তো আমি যাচ্ছি এখন।'

'চলে যাচ্ছ তুমি?' চিৎকার ক'রে উঠল গাভ্রিলা।

জনমানবশূন্য বেলাভূমি শিউরে উঠল, সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে জমে-ওঠা বালিয়াড়ী কেঁপে উঠল সে-চিৎকারে। চেলকাশও চমকে উঠল। হঠাৎ গাভ্রিলা চেলকাশের পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে দু'হাতে পা দুটো জড়িয়ে ধরে একটা টান দিল। তাল সামলাতে না পেরে বালির ওপর ধুপ ক'রে বসে পড়ল চেলকাশ। দাঁতে দাঁত চেপে লম্বা হাত দুটো ঘুরিয়ে ঘুষি মারতে নিল গাভ্রিলার মাথা তাক্ ক'রে, কিন্তু মারা হ'লো না; গাভ্রিলার সরম বিজড়িত মুখের ফিসফিসানি শুনতে পেল চেলকাশ:

'বন্ধু, দয়া কর!…আমায় সব টাকাগুলো দিয়ে দাও। দোহাই তোমার, যিশুর নাম ক'রে অনুরোধ করছি, দিয়ে দাও আমায়। কি হবে তোমার এ-টাকায়? তোমার এক রাত্রের খরচ…কিন্তু আমার অনেক অনেক বছর কেটে যাবে এই টাকা উপায় করতে…দিয়ে দাও আমায়, বন্ধু। তোমার জন্যে আমি দোয়া মাঙব…তিন তিনটে গির্জায় তোমার আত্মার জন্যে প্রার্থনা জানাব!… তুমি তো মুহূর্তে টাকা উড়িয়ে দেবে…কিন্তু আমি, আমি জমিতে এ-টাকা খাটাব! আমায় টাকাটা দাও! তোমার কাছে এ-টাকার কোন দামই নেই। অতি সহজেই তুমি আরও টাকা উপায় করতে পারবে, মাত্র একটা রাত্রি…মাত্র একটা রাত্রেই তুমি বড় লোক হ'তে পার! দয়া কর আমায়। তোমার জীবন তো ভাই ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছে…তোমার সামনে কোন ভবিষ্যৎই নেই আজ: কিন্তু আমার…ওঃ, এ-টাকা পেলে আমি কী না করতে পারি…দিয়ে দাও ভাই আমায় টাকাগুলো!'

বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল চেলকাশ…রাগে, পেছনে দুটো হাতে ভর দিয়ে

বসে রইল বালির উপর। একটি কথাও না বলে বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সে এই ছেলেটার দিকে। চেলকাশের হাঁটুর উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অস্ফুট অনুনয় ক'রে চলছে গাভ্রিলা। অবশেষে চেলকাশ ধাক্কা দিয়ে গাভ্রিলাকে সরিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো। তারপর পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রঙিন নোটগুলো বের ক'রে গাভ্রিলার দিকে ছুঁড়ে দিল।

'নে, নিয়ে যা…যা—' চিৎকার ক'রে উঠল চেলকাশ। এই লোভী গোলাম ছেলেটার উপরে এক তীব্র ঘৃণা ও করুণায় উত্তেজিত হ'য়ে সে কাঁপতে থাকে এবং টাকাগুলো ওর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে দরাজ দিল বিরাট মানুষ বলে মনে হয় চেলকাশের।

'তোকে আরও বেশী দেবো ভেবেছিলাম। কাল আমার মনটা কেমন নরম হ'য়ে পড়েছিল…। গাঁয়ের কথা, পুরোনো দিনের কথা সব মনে হয়েছিল… ভেবেছিলাম তোকে সাহায্য করব।…আমি শুধু প্রতীক্ষা করছিলাম তুই কি করিস দেখবার জন্য, আমার কাছে হাত পাতিস কিনা পরখ করছিলাম…কিন্তু দেখলাম তুই একটা একেবারে মেরুদণ্ডহীন…ভিক্ষুক!…টাকার জন্য নিজেকে এত ছোট করতে পারলি! আশ্চর্য! আহাম্মক! লোভী শয়তান! এতটুক আত্মসম্মানবোধ পর্যন্ত নেই! পাঁচ কোপেকের জন্য তোরা নিজেদের বিক্রি ক'রে দিতে পারিস!…'

'দেবদূত তুমি!…যিশু তোমায় রক্ষা করুণ! আমি তো এখন একেবারে আলাদা লোক…এখন আমি বড়লোক।' আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে গাভ্রিলা; বুক পকেটে নোটগুলো রাখতে রাখতে কাঁপতে থাকে সে: 'তুমি সত্যিই দেবদূত…ভারী দরাজ দিল মানুষ তুমি! আমি কোনদিনও তোমায় ভুলব না। কোনদিনও না। ভবিষ্যতে আমার বৌ ছেলেমেয়েদের বলে যাব—চিরকাল তারা তোমার জন্য দোয়া মাঙবে!'

তার উচ্ছ্বসিত প্রলাপ শুনতে শুনতে, তার অত্যাধিক লোভাতুর চক্‌চকে মুখের দিকে তাকিয়ে চেলকাশের মনে হয় যে, নিজে যদিও চোর সে—উদ্দাম বেপরোয়া সে—জীবনের সব কিছু থেকে সে বঞ্চিত—কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রকম হীন, লোভী, আত্মবিস্মৃত হ'তে সে কখনই পারবে না। না, কখনই না! এত

নিচুতে সে নামতে পারবে না !...এবং এই চিন্তার সঙ্গে তার মনে জেগে ওঠে নিজের স্বাধীনতা বোধ ; সেই নির্জন বালিয়াড়ীতে গাভ্রিলার পাশে দাঁড়িয়ে অন্তর্দাহে পীড়িত হ'তে থাকে চেলকাশ।

'জীবনে আমায় সুখী ক'রে দিলে, বন্ধু !' চেলকাশের হাতখানি নিয়ে তার মুখে ঘষতে ঘষতে গাভ্রিলা আবার বলতে শুরু করে।

চেলকাশ নির্বাক। শুধু দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে নেকড়ে বাঘের মত। আর গাভ্রিলা অনর্গল বকবক ক'রে চলেছে : 'জান, কি ভেবেছিলাম আমি ? আসতে আসতে টাকাগুলো আমি দেখতে পেয়েছিলাম। ভাবলাম, দাঁড় দিয়ে দিই এক ঘায়ে তোমাকে শেষ ক'রে। ব্যাস্, তারপরে টাকাগুলো সব আমার। জলের নিচে ফেলে দেব তোমাকে !...ভাবলাম, কেই বা আর খোঁজ করবে তোমার ! যদি বা কেউ দেখতেও পায় তোমায়, তখন কে তোমাকে মারল সে-খোঁজ নেবার জন্য কারই বা অত মাথাব্যথা হবে ! বিশেষ কিছু হৈচৈ হবে না ; পৃথিবীতে যার কোন প্রয়োজন নেই, কে আর খোঁজ করবে তার জন্য ?...'

গাভ্রিলার টুঁটি চেপে ধরে গর্জন ক'রে উঠল চেলকাশ :

'দে ! দিয়ে দে টাকা।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে গাভ্রিলা। কিন্তু চেলকাশের আর একটি হাত সাপের মত জড়িয়ে ধরেছে তাকে...সার্ট ছেঁড়ার শব্দ হয় ; বালির ওপর প'ড়ে পা ছুঁড়তে থাকে জোরে...একটা বন্য বিস্ময়তা চোখে নিয়ে গাভ্রিলা আকাশের দিকে তাকিয়ে শূন্যে আঙ্গুল খিঁচোতে থাকে। চেলকাশ নির্বিকার ...দীর্ঘ ঋজু দেহ টান ক'রে সোজা দাঁড়িয়ে হিংস্র চোখে তাকিয়ে দেখছে গাভ্রিলার দিকে ; কিড়িমিড়ি শব্দে দাঁত ঘষছে ; ভাঙা গলায় হেসে উঠছে ; অট্টহাসি...বিদ্রূপ ঝরে পড়ে সে-হাসিতে ; তার রুক্ষ কঠোর মুখে গোঁফ জোড়া কাঁপে। এইরকম নিষ্ঠুর অপমানে অপমানিত জীবনে কখনও সে হয়নি ; এইরকম অদ্ভুৎ ক্রোধ অন্তরে কখনও কোনো দিন সে অনুভব করেনি।

'কি, এখন খুশি হয়েছ ?' অট্টহাসি হেসে গাভ্রিলাকে জিজ্ঞাসা করে। তারপরেই পেছন ফিরে পা বাড়ায় শহরের দিকে। কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে

চেলকাশ, এমন সময় গাভ্রিলা হঠাৎ এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বিড়ালের মত উঠে ব'সে একটা গোল পাথর তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারে চেলকাশের মাথা তাক্ ক'রে ; হিংস্র চিৎকারে চেঁচিয়ে ওঠে :

'হেই—সামলাও এবার !'

আর্তনাদ ক'রে উঠে দু'হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে চেলকাশ টলতে টলতে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে গাভ্রিলার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েই বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। হতবাক গাভ্রিলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল উবু হ'য়ে পড়ে-যাওয়া চেলকাশকে, দেখল পা কাঁপছে তার, মাথা তুলবার চেষ্টা করল একবার, ধনুকের ছিলার মত কাঁপতে কাঁপতে টান হ'য়ে পড়ে রইল। তারপর দৌড়তে সুরু করল গাভ্রিলা, ছুটে চলল দূরের ঐ কুয়াশাচ্ছন্ন ধু ধু প্রান্তরের দিকে যেখানে জমে উঠছে কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মেঘ, যেখানে জমে উঠেছে অন্ধকার। বালুতটের উপর সমুদ্রের ঢেউ কল কল শব্দে গড়িয়ে এসে বালিগুলো ধুয়ে দিচ্ছে তারপর আবার নেমে যাচ্ছে···শোনা যাচ্ছে ফেনার অস্ফুট হিস্ হিস্ শব্দ ; বাতাসে ভাসছে জলকণা।

বৃষ্টি নামল, প্রথমে ঝিরঝির ক'রে, পরক্ষণেই মুষলধারায়···একটানা বর্ষণ। চারদিকে জলের সূক্ষ্ম রেখার জাল বুনে যেন কে ছড়িয়ে দিয়েছে—সমুদ্র প্রান্তরকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে। এবং গাভ্রিলা এই জালের মধ্যে মিশে গেল। অনেক্ষণ পর্যন্ত আর কিছুই দেখা গেল না, শুধু বৃষ্টি আর বালিয়াড়ীর উপর প্রসারিত সেই মানুষের দীর্ঘ ঋজু দেহ। হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে ফিরে এল গাভ্রিলা ; পাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল চেলকাশের উপর, মাটির উপর টেনে বসাবার চেষ্টা করল তাকে। তাজা জমাট রক্তে লাল হ'য়ে গেল হাতখানা···শিউরে উঠল গাভ্রিলা, সমস্ত মুখখানা আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার। বৃষ্টি ধারার ঝরঝর শব্দের মধ্যে চেলকাশের কানে কানে সে আস্তে আস্তে বারে বারে বলে : 'ওঠ, ওঠ ভাই !'

জলের ঝাপটা পেয়ে সম্বিৎ ফিরে আসে চেলকাশের। এক ধাক্কা দিয়ে গাভ্রিলাকে সরিয়ে দিয়ে কঠিন স্বরে বলে ওঠে : 'দূর হ'—'

'ক্ষমা কর, ভাই, আমায় ক্ষমা কর ! প্রলোভনে ভুলেছিলাম আমি।'···

চেলকাশের হাতখানি চুমোয় ভরে দিতে দিতে অস্ফুট কম্পিত কণ্ঠে বলে গাভ্রিলা।

'দূর হ', দূর হ' তুই— !' গুমরে বলে চেলকাশ।

'আমার অন্তরের সমস্ত পাপ তুমি মুছে দাও, আমায় ক্ষমা কর ভাই! দয়া ক'রে আমায় ক্ষমা কর।...'

'যা, যা, বলছি! জাহান্নামে যা হতভাগা!' চেলকাশ চিৎকার ক'রে উঠে বসে। ক্রুদ্ধ ফ্যাকাশে চেহারা, স্তিমিত চোখ, মনে হচ্ছে খুব ঘুম পেয়েছে চেলকাশের।

'আর কি চাস্ তুই? যা চেয়েছিলি তাই তো পেয়েছিস্...যা, যা, দূর হ' আমার সামনে থেকে!...'

পা ছুঁড়ে তাকে লাথি মারতে গেল চেলকাশ, কিন্তু পারল না। গাভ্রিলা তৎক্ষণাৎ দু'হাত দিয়ে তার গলাটা না জড়িয়ে ধরলে মাথা ঘুরে পড়ে যেত চেলকাশ। গাভ্রিলার মুখের ঠিক সামনে চেলকাশের মুখখানি; দুটো মুখই কেমন রক্তহীন পাঁশুটে ভয়ঙ্কর।

'থুঃ!' চেলকাশ গাভ্রিলার বিস্ফারিত চোখ দুটিতে থুথু ছিটিয়ে দিল।

মুখখানা জামার হাতা দিয়ে নীরবে মুছে নিয়ে অস্ফুটস্বরে বলে গাভ্রিলা: 'যা খুশি তোমার কর...কিচ্ছু বলব না আমি। আমায় শুধু তুমি ক্ষমা কর... যিশুর নাম ক'রে আমি ক্ষমা চাইছি!'

'কীট! শয়তানী করতেও শিখিস্ নি!' খেঁকিয়ে ওঠে চেলকাশ সার্টের নিচের ফতুয়া থেকে এক ফালি কাপড় টেনে ছিড়ে নিয়ে নীরবে মাথার ক্ষত বাঁধতে থাকে। কোন কথা বলে না, দাঁত কিড়িমিড়ি করতে থাকে শুধু মাঝে মাঝে। 'নোটগুলো নিয়েছিস্?' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল কথাগুলো।'

'না, আমি ওগুলো ছুঁইওনি! ও আমি চাই না! ওগুলো বড় অপয়া!...'

ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একতাড়া নোট বের করল চেলকাশ; একখানা রঙীন নোট পকেটে রেখে বাকী সবগুলো গাভ্রিলার দিকে ছুঁড়ে দিল।

'নে এগুলো, দূর হ' এখান থেকে!...'

'ও আমি নেবো না ভাই...! ও আমি নিতে পারব না! ক্ষমা কর আমায়!'

'নে বলছি! আমি বলছি নে!' গর্জিয়ে ওঠে চেলকাশ। চোখদুটো গোল ভীষণ-দর্শন হ'য়ে পাক খেতে থাকে।

'আগে আমায় ক্ষমা কর…তারপর নেব।' অবনত স্বরে গাভ্রিলা বলে; বৃষ্টিতে ভেজা বালির উপর চেলকাশের পায়ের কাছে হুঁমড়ি খেয়ে পড়ে গাভ্রিলা।

'মিথ্যেবাদী! নিতেই হবে তোকে। কীটানুকীট, আমি জানি যে তুই ঐ টাকা নিবি!' দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে চেলকাশ। চুলের মুঠি ধরে গাভ্রিলার মাথাটা টেনে তুলে, নোটগুলো ছুঁড়ে দেয় তার মুখের উপরে।

'নে, নে টাকাগুলো, নে! হ্যাঁ, তুই টাকাগুলো আয় করেছিস! ভয় নেই! একটা মানুষকে মেরে ফেলেছিলি প্রায়—তাতে তো লজ্জা হয় নি! আমার মত লোকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তোকে কেউ কিছু বলবে না, বরং জানতে পারলে ধন্যবাদ দেবে। নে, নিয়ে যা টাকাগুলো!'

গাভ্রিলার মনে হ'ল, চেলকাশ পরিহাস করছে। তাই মনটা তার হাল্কা হ'য়ে গেল। নোটগুলো হাতের শক্ত মুঠোয় বারে বারে নাড়তে নাড়তে সাশ্রু স্বরে বলে: 'আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ভাই…ক্ষমা কি করলে?'

'দেবদূত!' মুখ ভেঙচে বলে ওঠে চেলকাশ, তারপর টলতে টলতে পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। 'ক্ষমা? কিসের জন্য ক্ষমা? ক্ষমা করার তো কিছু নেই! আজ তুমি যা করলে কাল আমিও তাই করতে পারি!'

'ওঃ, ভাই, ভাই!' মাথা নাড়তে নাড়তে বিষণ্ণভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গাভ্রিলা বলে।

মুখোমুখি দাঁড়াল চেলকাশ, মুখে রহস্যজড়িত অদ্ভুৎ হাসি, মাথায় জড়ানো নেকড়ার ফালিটা রক্তে লাল হয়ে তুর্কী-ফেজের মত দেখতে হয়েছে।

অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে; গুমরে গুমরে উঠছে সমুদ্র, ক্রোধে উন্মত্ত ঢেউগুলি তীরের ওপর আছড়ে পড়ছে।

আর স্তব্ধবাক্ দুটি লোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে…

'হ্যাঁ, এবার বিদায়!' কেমন বিদ্রূপ মাথানো কণ্ঠস্বর চেলকাশের।

টলছে চেলকাশ, পা দুটো কাঁপছে তার। হাত দিয়ে অদ্ভুৎভাবে মাথাটা চেপে ধরেছে, মনে হয়, যেন তার ভয়, এই বুঝি মাথাটা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে যায়।

'ক্ষমা ক'রে যাও ভাই তুমি আমায় !' অনুনয় করে গাভ্রিলা।

'আচ্ছা, আচ্ছা, ক্ষমা করলাম। নির্বিকার হিমশীতল শান্ত কণ্ঠে জবাব দিয়ে টলতে টলতে এগোয় চেলকাশ। টলছে···মাথাটা তখনও বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরা, আর ডান হাত দিয়ে চুমরে দিচ্ছে তার বাদামী গোঁফ জোড়া।

গাভ্রিলা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল···বৃষ্টির পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল চেলকাশ; অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে···অবিশ্রাম ধারা···সমস্ত প্রান্তরকে ঢেকে দিয়েছে এক দুর্ভেদ্য বিষণ্ণতায়, কেমন এক ইস্পাতের রং নেমেছে সমস্ত প্রান্তর ঘিরে। জলে ভেজা টুপিটা তুলে নিল গাভ্রিলা। নিজের কপাল-বুক ও দু'কাঁধ ছুঁয়ে ক্রশ চিহ্ন এঁকে তাকাল হাতের দলা পাকানো নোটগুলোর দিকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জামার বুক-পকেটে নোটগুলো গুঁজে রাখল। তারপর তীর ধরে যে-পথে চেলকাশ গিয়েছে, ঠিক তার উল্টো দিকে দৃঢ়পদক্ষেপে হেঁটে চল্‌লো।···

সমুদ্র গর্জিয়ে উঠে বিশাল ভারী ঢেউ ছুঁড়ে দেয় বালুতটের ওপরে··· সহস্র বিন্দু ও ফেনপুঞ্জে ভেঙে পড়ে সেই উর্মিমালা। জল ও মাটির ওপরে আছড়ে পড়ে বৃষ্টির বড় বড় ফোটা···সোঁ সোঁ শব্দে ঝড়ো বাতাস চিৎকার ক'রে ছোটে···চারধারের হাওয়ায় শোনা যায় নাকি কান্নার নালিশ, গর্জন ও গুম্ গুম্ ধ্বনি···বৃষ্টির মুষলধারা বর্ষণে আকাশ ও সমুদ্র মিশে একাকার হ'য়ে যায়।

বৃষ্টির ধারা ও ঢেউএর সহস্র কণায় ধুয়ে মুছে গেল চেলকাশের রক্তে রাঙা তটভূমি; মুছে গেল চেলকাশ ও গাভ্রিলার বালির উপরের পদচিহ্ন···নির্জন বেলাভূমির ওপর দুটি চরিত্রকে নিয়ে এই যে ছোট্ট একটি নাটকের অভিনয় হ'য়ে গেল, তার সমস্ত চিহ্ন একেবারে অবলুপ্ত হ'য়ে গেল।

[অনুবাদ : পার্থ কুমার রায়

একটি শরৎ-সন্ধ্যা

শরৎকালের কোন এক সন্ধ্যাবেলা একবার অত্যন্ত মুস্কিলে পড়েছিলাম। একটি শহরে সবেমাত্র গিয়ে পৌঁচেছি, কাউকে চিনি না। একেবারে কপর্দহীন, মাথা গুঁজবার ঠাঁই পর্যন্ত নেই।

প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়তি জামা কাপড় সব বিক্রি ক'রে শহর ছেড়ে শহরতলীর দিকে রওনা হলাম। শহরতলিটীর নাম উস্তি। জাহাজ চলাচলের মরশুমে উস্তির জাহাজ ঘাটাগুলো কর্মব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এখন অক্টোবরের শেষ—জায়গাগুলো নিস্তব্ধ, জনমানবহীন।

দুই পায়ে ভিজে বালি ঠেলে শূন্য বাড়ী আর দোকানের ভেতর দিয়ে চলেছি ; খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছি রুটির টুকরো টাকরা যদি কোথাও মেলে ; আর যেতে যেতে ভাবছি, পেট ভরে খেতে পাওয়াটা কত বড় ভাগ্যের কথা।

বর্তমানের এই সভ্যতায় দেহের খিদের চাইতে মনের খিদে মেটে অনেক সহজে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলেই চোখে পড়বে নানা ধরনের বাড়ী, বাইরে থেকে দেখতে ভারী চমৎকার, ভেতরটাও নিশ্চয়ই সেই রকম। ব্যস, এর পর ভাস্কর্য, স্বাস্থ্য বা যে কোন গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে বেশ সুখকর চিন্তার জাল বুনে চলতে পারেন। পথে যেতে যেতে যে সব কেতাদুরস্ত ফিটফাট পোষাক পরা ভদ্রলোক দেখতে পাবেন, তারা কিন্তু আপনাকে এড়িয়েই চলবে, কোনমতে দেখতে না পেলেই তারা খুশি হবে। বাস্তবিকই, একজন সম্পন্ন লোকের চাইতে ক্ষুধার্ত লোকের চিন্তার খোরাক জোটে অনেক বেশী। এ থেকে সম্পন্ন লোকদের স্বপক্ষে বেশ একটা মনোমত সিদ্ধান্ত টানা যায়।...

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বৃষ্টি পড়ছে তখনও। উত্তরে দমকা বাতাস সোঁ

সোঁ শব্দে শূন্য দোকান পাটের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে হোটেলের বন্ধ জানালাগুলির ওপর আঘাত করছে। সমুদ্রের বালুবেলায় সশব্দে আছড়ে পড়ছে বিক্ষুব্ধ নদীর ঢেউগুলি। পরস্পর সংঘর্ষে ফেনিল ঢেউগুলি ছুটে চলেছে দূরের অন্ধকারে। যেন বুঝতে পেরেছে শীত আসছে ; তাই ভয় পেয়ে পালাচ্ছে, কি জানি যদি উত্তুরে বাতাস সেই রাতেই তাকে বরফ দিয়ে বেঁধে ফেলে। কেমন যেন ভারী হয়ে নুয়ে পড়েছে আকাশটা, আর সমানে বৃষ্টি হচ্ছে গুড়ি গুড়ি।

জরাজীর্ণ, শুকনো, বাঁকাচোরা উইলো গাছগুলি আর তাদেরই গুঁড়ির কাছে টেনে তোলা একটি নৌকো...আমার চারপাশে কেমন একটা ম্লান পরিবেশ।

তলাভাঙা নৌকো আর শীতের বাতাসে মরমরিয়ে ওঠা করুণ প্রাচীন গাছ... সমস্ত কিছুই জীর্ণ, নিষ্ফল, মৃত। আকাশ কেঁদে চলেছে অবিশ্রান্ত। চারপাশে শুধু বিষণ্ণ শূন্যতা, মনে হ'ল, এই মৃত পরিবেশে আমিই একমাত্র প্রাণময়। আমিও যেন অনুভব করলাম প্রতীক্ষমান মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ !

আমার বয়স তখন সবেমাত্র সতেরো, যাকে বলে দীপ্ত যৌবন !

ঠাণ্ডা আর ভিজে বালির ভেতর দিয়ে হেঁটে চললাম। শীতে আর খিদের চোটে দাঁতে দাঁত লেগে কেমন কড় কড় শব্দ হচ্ছে। খাবারের জন্য মিছিমিছি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, মেয়েদের পোষাক পরে গুটিসুটি মেরে কে যেন বসে আছে। তার আনত গ্রীবায় বৃষ্টিতে ভেজা কাপড় লেপটে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, কি করছে সে। দেখলাম, কোন একটা দোকানের তলায় নাগাল পাবার জন্য দু' হাত দিয়ে বালি খুঁড়ছে সে।

'এ্যাই ! ওকি হচ্ছে ?' ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে লাফিয়ে উঠল সে। তার আয়ত ধূসর চোখ মেলে কেমন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। দেখলাম, আমারই সমবয়সী একটি মেয়ে। বেশ সুন্দর মুখখানি। কিন্তু তিনটি গভীর ক্ষত সে মুখের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট ক'রে দিয়েছে। ক্ষতগুলি কিন্তু বেশ মানানসই, দুই

চোখের নিচে দুইটি একই ধরনের ; আর একটি নাকের ওপরে—কপালে, একটু বড়। মানুষের মুখ কুৎসিৎ করায় দক্ষ কোন শিল্পীর হাতের কাজ যেন।

মেয়েটি আমার দিকে তাকাল। যেন ভয়ের ভাবটা কেটে গেল আস্তে আস্তে। হাতের বালিগুলো ঝেড়ে ফেলল। তারপর মাথার রুমালটা ঠিক ক'রে ঘাড়টা একটু নাড়িয়ে প্রশ্ন করল :

'তোমারও বুঝি খিদে পেয়েছে ? খোঁড়ো এসে। ব্যথা হ'য়ে গিয়েছে আমার হাত দুটো। এখানটায় নিশ্চয়ই রুটি আছে। দোকানটা এখনও উঠে যায়নি।'

খুঁড়তে শুরু করলাম আমি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ও দেখল। তারপর আমার পাশে বসে সাহায্য করতে লাগল।

নিঃশব্দে কাজ ক'রে চললাম আমরা। বিচার, নীতিবোধ, সম্পত্তির অধিকার, বা অন্য কোন বিষয়—প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে যা স্মরণ রাখতে বলেন, তার কোন কিছু সে সময় আমার স্মরণে ছিল কি না, আজ আর তা বলতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি, অস্বীকার করব না, সে সময় এত মনোযোগ দিয়ে বালি খুঁড়ছিলাম যে কোন কিছুই মনে ছিল না, শুধু একমাত্র চিন্তা, দোকানটাতে কি পাওয়া যেতে পারে।

আর একটু বেশী সন্ধ্যা হতেই আমার চারশাশে অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে এল ; ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে আর ছমছমে অন্ধকার। ঢেউগুলির গর্জন যেন মন্দীভূত হয়ে এসেছে বলে মনে হ'ল। কিন্তু দোকানের ঝাপগুলোর ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্তভাবে, আরও জোরে, আরও শব্দ ক'রে।...এর মধ্যেই রাতের পাহারওয়ালার হাঁক শোনা গেল।

সঙ্গিনীটি অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করল : 'মেঝে আছে তো ?'

বুঝতে পারলাম না কি বলছে, চুপ ক'রে রইলাম।

'মেঝে ! দোকানটার মেঝে আছে তো ? যদি না থাকে, আমাদের সমস্ত খাটুনিই জলে গেল। গর্ত তো খুড়লাম। কিন্তু তারপর যদি দেখি শক্ত শক্ত ভারী ভারী পাটাতন, সেগুলো আলগা করব কেমন ক'রে ? তার চেয়ে বরঞ্চ তালাটা ভেঙে ফেলি। তালাভাঙা কি আর অমন ব্যাপার !'

মেয়েমানুষের মাথায় ভাল মতলব বড় একটা আসে না; কদাচিত মাঝে মাঝে আসে। ভাল মতলবের কদর আমি চিরকালই ক'রে এসেছি, আর যতদূর সম্ভব তার সুবিধাটুকু নেবার চেষ্টা করেছি।

তালাটা ধরে জোরে টান দিতেই কড়া শুদ্ধ খুলে এল। সঙ্গিনীটি তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পড়ে সাপের মত তরতরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। পরক্ষণে ভেতর থেকে উৎসাহিত কণ্ঠ ভেসে এল : 'ঠিক আছে!'

পুরোনো বক্তাদের সমস্ত পারদর্শিতাও যদি কোন পুরুষের থেকে থাকে, তার স্তুতিগানের চাইতেও আমার কাছে কোন মেয়ের অতি তুচ্ছ প্রশংসা ঢের বেশী কাম্য। কিন্তু এখনকার মত এতখানি মর্যাদা তখন আমি তাদের দিতাম না। তার বাহবায় কান না দিয়ে রূঢ় ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম : 'কিছু আছে?'

গড়গড় ক'রে সে তার আবিষ্কারের ফিরিস্তি দিতে শুরু করল :

'এক ঝুড়ি বোতল, খালি থলে, একটা ছাতা, একটা লোহার বাটি।'

কিন্তু এগুলো তো খাবার জিনিস নয়! সমস্ত আশাই গেল বুঝি। হঠাৎ সে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল : 'আঃ, এই যে—!'

'কি?'

'রুটি।...পাউরুটি। একটু ভিজে শুধু...এই নাও!'

পায়ের কাছে একটা পাউরুটি গড়িয়ে এল। পেছনে পেছনে এল আমার দুঃসাহসী সঙ্গিনী। ততক্ষণে এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে চিবোতে শুরু ক'রে দিয়েছে।...

'আমাকে এক টুকরো।...এবার এখান থেকে বেরুনো উচিত। কিন্তু কোথায় যাবো?'

চারদিকে উঁকি মেরে সে সিক্ত শব্দময় অন্ধকারের দিকে তাকাল।

'পাড়ের ওপর একটি নৌকো তোলা আছে। যাবে সেখানে?'

'চল।'

পথে যেতে যেতে আমাদের লুটের মাল ছিঁড়ে মুখে পুরতে লাগলাম। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। দূরে নদীর গর্জন। বহু দূর থেকে একটানা

শিসের শব্দ ভেসে আসছে, বিদ্রূপের মত ; কোন বেপরোয়া দানব যেন ব্যঙ্গ করছে পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে, শরতের এই হতভাগা সন্ধ্যা—তার এই দুটি নায়ক-নায়িকাকে। কেমন যেন খচ্‌খচ ক'রে উঠল বুকের ভেতরটা। আমি ও আমার সঙ্গিনীটি তবু আকণ্ঠ খেলাম। আমার বাঁ পাশে হেঁটে চলেছে সে।

'কি নাম তোমার ?' কি জানি কেন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

শব্দ ক'রে চিবোতে চিবোতে উত্তর দিল : 'নাটাশা।'

তার দিকে তাকাতেই সমস্ত বুকটা যেন ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। সামনের অন্ধকারের দিকে চোখ ফেরালাম ; মনে হ'ল আমার নিয়তির ব্যঙ্গমুখ, আমার দিকে চেয়ে দুর্বোধ্য আর নিষ্ঠুর হাসি হাসছে।

নৌকোর ওপর বৃষ্টির অবিশ্রান্ত করুণ শব্দ ; মনটা বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। নৌকোর তলে একটা ভাঙা গর্তে বাতাস ঢুকে কেমন হিস্‌হিস্ শব্দ হচ্ছে ; অশান্ত করুণ শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে একটা আলগা কাঠের টুক্‌রো। একঘেয়ে আর হতাশ গর্জনে ঢেউগুলি তীরের ওপর আছড়ে পড়ছে ; যেন ভীষণ পরিশ্রান্ত এক ভগ্নদূত,—বিরক্তিকর আশাভঙ্গের কাহিনী গোপনের ইচ্ছা সত্ত্বেও না শুনিয়ে যেন উপায় নেই।

নদীর গর্জন আর বৃষ্টির শব্দ মিশে পৃথিবীর একটানা দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাতে লাগল। উষ্ণ উজ্জ্বল গ্রীষ্মের পরেই স্যাঁতসেঁতে কুয়াশাচ্ছন্ন শরৎ—অনাদি অনন্তকালের এই নিয়মে বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে যেন পৃথিবী। শূন্য তীর, ফেনিল নদীর ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে চলেছে ম্লান বিষণ্ণ গান গেয়ে।

নৌকোর ভেতর আস্তানা নিয়ে এতটুকুও আরাম পেলাম না। কেমন সংকুচিত আর স্যাঁতসেঁতে। তলার ফুটো দিয়ে বৃষ্টির ঠাণ্ডা ছাঁট আর বাতাস আসছে। নিঃশব্দে বসে শীতে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলাম। ঘুম পাচ্ছে ভীষণ। নৌকোর ধারে পিঠ দিয়ে বসল নাটাশা। কুঁকড়ে গোল হ'য়ে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গিয়েছে। হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে তার ওপর থুতনিটি রেখে আয়ত চোখে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। ক্ষতগুলির জন্য তার পাণ্ডুর মুখে চোখ দুটি মস্ত বড় বড় মনে হচ্ছে। নিশ্চল স্থাণুর মত বসে রয়েছে নাটাশা,

কেমন যেন ভয় ভয় করল আমার। ভাবলাম, কথা বলি, কিন্তু কি বলে আরম্ভ করব বুঝলাম না।

সে-ই প্রথমে কথা বলল।

'কী অভিশপ্ত জীবন !' বেশ পরিষ্কার, ভেবে-চিন্তে অখণ্ড বিশ্বাসে সে তার মত ব্যক্ত করল।

নালিশ নয়। গলার স্বরে বেশ নির্লিপ্ততা ফুটে উঠল। এ বিষয়ে চিন্তা ক'রে একটা স্থির সিদ্ধান্তে সে পৌঁচেছে মাত্র। তার কথায় সে সেটাই ব্যক্ত করল। তার কথা অস্বীকার করতে গেলে নিজেরই বিরুদ্ধতা করতে হয়, তাই চুপ ক'রে রইলাম। স্থাণুর মত বসে রইল সে, আমাকে লক্ষ্যই করেনি যেন।

'যদি মরতে পারতাম !'

আবার কথা বলল নাটাশা। বেশ শান্ত ও চিন্তিত সুরে। এবারও কথার সুরে নালিশের চিহ্নমাত্র নেই। স্পষ্টই বোঝা গেল, জীবন সম্বন্ধে চিন্তা ও নিজের কথা বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তই সে করেছে। জীবনের ব্যর্থতা থেকে বাঁচতে হ'লে তার কথামত মৃত্যু ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

তার এই চিন্তার স্বচ্ছন্দতায় রীতিমত পীড়িত হ'য়ে উঠলাম। মনে হ'ল, আর যদি চুপ ক'রে থাকি, তাহ'লে নিশ্চয়ই কেঁদে ফেলব। একজন স্ত্রীলোকের সামনে খুব কেলেঙ্কারী ব্যাপার হবে সেটা, বিশেষতঃ, সে যখন কাঁদছে না। ঠিক করলাম, কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখব তাকে।

'তোমায় মারল কে ?' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। এর চাইতে ভাল কিছু বলার পেলাম না।

'পাশকা।' কেমন শান্ত স্বর ; প্রতিধ্বনির মত শোনাল যেন।

'কে সে ?'

'আমার প্রেমিক। এক রুটিওয়ালা।'

'প্রায়ই মারে নাকি তোমাকে ?'

'মাতাল হলেই মারে।'

হঠাৎ আমার কাছে ঘেঁষে এল সে। তারপর বলতে শুরু করল তার নিজের কথা, পাশকার কথা, তাদের দু'জনের সম্পর্কের কথা। সাধারণ গণিকা

সে। লাল গোঁফওয়ালা সেই রুটিওয়ালা খুব চমৎকার হারমোনিয়াম বাজাতে পারত। তাদের বাড়ীতে যেত সে। নাটাশা তাকে খুব পছন্দ করত। ভারী হাসিখুশি আর ফিটফাট। গায়ে পনেরো রুব্‌লের কোট, আর পায়ে জরির কাজকরা জুতো ; এই জন্যই নাটাশা তার প্রেমে পড়ে গেল। পাশকা তার পুরুষ হ'ল। এর পর থেকেই, নাটাশাকে মিষ্টি খাবার জন্য কেউ পয়সা দিলে, তা ছিনিয়ে নিতে শুরু করল ; তাই দিয়ে সে মদ খেত ; নাটাশাকে ধরে ধরে মারত। সব চাইতে জঘন্য ব্যাপার, নাটাশারই চোখের সামনে অন্য মেয়ে নিয়ে সে ফূর্তি শুরু ক'রে দিল।

'দুঃখ হয় না এতে ? আমি কি কারও চাইতে কম ? বদমাইসটা আমাকে স্রেফ বোকা বানিয়েছে। পরশু বাড়ীউলীর কাছ থেকে বেড়াবার ছুট নিয়ে তার বাড়ীতে এলাম। দেখি মদে চুর হ'য়ে ঢুকা বসে আছে তার সাথে। পাশকারও একই অবস্থা। চিৎকার ক'রে উঠলাম—বদমাইস, জোচ্চর ! বেদম মার দিল আমায়, লাথি মেরে চুল টেনে নানা রকমে নির্যাতন করল। এতেও কিছু মনে করতাম না আমি, কিন্তু আমার জামা-কাপড়গুলো ছিড়ে দিল। এখন আমি কি করি ? কেমন ক'রে বাড়ীউলীর কাছে যাই ? আমার সমস্ত কিছু ছিড়ে দিয়েছে সে…জামা…জ্যাকেট…একেবারে নতুন ! মাথা থেকে রুমালটা টেনে নিয়েছে। ভগবান। কি হবে আমার।'

অসহ্য যন্ত্রণায় নাটাশা ভাঙা গলায় ফুপিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ।

বাতাসের গর্জন কানে এল। আগের চাইতেও ঠাণ্ডা আর ধারালো বাতাস। আমার এত কাছে ঘেঁষে বস্‌ল নাটাশা যে সেই অন্ধকারেও তার জ্বলে ওঠা চোখ স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

'কী শয়তান তোমাদের এই পুরুষ জাত। ইচ্ছে করে দুই পায়ে মাড়িয়ে একেবারে পঙ্গু ক'রে ফেলি। চোখের সামনে কোন পুরুষকে মরতে দেখলেও দয়া করব না এতটুকুও, তার মুখে থুথু দিয়ে দেব। জঘন্য ছোটলোক ! ঘৃণ্য কুকুরের মত লেজ নেড়ে নেড়ে তোমরা আমাদের মন ভোলাও। তারপর বোকার মত যখন তোমাদের কাছে ধরা দিই, তখন আমাদের দুই পায়ে মাড়িয়ে চলে যাও। ছোটলোক। লম্পট।'

প্রচুর গালাগাল দিল। কিন্তু মোটেই ঝাঁজ ছিল না সে-গালাগালে। যা শুনলাম, তাতে 'ছোটলোক লম্পট'দের ওপর তার দ্বেষ বা ঘৃণা আছে বলে মনে হ'ল না। তার বক্তব্যের সঙ্গে গলার সুরের কোন সঙ্গতি ছিল না। কেমন শান্ত, একটানা সুরে সে বলে যাচ্ছিল। তখনকার দিনে দুঃখিনী বারবনিতা সম্বন্ধে বাক্‌চাতুর্যে জোরালো বই বা বক্তৃতা অনেক পড়েছি এবং শুনেছি; কিন্তু তাদের চাইতে নাটাশার কথা আমায় স্পর্শ করল বেশী। তার কারণ, একেবারে হুবহু, সাহিত্যোচিত মৃত্যু বর্ণনার চাইতে সত্যিকারের মৃত্যু আরও বেশী স্বাভাবিক, আরও বেশী সংবেদনশীল।

আমার অবস্থা এ-দিকে সাংঘাতিক; সঙ্গিনীর কথায় নয়, শীতে। অস্ফুট-স্বরে গোঙাতে গোঙাতে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটি নরম ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম; একটি গলায়, আর একটি মুখের ওপর নেমে এল; সেই সঙ্গে কানে এল ব্যাকুল কোমল স্নেহের সুর: 'কি হয়েছে?'

অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বাস হ'ত। কিন্তু নাটাশা! এই মুহূর্তে যে বলল সমস্ত পুরুষই শয়তান, তারা নিঃশেষ হ'লে সে খুশি হয়!

কিন্তু ব্যস্ত হ'য়ে সে প্রশ্ন শুরু ক'রে দিল: 'কি হ'ল, এঁ্যা? ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছ নাকি? কী অদ্ভুত ছেলে বাবা! প্যাঁচার মত চুপচাপ বসে আছে এতক্ষণ বলনি কেন ঠাণ্ডা লেগেছে? এস...শুয়ে পড়...হাত পা ছড়িয়ে দাও; আমিও শুচ্ছি...এই তো! ব্যস্, এবার দু' হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধর জোরে। এইবার গরম হ'য়ে উঠবে ঠিক...তারপর আবার আমরা পেছন ফিরে শোবো এখন। কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া আর কি! আচ্ছা, মদ খেয়েছিলে বুঝি তুমি?...চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে?...কি আর হয়েছে তাতে?'

সান্ত্বনা দিল আমায়, উৎসাহ দিল।

কী লজ্জার কথা। সমস্ত ঘটনাটাই যেন আমার প্রতি একটা বিদ্রূপ। মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি রীতিমত চিন্তা করি সে সময়; সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন আর রাজনৈতিক উত্থানের স্বপ্ন দেখি; লেখকরাও যে সব অদ্ভুত

পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইয়ের গভীরতার হদিস পেতেন না, সব পড়ে ফেলেছি তখন ; সক্রিয়, গুরুতর শক্তি হিসাবে গড়ে তুলছি নিজেকে ; আর আমাকে কি না এক সাধারণ গণিকা তার দেহের তাপে গরম ক'রে তুলবার চেষ্টা করছে! নামহীন, গোত্রহীন, কদর্য বিতাড়িত এক জীব। আগে সাহায্য না করলে তার সাহায্যের কথা আমি ভাবতেও পারতাম না ; যদি ভাবতামও, সাহায্য আমি কিছুতেই করতে পারতাম না। আঃ, সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন বলে যদি ভাবতে পারতাম!

কিন্তু হায়, কেমন ক'রে ভাবব? বৃষ্টির ঠাণ্ডা ফোঁটা গায়ে এসে পড়ছে, একটি মেয়ের বুক সজোরে চেপে রয়েছে আমার বুকে, মুখের ওপর তার গরম নিঃশ্বাস…ভড্‌কার মৃদু গন্ধ…কী প্রাণমাতানো ; বাতাসের গর্জন, বৃষ্টির ঝম্‌ঝমানি, ঢেউএর আছড়ে পড়া শব্দ আর পরস্পরকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেও শীতে কাঁপছি আমরা! এ সবই নিদারুণভাবে বাস্তব। তবু আমি ঠিক জানি, এই বাস্তবকে ভয়ংকর দুঃস্বপ্নেও কেউ কোনদিন কল্পনা করেনি।

নাটাশা কথা বলে চলল মমতা আর দরদ দিয়ে ; এমন মমতা আর দরদ মেয়েরাই শুধু দেখাতে পারে। তার সেই সরল আন্তরিক কথার গুণে মনের কোথায় যেন একটু আগুন জলে উঠল ; মনের অনেক কিছুই গলে গেল সে-আগুনে।

চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল। সেই রাত্রির অনেক আগে থেকে মনের মধ্যে যত কিছু পাপ, মূঢ়তা, অস্থিরতা আর নোংরামি জমে উঠেছিল, সমস্ত ধুয়ে মুছে গেল সেই চোখের জলে।

নাটাশা আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগল।

'এই যে, লক্ষ্মীটি, চুপ…চুপ ; কাঁদে না। ঈশ্বরের করুণায় ঠিক হ'য়ে যাবে সব…আবার একটা চাকরি জুটে যাবে।'

অজস্র উষ্ণ চুম্বনে ভরে দিল আমায়।

নারীর চুম্বন—জীবনে সেই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ চুম্বন! পরে যা পেয়েছি তার জন্য নিদারুণ মূল্য দিতে হয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে মেলেনি কিছুই।

'কাছে এস ! চুপ…চুপ…বোকা ! কাল যদি যাবার জায়গা না থাকে, আমি দেখব তখন !…'

অস্ফুট কোমল মিনতি কানে এল, মনে হ'ল স্বপ্ন !

ভোর পর্যন্ত পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকলাম আমরা।

সকাল হ'লে নৌকো থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে শহরে চলে এলাম। বিদায় নিলাম বন্ধুর মত। তারপর কোনদিনও আর দেখা হয়নি তার সাথে।

পরে নোংরা অলিতে গলিতে ছ মাস ধরে প্রিয় নাটাশাকে খুঁজে বেড়িয়েছি, যার সাথে সেই শরতের রাত্রি কাটিয়েছিলাম আমি।

যদি তার মৃত্যু হ'য়ে থাকে, সব চাইতে তাই-ই ভাল তার পক্ষে, তার আত্মা যেন শান্তি পায় তাহ'লে। আর যদি আজও সে বেঁচে থাকে, যেন সুখে থাকে ; তার পদস্খলনের কথা কোনদিনও যেন মনে না জাগে। অযথা কষ্টই সার হয় তাতে, কোন লাভ হয় না জীবনে।

[অনুবাদ : নীহার দাশগুপ্ত

নবজাতক

১৮৯২ সাল, দুর্ভিক্ষের বছর; সুখুম ও ওকেমক্রির ভেতরে কোন এক জায়গায় কোডর নদীর তীরে ঘটনাটা ঘটেছিল; সমুদ্রের এত কাছে জায়গাটা যে, সেই পাহাড়ী নদীর স্বচ্ছ জলের কল-কল্লোলের ভেতরে সাগরের চাপা গর্জন শোনা যেত স্পষ্ট।

শরতের একটি দিন। চেরী গাছের হলদে পাতাগুলো কোডরের শাদা ফেনায় ঘুরপাক খেয়ে চকচক করছে, যেন ছোট ছোট চঞ্চল স্যামন মাছ। তীরের কাছেই কোন একটা টিলার ওপর বসে ভাবছিলাম যে গাংচিল আর করমোরেন্ট পাখীরাও পাতাগুলোকে মাছ বলে মনে করেছে নিশ্চয়, তাই ডান দিকে গাছগুলোর পেছনে সাগর গর্জন ক'রে চলেছে যেখানে, ঠিক তার ওপরে শূন্যে এত তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে তাদের চিৎকার। বাদাম গাছের সর্বাঙ্গ সোনায় মুড়ে দেয়া হয়েছে যেন; পায়ের কাছে গাছের পাতা স্তূপ হ'য়ে পড়ে আছে, মনে হচ্ছে মানুষের হাতের পাতা কেটে কেটে ফেলে দিয়েছে কেউ। নদীর ওপারে হর্নবিমের শূন্য শাখাগুলি ছেঁড়া জালের মত শূন্যে দুলছে, একটা লাল আর হলুদরঙা পাহাড়ী কাঠ-ঠোকরা লাফালাফি করছে, তার কালো ঠোঁটে গাছের ছাল, ঐ ছেঁড়া জালে আটকে পড়েছে যেন, তাড়া খাওয়া পোকা-মাকড়গুলোকে দূর দক্ষিণ দেশ থেকে উড়ে-আসা ক্ষুদে টিট্‌মাউস আর ঘুঘু-রঙা নাটহ্যাচ পাখীগুলো ঠোকরাতে লাগল সমানে।

বাঁ-দিকে পাহাড়ের চুড়োয় ধোঁয়াটে, ভারী, জলভরা মেঘ, বিন্দু বিন্দু 'মরাগাছে' আচ্ছাদিত পাহাড়ের সবুজ ঢালুতে ছায়া পড়েছে তাদের। এখানে পুরানো বীচ আর লিণ্ডেন গাছের কোটরে 'উগ্রমধু' পাওয়া যায়—অপরাজেয় রোম-রাজ্য সম্পূর্ণ জয় করেও মহান পম্পিয়াইয়ের সৈন্যদলের পতন ঘটেছিল যার মাতাল-করা মিষ্টি স্বাদে। লরেল আর এ্যাজালিয়া ফুলের রেণু থেকে

মৌমাছিরা আহরণ করে এই মধু, বাউণ্ডুলে ভবঘুরেরা কোটর থেকে এই মধু বের ক'রে নেয় ; ময়দার গুঁড়োয় তৈরি পাতলা চেপ্টা এক রকম পিঠে—লাভাশ বলে লোকে, তার ওপর ছড়িয়ে নিয়ে খায় ওরা।

বাদাম গাছের তলায় বসে আমিও ঠিক তাই করছিলাম। একটা ক্রুদ্ধ মৌমাছি কামড়ে দিয়েছে আমার শরীর, মধুভর্তি কেটলিতে রুটির টুকরো ডুবিয়ে খেতে খেতে শরৎ-আকাশের ক্লান্ত সূর্যের অলস লুকোচুরি খেলা উপভোগ করছিলাম।

ককেশাসে শরৎ···মহর্ষিদের তৈরি বিরাট গির্জার অভ্যন্তরের মত ; এই সব মহর্ষিরা আবার মহাপাপীও বটে। বিবেকের সূক্ষ্ম দংশন থেকে তাদের অতীতকে গোপন করবার জন্য সোনা, মণি, মুক্তার বিরাট এক গির্জা তৈরি করেছিলেন তাঁরা, সমরখন্দ্ ও সেমাখার টার্কমানদের কারুকাজওয়ালা চমৎকার গালিচা ঝুলিয়ে দিতেন পাহাড়ে পাহাড়ে। সারা পৃথিবী লুট ক'রে নিয়ে আসতেন এখানে, সূর্যের কাছে ; যেন বলতে চাইতেন সূর্যকে : 'এ সবই তোমার, তোমার লোকদের কাছ থেকে তোমার জন্যই আনা !'···দেখলাম, দাড়িওয়ালা, পাকাচুলো সব দৈত্যেরা, ছোট ছেলেমেয়েদের মত হাসিখুশিভরা বড় বড় চোখ—পৃথিবীকে সাজিয়ে দেবার জন্য পাহাড়গুলি থেকে নেমে আসছে, দু' হাতে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিচিত্র রঙা মণি মুক্তা, মোটা রুপোর পরতে ঢেকে দিচ্ছে পাহাড়ের চুড়ো, নানান গাছের সমারোহে জীবন্ত হয়ে উঠেছে পাহাড়ের ঢালু—এই পবিত্র মনোরম পৃথিবীর অংশটুকু আশ্চর্য রকম সুন্দর হ'য়ে উঠেছে তাদের হাতে।

এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মানো সৌভাগ্যের কথা ; সুন্দরকে প্রাণভরে উপভোগ করা যায়, স্তব্ধ আনন্দে হৃদয় নেচে ওঠে সুন্দরের সামনে—কী বেদনাদায়ক আর মধুর সে-আনন্দ ! দুঃসময়ও আছে, ঠিক কথা। জ্বলন্ত বিদ্বেষে উপচে পড়ে সারা হৃদয়, দুঃসহ ব্যাথা লোলুপ হ'য়ে শোষণ করে বুকের রক্ত, কিন্তু এ সময় কেটে যায়, থাকে না। এমন কি সূর্য পর্যন্ত ব্যথায় ম্লান হ'য়ে যায়, যখন মানুষের দিকে তাকায় : প্রাণপাত করল সে তাদের জন্য, আর কী জীবে পরিণত হ'ল মানুষ !···

অবশ্য ভাল লোক যে নেই তা নয়, তবে তাদের সংস্কার প্রয়োজন, আরও ভাল হয়, তাদের একেবারে বদলাতে পারা যায় যদি।

হঠাৎ আমার বাঁ পাশে, ঝোপগুলোর ওপর দিয়ে দেখা গেল কতগুলো কালো কালো মাথা নড়ছে, সমুদ্রের গর্জন আর নদীর কল্লোলের মধ্যে মানুষের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দুর্ভিক্ষপীড়িতের দল রাস্তা তৈরির কাজ শেষ ক'রে সুখুম থেকে পায়ে হেঁটে ফিরছে ওকেম্‌ক্রিতে, অন্য কাজের আশায়।

আমি চিনি ওদের: ওরিওল প্রদেশের চাষী ওরা। এক সঙ্গেই কাজ করতাম আমরা, একসঙ্গেই ছাঁটাই হয়েছি আগের দিন; সমুদ্রতীরে সূর্যোদয় দেখবার জন্য তাদের আগেই রাতারাতি রওনা হয়েছি আমি।

তাদের মধ্যে চারজন চাষী আর একটি আসন্নপ্রসবা যুবতী চাষীমেয়ে আমার কাছে বেশী পরিচিত। মেয়েটির উঁচু চোয়াল, পাঁশুটে নীল চোখ দুটি ভয়ে যেন বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে। ঝোপগুলোর ওপরে তার হলদে রুমালে আচ্ছাদিত মুখখানি বাতাসে আন্দোলিত সূর্যমুখী ফুলের কুঁড়ির মত দুলছে। প্রচুর ফল খেয়ে তার স্বামী মরে গিয়েছিল সুখুমে। একই বস্তিতে এই লোকগুলোর সঙ্গে বাস করেছি; খাঁটি রুশীয় প্রথা অনুযায়ী এরা তাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে এত জোরে বক্‌বক্ করত, যে তিন মাইল দূর থেকে তাদের এই দুঃখের বিলাপ শোনা যেত।

দুঃখে কষ্টে একেবারে নিষ্পিষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল লোকগুলো। তাদের এই দুঃখকষ্টই তাদের নিজেদের দেশের বন্ধ্যা, নিঃশেষিত জমি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল এখানে, শরতের বাতাসের শুকনো ঝরা-পাতার মত। সেখানকার সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে তারা একেবারে বিমুগ্ধ, হতচকিত হ'য়ে উঠত, আবার অমানুষিক খাটুনির অত্যাচারে তাদের ক্ষমতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত শুষে নিত। তারা বোকা বোকা করুণ চোখে অসহায়ভাবে মিটমিট ক'রে মাটির দিকে তাকিয়ে করুণ হাসি হেসে পরস্পরকে চুপে চুপে বলত:

'আঃ···কী ফলন্ত মাটি···'

'আপনা থেকেই যেন বেরিয়ে আসে জিনিস!'

'হাঁ, তবে একটু পাথুরে···।'

'এ জমিতে কাজ করা সোজা ব্যাপার হবে না, দেখে নিও…।'

নিজেদের গ্রামের কথা মনে পড়ে তাদের, প্রতি মুঠো ধুলোতে পিতৃ-পুরুষের দেহের রেণু মিশে আছে যেখানে, সেই প্রিয় পরিচিত, নিজেদের মাথার ঘামে সিক্ত সেই জমিকে কি ভোলা যায়!

আরেকটি মেয়ে ছিল তাদের সঙ্গে, বেশ দীর্ঘ, ঋজু, চেপ্টা চেহারা, ভারী চোয়াল, নিকষ কালো ট্যারা চোখে কেমন ভাবলেশহীন চাউনি। সন্ধ্যেবেলা মাথায় হলদে রুমাল-বাঁধা মেয়েটির সঙ্গে বস্তির পেছনে চলে যেত, ভাঙা পাথরের একটা স্তূপের ওপর বসত তারা, হাতের তালুর ওপর গালটা রেখে, মাথাটা একদিকে একটু হেলিয়ে ক্রুদ্ধ জোরালো গলায় গান ধরত:

ঘন সবুজ ছায়ায় ঘেরা এই সমাধির পাশে
চাদরখানা বিছিয়ে নেব বালিয়াড়ির ঘাসে,
প্রিয়তমের প্রতীক্ষাতে রইব বসে একা…
হয়ত' কোন শুভক্ষণে মিলবে তাহার দেখা।

তার সঙ্গিনীটি সাধারণতঃ চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকত তার তলপেটের দিকে, মাথাটা ঝুঁকে থাকত সামনের দিকে, হঠাৎ এক এক সময় সেও গান ধরত, কেমন গা ছেড়ে, কর্কশ, বাজখাঁই, পুরুষালি গলায়:

ওগো প্রিয়তম, ভাগ্যের এই লেখা—
এ জীবনে আর পাবো না তোমার দেখা।

দক্ষিণাঞ্চলের শ্বাসরোধী অন্ধকার রাত্রে এই বিলাপের সুর মনে করিয়ে দিত উত্তরাঞ্চলের কথা, তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তর, তুষারবাত্যার আর্তনাদ আর নেকড়ের দূরাগত গর্জনের কথা।…

তারপর সেই ট্যারা মেয়েটির জ্বর হওয়ায় ত্রিপলের স্ট্রেচারে ক'রে শহরে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তখন এমন ভাবে ঘাড় নেড়ে সে বিলাপ করছিল যে মনে হ'ল সেই গির্জার প্রাঙ্গণ আর বালুকাময় তীরে গান গাইছে সে।…

হলদে মাথাটা হঠাৎ হেঁট হ'য়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার প্রাতরাশ শেষ ক'রে কেটলির মধুগুলো পাতা দিয়ে ঢেকে বোঁচকাটা

বাঁধলাম, তারপর, আগে যারা রওনা হয়েছিল তাদের পেছন পেছন কোন তাড়াহুড়ো না ক'রে শক্ত পথের ওপর লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটা দিলাম।

আমিও একফালি ধূসর সংকীর্ণ পথের ওপর এসে উপস্থিত হলাম। ডাইনে গভীর নীল সমুদ্র। মনে হয়, হাজার অদৃশ্য ছুতোর যেন র‍্যাদা ঘষছে—আর বাতাসে তার শাদা শাদা জঞ্জালগুলো শব্দ ক'রে গড়িয়ে পড়ছে তীরের ওপর··· কোন হৃষ্টপুষ্ট মেয়েমানুষের নিশ্বাসের মত আর্দ্র, উষ্ণ ও সুবাসিত বাতাস। বন্দরমুখী কোন তুর্কী ফেলুকা সুখুমের দিকে চলেছে তরতরিয়ে, পালগুলো ফুলে উঠেছে—সুখুমের এক মাতব্বর ইঞ্জিনিয়ার ঠিক যেমন ক'রে তার থলথলে গাল দুটো ফুলিয়ে চিৎকার করত : 'চোপরাও! চালাকি কোরো না, এখ্‌খুনি জেলে পুরে রাখব।' মানুষকে জেলে পোরায় ভারী আনন্দ ছিল তার। আঃ, এতদিন পোকা-মাকড় তার হাড় পর্যন্ত কুরে খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়!

স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলেছি—বাতাসের ওপর দিয়ে চলেছি যেন। সুখকর চিন্তা আর বিচিত্র সব স্মৃতি ভীড় ক'রে আসছে আস্তে আস্তে। মনের এই চিন্তাগুলো ঠিক যেন সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গ। সমুদ্রের ওপরে তাদের অস্তিত্ব ; আর গভীর গহনে শুধু প্রশান্তি। সমুদ্রের রূপোলী মাছের মত যৌবনের উজ্জ্বল স্বপ্নময় আশা ভেসে বেড়ায় আস্তে আস্তে।

সমুদ্রের দিকে চলে গিয়েছে রাস্তাটা ; এঁকেবেঁকে বালির সেই টুকরো চড়াটার একেবারে গা ঘেঁষে গিয়েছে, ঢেউগুলি নিরন্তর আঘাত করছে চড়াটাকে। ঝোপগুলিও ঢেউগুলির মুখ উঁকি মেরে দেখতে চায় ; সেই এক ফালি রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়ে সুন্দর প্রসারিত জলাভূমিকে অভিনন্দন জানায় যেন।

পাহাড় থেকে বাতাস বইতে শুরু করেছে···বৃষ্টি হবে।

ঝোপগুলোর মধ্যে একটা চাপা আর্তনাদ—যন্ত্রণাকাতর মানুষের কাতরানি, যা সব সময়েই মনকে নাড়া দেয় সমবেদনায়।

ঝোপের ভেতর দিয়ে পথ ক'রে এগিয়ে দেখলাম সেই হলদে রুমাল-বাঁধা চাষী মেয়েটিকে। শুপারী গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে, মাথাটি ঘাড়ের ওপর কাত হ'য়ে বিশ্রাম করছে, নিশ্বাস নিচ্ছে কুৎসিতভাবে হা ক'রে ;

তার বিস্ফারিত চোখে কেমন আতঙ্কভরা দৃষ্টি। প্রকাণ্ড তলপেটটা দু হাতে চেপে ধরে এমন অস্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিচ্ছে যে তলপেটটা খিঁচুনি দিয়ে ওঠানামা করছে বারেবারে, নেকড়ের মত হলদে দাঁতগুলো বের ক'রে গরুর মত চাপা আওয়াজ করছে।

'কেউ কি মেরেছে তোমায়?' তার ওপর ঝুকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি। ধূলোর ওপরে মাছির পায়ের মত খালি পা দুটো ঘষতে ঘষতে ভারী মাথাটা নাড়িয়ে কোনমতে বলল সে:

'ভাগো এখান থেকে…নির্লজ্জ… ভাগো বলছি…'

সবই বুঝলাম। আগেও একরকম ঘটতে দেখেছি। অবশ্য, আমি ভয় পেয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে গেলাম। দীর্ঘ, একটানা আর্তনাদ ক'রে উঠল মেয়েটি। চোখ দুটো ফেটে পড়বে যেন, লাল কোঁচকান মুখের ওপর দিয়ে বেয়ে পড়তে লাগল যন্ত্রণার অশ্রু।

তার কাছে ফিরে গেলাম আবার। মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আমার বোঁচকা, চায়ের পাত্র, আর কেটলিটা। তাকে চিৎ ক'রে শুইয়ে দিয়ে হাঁটুটা ভাজ ক'রে দেবার চেষ্টা করলাম। ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বুকে মুখে আঘাত করল আমায়, গালাগাল দিতে লাগল, তারপর ঘুরে, ভালুকের মত গজরাতে গজরাতে হাতে পায়ে ভর দিয়ে গুড়ি মেরে ঝোপের মধ্যে চলে গেল। বলল::

'দস্যু!…শয়তান কোথাকার!…'

মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেয়েটি, হাত দুটো শরীরের নিচে। পা দুটো ছড়িয়ে দিতে দিতে আবার খিঁচুনি দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল।

কেমন এক উত্তেজনায় যা জানি সব মনে করবার চেষ্টা করলাম। মেয়েটির শরীরটা ঘুরিয়ে চিৎ ক'রে শুইয়ে দিয়ে পা দুটো ভেঙে দিলাম।

'চুপ ক'রে শুয়ে থাক,' বললাম তাকে: 'শিগ্‌গিরই প্রসব হবে তোমার!'

সমুদ্রের তীরে দৌড়ে গিয়ে আস্তিন গুটিয়ে হাত দুটো ধুয়ে নিলাম, দাইয়ের কাজ শুরু ক'রে দিলাম ফিরে এসে।

আগুন-লাগা গাছের বাকলের মত কুঁকড়ে উঠতে লাগল মেয়েটি; এদিক ওদিক হাত দুটো ছুঁড়ে মুঠোয় শুকনো ঘাস নিয়ে মুখের ভেতর

পুরে দিতে গেল। মাটি ছিটতে লাগল তার সেই ভীতিপ্রদ কুঁচকানো মুখে; হিংস্র চোখ দুটোয় রক্ত ঠিকরে পড়ছে যেন। শিশুর মাথাটা দেখা যাচ্ছে। পা ছুঁড়তে না পারে যাতে সেই জন্য পা দুটো চেপে ধরে শিশুটির বেরিয়ে আসবার জন্য সহায়তা করতে লাগলাম, নজর রাখলাম তার বিকৃত গোঙানো মুখে যাতে ঘাস না পুরতে পারে।...

পরস্পরকে গালিগালাজ করলাম আমরা একটু; সে দাঁতের ফাঁক দিয়ে, আর আমি চাপা গলায় নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে; যন্ত্রণায়—হয়ত বা লজ্জায় গালাগাল দিল সে, আর আমি গালাগাল দিলাম তার যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে অসহিষ্ণুতা বোধ করছিলাম বলে।...

'ভগবান—!' কেমন ঘড় ঘড় শব্দ ক'রে বারবার উচ্চারণ করল। নীল ঠোঁট দুটো কাঁমড়ে ধরেছে, গাজলা উঠেছে; চোখ দুটো দেখে মনে হয় হঠাৎ যেন সূর্যের কিরণে ম্লান হ'য়ে গিয়েছে, জল ঝরছে সে-চোখ দিয়ে—মাতৃত্বের অসহনীয় বেদনার অঝোর ধারা। কুঁকড়ে ভেঙে দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে যাচ্ছে তার দেহ।

'যাও, দূর হয়ে যাও শয়তান···!' বলে উঠল সে।

দুর্বল বিক্ষিপ্ত হাতে ঠেলতে লাগল আমায়, আর আমিও জোরে বলতে লাগলাম বারে বারে: 'শেষ কর বোকা মেয়ে, শেষ কর তাড়াতাড়ি।'

তার প্রতি মমতায় সমস্ত অন্তর ব্যাথিত হ'য়ে উঠল আমার; তার চোখের জল যেন আমার চোখে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল হৃদয়। চিৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে হ'ল, চিৎকার করলামও: 'শিগ্‌গির, শিগ্‌গির!'

অবশেষে দুই হাতে তুলে ধরলাম একটি মানুষকে। চোখের জলের ভেতর দিয়ে দেখলাম, একটি রক্তপিণ্ড, ইতিমধ্যেই এই পৃথিবীর ওপর বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে সে। হাত পা ছুঁড়ে রীতিমত যুদ্ধ লাগিয়ে দিল, গাঁ গাঁ ক'রে উঠল, তখনও কিন্তু তার মায়ের দেহের সঙ্গে সে সংযুক্ত। নীল দুটি চোখ, লাল কোঁচকান মুখে কেমন অদ্ভুত থ্যাবড়া নাক, ঠোঁট দুটো নড়ছে, চিৎকার ক'রে উঠছে: 'ওঁয়া···ওঁয়া···।' শরীরটা এমন পিছল যে খুব সতর্ক না থাকলে হাত থেকে পড়ে যেত পিছলে! হাঁটু গেড়ে বসে তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি—ভারী আনন্দ হ'ল, ভুলে গেলাম, আর কি করতে হবে আমায়।

'নাড়ীটা কেটে ফেল···' আস্তে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল :মা। চোখ দুটি বোজা, ক্লান্তি কেটে গেছে মুখ থেকে। কেমন মেটে রং, মনে হ'ল মৃত, নীল ঠোঁট দুটি নাড়ল অনেক কষ্টে : 'কেটে ফেল···একটা ছুড়ি দিয়ে···'

কিন্তু আমার ছুরিটা চুরি হয়ে গিয়েছে। দাঁত দিয়েই নাড়ীটা কেটে ফেললাম। গাঁ গাঁ ক'রে উঠল শিশুটি, মায়ের মুখে হাসি খেলে গেল ; অতল চোখে এক অপূর্ব সৌন্দর্য বিকশিত হ'য়ে উঠল, নীলাভ আগুন জ্বলে উঠল যেন। কালো হাত দিয়ে তার পোষাক হাতড়ে পকেট খুঁজতে লাগল, অনেক কষ্টে কথা ফুটল তার রক্তাক্ত চেপে ধরা ঠোঁটে : 'আমার শক্তি নেই···পকেটে··· ফিতে···নাভিটা···বাঁধ।'

ফিতেটা নিয়ে বেঁধে দিলাম নাভিটা। আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠল তার মুখের হাসি, এত চমৎকার, মনোরম সে-হাসি যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম একেবারে।

'এবার ঠিকঠাক ক'রে নাও নিজেকে, বাচ্চাটাকে পরিষ্কার ক'রে আনি···' বললাম আমি।

'শোন,' কেমন অসহিষ্ণুভাবে ককিয়ে বলল : 'একটু আস্তে যেয়ো···'

এই লাল লোকটাকে আবার যত্ন! মোটেও না! ঘুষি বাগিয়ে এমন ভাবে চিৎকার করছে যেন যুদ্ধ করতে চাইছে আমার সঙ্গে : 'ওঁয়া···ওঁয়া···'

'উঁ উঁ! নিজেকে বেশ শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত কোরো হে, নইলে স্বজাতিরাই ঘাড় মুচড়ে ভেঙে দেবে···'

আমাদের গায়ে এসে সানন্দে ধাক্কা দিচ্ছে ফেনিল তরঙ্গ ; সেই তরঙ্গে সর্বপ্রথম তার গা ভিজতেই বেশ জোরে প্রাণপণে চিৎকার ক'রে উঠল সে। তার বুক পিঠ ধুইয়ে দিতেই চোখ কুঁচকে, সাংঘাতিক হাত পা ছুঁড়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার ক'রে উঠল, আর তার গা ভিজিয়ে চলল ঢেউগুলি।

'চেঁচাও! যত জোর আছে ফুসফুসে চেঁচাও···!'

তার মায়ের কাছে যখন নিয়ে গেলাম তাকে, ঠোঁট দুটো চেপে, চোখ বুঁজে পড়ে আছে তার মা। যন্ত্রণা হচ্ছে—প্রসবের পরের যন্ত্রণা। তা সত্ত্বেও তাঁর নিঃশ্বাস আর কাতরানির ভেতর অস্ফুট ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনতে পেলাম : 'দাও···আমার কাছে দাও···!'

'থাকুক না!'

'না, দাও এখানে।'

দুর্বল কম্পিত হাতে ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলল, তার স্তন উন্মুক্ত করায় সাহায্য করলাম আমি—অন্তত কুড়িটি শিশুর জন্য প্রকৃতির তৈরি খাদ্য তার বুকে! তার গরম দেহের ওপরে কাঁদুনেটাকে রাখলাম। তৎক্ষণাৎ অবস্থাটা বুঝেই সে চুপ হ'য়ে গেল।

'হে মেরী মাতা!' কাঁপতে কাঁপতে বারে বারে উচ্চারণ করল মেয়েটি। আমার বোঁচকার ওপরে এদিক ওদিক গড়াগড়ি দিতে লাগল তার আলুথালু মাথাটা।

হঠাৎ একটু মৃদু চিৎকার করেই চুপ ক'রে গেল সে। তারপর, তার সেই অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটি মেলল—জননীর পবিত্র চোখ। নীল আকাশের দিকে তাকাল সেই নীল চোখে, আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় ভরা হাসি জ্বলে উঠে মিলিয়ে গেল সে-চোখে। তার নিজের দেহে আর শিশুটির দেহে ভারী হাতটা তুলে ক্রশ চিহ্ন আঁকল আস্তে আস্তে।...

'হে মেরী মাতা, জয় হোক তোমার, জয় হোক...' বারে বারে উচ্চারণ করল।

তার চোখ দুটো ক্লান্ত, বসে গিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ রইল সে, ক্ষীণ নিশ্বাস পড়ছে। রুক্ষ, দৃঢ় স্বরে বলে উঠল হঠাৎ: 'আমার বোঁচকাটা খুলে দাওতো, বাবা।'

খুলে দিলাম। মনোযোগ দিয়ে দেখল আমায়, ক্ষীণ হাসি হাসল; কুঁচকে ওঠা গাল আর ভেজা কপালটা চিকচিক ক'রে উঠল একটু।

'কিছু মনে কোরো না...এখান থেকে একটু যাও তুমি...'

'বেশী কিছু কোরো না তুমি...'

'আচ্ছা...আচ্ছা...'

ঝোপের মধ্যে চলে গেলাম। মনের মধ্যে পাখীদের কলকাকলী আর তার সঙ্গে নদীর কলরোল—এত চমৎকার লাগছিল। মনে হচ্ছিল সারা বছর ধরে এ সংগীত আমি শুনতে পারি।...

কাছেই নদীর কল্লোলধ্বনি : যেন কোন তরুণী তার প্রেমিকের কথা বলছে বান্ধবীকে…

পরক্ষণেই ঝোপের ওপরে মেয়েটির মাথাটি দেখা গেল, হলদে রুমাল-খানা যথারীতি বাঁধা।

'আঃ, তুমি নাকি?' জোরে বলে উঠলাম : 'বড্ড তাড়াতাড়ি নড়াচড়া আরম্ভ করেছ।'

গাছের একটা ডাল ধরে পাথরের মূর্তির মত বসে আছে সে; পাণ্ডুর মুখ, চোখ তো নয়, মস্ত বড় দুটি নীল হ্রদ; কেমন আবেগ মাখানো চাপা গলায় বললে : 'দেখ—কি রকম ঘুমুচ্ছে…'

অকাতরে ঘুমুচ্ছে; আমার যতদূর বিচার-ক্ষমতা তাতে তো অন্য শিশুর চাইতে কোন তফাৎ দেখতে পেলাম না; আর যদি কোন তফাৎ থেকেও থাকে, তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যই। শরতের চক্‌চকে পাতার স্তূপের ওপর, একটা ঝোপের নিচে শুয়ে আছে সে, ওরিয়ল প্রদেশে এ রকম ঝোপ জন্মায় না।

'তুমি বরঞ্চ এবার শুয়ে পড় মা…' পরামর্শ দিলাম তাকে।

'না!' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সে, ঘাড়ের সঙ্গে আলগাভাবে কোন মতে লেগে রয়েছে যেন মাথাটা : 'আমি এবার গুছিয়ে গাছিয়ে রওনা দেব ওদিকে, ওই… কি বলে জায়গাটার নাম?'

'ওকেম্‌ক্রি?'

'হাঁ, হাঁ। অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে আমার লোকেরা…'

'কিন্তু হাঁটতে পারবে কি তুমি?'

'মেরী মাতা আছেন তো! তিনিই সাহায্য করবেন…'

'তা ঠিক!'

মেরী মাতা যদি সাহায্য করেন তাকে, কি আর বলার আছে আমার!

ঝোপের নিচে সেই ঠোঁট ফোলানো ছোট্ট মুখখানির দিকে তাকিয়ে রইল সে, সোহাগভরা স্নেহের কিরণ ঢেলে দিচ্ছে চোখ থেকে। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো চেটে স্তনের ওপর হাতটা বুলোলো আস্তে আস্তে। আগুন ধরালাম আমি, কয়েকটা পাথর রেখে চায়ের কেটলিটা বসিয়ে দিলাম তার ওপর।

'দাঁড়াও, তোমায় চা তৈরি ক'রে দিচ্ছি মা।'

'দাও···খুব ভাল হয়···গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে একেবারে।'

'তোমার লোকজনের খবর কি? তোমায় পেছনে ফেলে গেল নাকি তারা?'

'না, না। আমিই একটু পিছিয়ে গিয়েছিলাম। মাতাল হ'য়ে ছিল ওরা, আর···এই-ই ভাল হয়েছে, এই রকম···ওরা সবাই ঘিরে থাকলে কি বিচ্ছিরি ব্যাপার হ'ত!'

আমার দিকে তাকিয়ে কনুয়ের মধ্য মুখটা লুকিয়ে ফেলল। রক্তমাখা থুথু ফেলল তারপর, মুখে সলজ্জ হাসি।

'এই কি প্রথম?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'এই-ই প্রথম···কিন্তু তুমি কে?'

'মানুষ! এই···'

'মানুষ তো নিশ্চয়ই! বিয়ে করেছ?'

'না, সে সৌভাগ্য হয়নি···।'

'মিছে কথা বলছ।'

'মানে?'

চোখ দুটো নামিয়ে কি যেন ভাবল একটু, তারপর বলল: 'এ সব ব্যাপার তুমি জানলে কি ক'রে?'

এবার মিথ্যে বলাই ঠিক করলাম, বললাম: 'পড়াশুনো করেছি এ নিয়ে। ছাত্র আমি, বুঝলে?'

'ঠিক, তা বটে। আমাদের পাদ্রীর বড় ছেলেটাও ছাত্র। পাদ্রী হবার জন্য সে পড়াশুনা করে···।'

'হাঁ, আমিও সেই রকম। দাঁড়াও, জল আনি একটু···।'

মেয়েটি শিশুটির দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনল কিছুক্ষণ, তারপর চোখ তুলে তাকাল সমুদ্রের দিকে।

'হাত-পা ধুয়ে একটু পরিষ্কার হতে চাই আমি,' বলল সে: 'কিন্তু এই বিচ্ছিরি জল···কি রকম জল? নোনা আর কটু···'

'এই জলেই হাত মুখ ধোও, ভালই হবে তোমার পক্ষে।'

'সত্যি ?'

'নিশ্চয়ই। নদীর জলের চাইতে গরম। এখানকার নদীর জল তো বরফ…।'

'তুমিই ভাল জান…'

আস্তে আস্তে ঘোড়ায় চড়ে একজন আবখাসিয়ান্ এল, তন্দ্রার ঘোরে ঢুলে ঢুলে পড়ছে মাথাটা। তার ক্ষুদে যোয়ান ঘোড়াটা, তার কালো গোল গোল চোখের কোণ দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল, খাড়া হ'য়ে উঠল কান দুটো, ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে উঠল ঘোড়াটা, ঘোড়সওয়ার হঠাৎ সতর্ক হ'য়ে লোমওয়ালা ফারের টুপি পরা মাথাটা তুলে তাকাল আমাদের দিকে, তারপর আবার নুয়ে পড়ল মাথাটা।

'কী অদ্ভুত লোকগুলো, এমন ভয় পাইয়ে দেয়—' আস্তে আস্তে বলল মেয়েটি।

সরে গেলাম আমি। পাথরের ওপর দিকে বয়ে চলেছে পারার মত জীবন্ত স্বচ্ছ জলের ধারা, শরতের ঝরে-পরা পাতাগুলো আনন্দে ঘুরপাক খাচ্ছে তার ভেতর। ভারী চমৎকার। হাত-মুখ ধুয়ে চায়ের কেটলিটা ভরে নিয়ে ফিরে এলাম। ঝোপের ভেতর দিয়ে নজরে পড়ল হামাগুড়ি দিচ্ছে মেয়েলোকটি, চারদিকে কেমন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

'ব্যাপার কি ?' চিৎকার ক'রে উঠলাম।

ভয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে কি যেন একটা লুকোতে গেল সে জামার নিচে। বুঝতে পারলাম কি জিনিস।

'দাও আমার কাছে দাও, আমি পুঁতে দেব এক জায়গায়।' বললাম আমি।

'এ মা! তুমি করবে কেমন ক'রে? কোন স্নানের ঘরের দরজার মেঝের নিচে পুঁততে হবে…'

'কতদিনে এখানে স্নানের ঘর তৈরি হবে বলে তোমার মনে হয় ?'

'তোমার কাছে ঠাট্টা হতে পারে, কিন্তু আমি যে ভয়ে মরি! ধর যদি কোন জানোয়ার খেয়ে ফেলে এটা!…মাটিকে তো এটা ফিরিয়ে দিতে হবে, তুমি জানো…'

একপাশে সরে গেল সে, তারপর আমার হাতে একটা ভেজা ভারী পুঁটুলি দিয়ে চাপা গলায় লজ্জারক্ত মুখে অনুনয় করল : 'ভাল ক'রে পুতে দিও, যতটা গর্ত ক'রে পারো···আমার এই ছোট্টো বাচ্চাটার ওপর করুণা ক'রে অন্তত ভাল ক'রে পুঁতে দিও।'

• ঘুরে এসে দেখলাম সমুদ্রের তীর থেকে ফিরছে সে। পা টলছে, সম্মুখ দিকে একটা হাত প্রসারিত ; পরনের পোষাক কোমর পর্যন্ত ভিজে, অন্তরের কি এক জ্যোতিতে যেন সমস্ত মুখ তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সাহায্য করলাম তাকে আগুনের কাছ পর্যন্ত হেঁটে যেতে, মনে মনে ভাবলাম, কী পশুর মত শক্তি! মধু দিয়ে চা খেলাম আমরা। তারপর আমায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল : 'লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছ ?'

'হাঁ—'

'সব মদ খেয়ে উড়িয়েছ বুঝি!'

'হাঁ মা। একেবারে শেষ কণাটুকু পর্যন্ত।'

'ওই রকম তুমি! মনে আছে আমার—সুখুমে একবার লক্ষ্য করেছিলাম, খাবার নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক জুড়ে দিয়েছিলে তুমি ; তখনই ভেবেছিলাম মনে মনে, কোন কিছুতে ভয় পায় না নিশ্চয়ই মাতাল লোকটা!' পরম আগ্রহে ফোলা ঠোঁট থেকে মধুগুলো চেটে চেটে খেতে লাগল সে, ঝোপের দিকে নজর রাখলো যেখানে ওরিয়লের সর্বকনিষ্ঠ অধিবাসী গভীর ঘুমে মগ্ন।

'কী যে হবে ওর জীবন, আশ্চর্য হয়ে ভাবি তাই।' একটা নিশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললে : 'আমায় সাহায্য করেছ তুমি, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমায় ···কিন্তু ওর জীবন কি সুখের হবে ? জানি না···'

চা আর খাবার শেষ ক'রে ক্রশ চিহ্ন আঁকল। আমি আমার জিনিসপত্র-গুলো গোছাতে লাগলাম, আর সে নিষ্প্রভ চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, কি যেন ভাবতে লাগল তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে মাথাটা নাড়িয়ে।

'সত্যিই হাঁটবে নাকি তুমি ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'হাঁ।'

'শোন। মেরী মাতাই তো আছেন। দাও, ওকে আমার কোলে দাও।'

'না, না। আমিই নিচ্ছি ওকে।'

একটু কথা কাটাকাটির পর রাজী হ'ল সে; হাঁটতে লাগলাম আমরা পাশাপাশি।

'পড়ে যাব না আশা করি।' অপরাধীর মত একটু হেসে বললে সে; আমার কাঁধের ওপর তার হাতটা রাখলে।

আর রুশদেশের এই অজ্ঞাত-ভবিষ্যৎ নতুন অধিবাসী আমার দুই হাতের মধ্যে শুয়ে বেশ জাঁদরেল নাগরিকের মত শব্দ ক'রে ক'রে নিশ্বাস নিচ্ছে। শাদা ফেনায় ভূষিত সমুদ্র আছড়ে পড়ছে হিস্ হিস্ শব্দে; ঝোপগুলো কানাকানি করছে যেন। মাথার ওপরে দীপ্ত সূর্য ইতিমধ্যেই পশ্চিমে ঢলে পড়েছে একটু।

আস্তে আস্তে হাঁটছি আমরা। মাঝে মাঝে একটু থেমে গভীর নিশ্বাস নিচ্ছে মা, মাথা তুলে সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল, সমস্ত কিছুর দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বেদনার ধারায় ধুয়ে গিয়ে মনোরম স্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে চোখ দুটো, অনির্বাণ ভালবাসার নীলাভ আগুনে প্রস্ফুটিত হ'য়ে জ্বলছে আবার।

একবার থেমে বললে: 'প্রভু! চারদিকে ছড়ানো অপার করুণা তোমার! এই তো হাঁটছি আমি, পৃথিবীর আর এক প্রান্তে হেঁটে যেতে পারি এমনি ক'রে; আর আমার বাচ্চা এই প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হ'য়ে উঠবে তার মায়ের বুকের কাছে, সোনা মানিক আমার···'

···সমুদ্র গর্জিয়ে চলেছে সমানে···

[অনুবাদ: নীহার দাশগুপ্ত

মাকার চুদ্রা

একটা হিমেল স্যাঁতসেঁতে হাওয়া বইছে সমুদ্রের দিক থেকে…

সমুদ্র-সৈকতে আছড়ে-পড়া লহরীর বিষণ্ণ সিন্ধু-রাগ ও বেলাভূমির লতা-গুল্মের মর্মর ধ্বনি সেই হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে আসছে প্রান্তরের উপর দিয়ে। মাঝে মাঝে দমকা ঝাপটায় উড়ে আসে শুকনো পাতা, ঘুর পাক খেতে খেতে সেগুলো এসে পড়ে তাঁবুর সামনের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায়…চারপাশের শারদীয়া রাত্রির বিষণ্ণতা কাঁপতে কাঁপতে শঙ্কিত পদবিক্ষেপে সরে যায় আর মুহূর্তের জন্যে সুদূর প্রসারী উন্মুক্ত প্রান্তর ভেসে ওঠে আমার বাম পার্শ্বে, দক্ষিণে দেখা যায় সীমাহীন মহাসমুদ্র এবং আমারই সামনে দেখি দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ বেদে মাকার চুদ্রা। বেদে-তাঁবুর ঘোড়াগুলোকে সে পর্যবেক্ষণ করছে। আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে অবস্থিত তার বেদে-তাঁবু।

তামাক ভর্তি পাইপ থেকে মুখ ও নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমার মাথার উপর দিয়ে বৃদ্ধ বেদে তাকিয়ে রইল দিগন্ত বিসারী প্রান্তরের নিথর নিস্তব্ধ ঘনান্ধকারের দিকে। গায়ের ককেশীয় কোটটা সরিয়ে দিয়ে বৃদ্ধের লোমভর্তি বুকের ওপর নিষ্ঠুরভাবে আছড়ে পড়ছে দমকা হাওয়া। নির্বিকার বৃদ্ধ দৃপ্তভঙ্গীতে বসে বসে অনর্গল বকে চলেছে। একটু নড়ে চড়ে ব'সে নিজেকে সেই হিমেল হাওয়া থেকে বাঁচাবার সামান্যতম চেষ্টাও সে করে না। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে :

'হুঁ, তাহ'লে তুইও যাযাবর? বেশ, বেশ! ঠিক পথই বেছে নিয়েছিস। এটাই তো ভাল : চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখ…তারপর যখন সব দেখা হ'য়ে যাবে, তখন সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে মরে যা—বাস, সব চুকে বুকে গেল!'

'এই তো সব'—কথাটাতে মৃদু একটু আপত্তি জানাতেই বুড়ো ক্ষেপে

ওঠে। শ্লেষের সঙ্গে বলে : 'কি বল্‌লি? জীবন? অন্য সব মানুষজন? হুঁ, কিন্তু তাতে তোর কি এসে যায়, শুনি? তোর নিজের জীবনও তো একটা জীবন! ঠিক নয়? অন্য সব লোকজন তো তোকে ছাড়াই দিব্বি বেঁচে আছে, আর তোকে বাদ দিয়ে তারা তাদের দিনও তো কাটিয়ে দেবে। তুই কি মনে করিস্ যে, তোকে কারুর খুব দরকার আছে? মোটেই নয়। তুই তো আর রুটি নোস্, লাঠিও না। তোকে কেউ চাইবে না রে!

'শিখ্‌তে চাস্, শোনাতে চাস? কিন্তু অন্যকে কি ক'রে সুখী করা যায়, তা কি তুই শেখাতে পারবি? না, তা তুই পারবি না। আগে চুলে পাক ধরুক, তারপর তো শোনাবি! তাছাড়া কি শোনাবি তুই? নিজের প্রয়োজনটা সবাই বোঝে। চালাকচতুর যারা তারা দেখে শুনে নিজের প্রয়োজনটুকু বেশ গুছিয়ে নেয়; বোকাগুলো আর তা পারে না। কিন্তু প্রত্যেকটি লোকই নিজের জীবনের মধ্যে দিয়েই শেখে।...

'এই যে জীবগুলো—যাদের তুই মানুষ বলিস্—এরা কিন্তু সব অদ্ভুৎ! সবাই একই জায়গায় জড়ো হ'য়ে গুঁতোগুঁতি করবে, আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের রাস্তায় চলতে গিয়ে অপরের পা মাড়িয়ে দেবে। অথচ,'—হাত দিয়ে দিগন্ত বিসারী প্রান্তরের দিকে দেখিয়ে সে বলে : 'আমাদের এই দুনিয়াটা কি বিরাট, কত জায়গা এখানে খালি পড়ে রয়েছে। আর এই লোকগুলো অহরহ খেটেই চলেছে। কিন্তু কেন? কার জন্যে? কেউই তা জানে না। একটা লোক জমিতে চাষ করছে। তাকে দেখে তুই হয়ত' ভাববি, আহা, লোকটা তার সমস্ত শক্তি ফোঁটা ফোঁটা ক'রে ঐ জমিটাতে ঢেলে দিচ্ছে। তারপর একদিন দেখবি যে সে ঐ জমিতেই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে, আস্তে আস্তে পচে গলে কোথায় মিশে গেছে! কিছুই তার থাকবে না। যে জমিটুকুর জন্য সে সারাজীবন শুধু খেটেই গেল, তাও তাকে কিছুই দেবে না। জন্মের সময় সে যা ছিল, মরবার সময়ও সে ঠিক তাই রয়ে গেল—মস্ত একটা বোকা!

'তুই কি মনে করিস্ যে সারাজীবন মাটি চষে অথচ নিজের কবর না খুঁড়ে মরবার জন্যেই সে জন্মেছিল? মুক্তির স্বাদ যে কি তা সে কোনও দিন জেনেছিল? আমাদের এই বিরাট প্রান্তরের প্রাণৈশ্বর্য সে কি কখনও অনুভব

করেছিল? প্রান্তরের এই বিচিত্র সুরের ঝঙ্কারে সাড়া দিয়ে তার হৃদয় কি কখনও আনন্দে গেয়ে উঠত? গোলাম, জন্মাবধি সে গোলাম, সারাজীবন সে সেই গোলামই রয়ে গেল। ব্যস্, এই তো তার জীবনের সব! নিজের জন্য সে কি করতে পারত? তার ঘটে যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকত, তাহ'লে সবথেকে আগে সে দিত গলায় দড়ি।

'আচ্ছা, আমার কথা ধর। আমার এই আটান্ন বছর বয়সের মধ্যে আমি কত কিছু দেখেছি…। তুই যদি কাগজ নিয়ে লিখতে বসিস, তাহ'লে তোর ঐ পুঁটুলিটার মতো হাজারটা পুঁটুলি শুধু সেই লেখা কাগজেই ভরে উঠবে। কোথায় আমি না গিয়েছি? তেমন জায়গা তো আমার আর চোখে পড়ে না। যে সব জায়গায় আমি ঘুরেছি, সে-সম্বন্ধে তোর কোনও ধারণাই নেই। একেই বলে বেঁচে থাকা—দুনিয়াকে চষে বেড়ানো! ব্যস্, সেই তো জীবন! কোনও জায়গাতেই খুব বেশীদিন আট্‌কে থাকা নয়…বেশীদিন আট্‌কে থাকবার মতো তেমন জায়গাই বা কোথায়…। এই দুনিয়াটাকে ঘিরে দিন আর রাত্রি যেমন পরস্পরকে অনবরত তাড়া ক'রে চলেছে, জীবনের ভাবনা চিন্তা থেকে তোরও নিজেকে তেমনই তাড়া ক'রতে হবে। তা না করলে, জীবনটাই ভয়ানক বিরক্তিকর একঘেয়ে হয়ে ওঠে। ভেবে চিন্তে কিছু একটা ঠিক করবার জন্যে যখনই তুই থিতুবি, তখনই সুরু হ'য়ে যাবে তোর খারাপ লাগা। ওটা এই ভাবেই সুরু হয়। আমারও তাই হয়েছিল, হ্যাঁ, একবার ঐরকম একটা অবস্থায় পড়ে আমারও এই জীবনটার ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।…

'গ্যালিসিয়ার জেলে আমি তখন কয়েদ খাটছি। হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তার পোকা ঢুকল—এই দুনিয়ায় আমি কি জন্যে বেঁচে আছি? কেমন একটা নিদারুণ বিষাদ আমাকে পেয়ে বসল; আর বিশেষ ক'রে জেলখানার মধ্যে এই ভাবনাটা এত জোরালো, এত ভয়ংকর হ'য়ে ওঠে, যে তা আর কি বলব! জানলার গরাদের বাইরে খোলা মাঠের দিকে চাইলে এমন খারাপ লাগত! সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠত। মনে হতো, কেউ যেন শক্ত মুঠোতে আমার হৃদয়টাকে ধরে মুচড়ে নিংড়ে নিচ্ছে। কিসের জন্যে মানুষ বাঁচে?

—কে এর জবাব দেবে ? না বাপু, এর জবাব কেউ জানে না। আর সেই জন্যে নিজেকে জিজ্ঞেস করেও কোন লাভ নেই। বেঁচে থাক, ঘুরে বেড়াও, দেখ—তাহলেই বেঁচে থাকার জন্যে তোমার আর কখনও খারাপ লাগবে না। কয়েদ-বাসের ঐ সময়টায় আমি আর একটু হলেই গলায় দড়ি দিচ্ছিলাম আর কি—গালগল্প নয়, সত্যিই বলছি !

'হ্যাঁ ! একবার একটা লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তোমারই মত একজন রাশিয়ান। বেশ গম্ভীর, চিন্তাশীল ব্যক্তি···। তিনি বলতেন, তোমাকে বাঁচতে হবে ; কিন্তু তুমি যে-ভাবে চাও সে-ভাবে নয়, ভগবান যে-ভাবে চান, সেই ভাবে। ভগবানকে মেনে চল, দেখবে, তুমি যা কিছু চাও, তিনিই সব জুটিয়ে দেবেন। লোকটার নিজেরই কাপড়চোপড়ের অবস্থা একেবারে শতচ্ছিন্ন। আমি তাঁকে বললাম: ভগবানের কাছ থেকে একপ্রস্থ নতুন কাপড় জামা চেয়ে নিন না। শুনে তো তিনি রেগে টং। যা তা গালিগালাজ ক'রে আমার ওপর খেঁকিয়ে উঠলেন। অথচ একটু আগেই তিনি বোঝাচ্ছিলেন যে প্রত্যেকের উচিত অন্যের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করা এবং তাকে ভালোবাসা। অন্যায় কথা যদি আমি কিছু বলেই থাকি, ভদ্রলোকের তো উচিত ছিল আমাকে ক্ষমা করা। এরা হলেন সব শিক্ষিত ! অন্যকে উপদেশ দিয়ে থাকেন ! এরা তোমাকে উপদেশ দেবে কম খেতে ; কিন্তু নিজেরা দশবার পেটপুরে খাবে।'

আগুনের মধ্যে একগাল থুতু ফেলে সে নিঃশব্দে পাইপটাতে আবার তামাক ঠাসতে লাগে। একটা চাপা কান্না যেন বিনিয়ে বিনিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যে থেকে ঘোড়াগুলো মাঝে মাঝে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে উঠছে। আর ওদিকের বেদে-তাঁবু থেকে 'ডুমকা'-র মিষ্টি সুরে নরম আবেশ ভেসে আসছে। মাকার চুদ্রার মেয়ে নোংকা গান গাইছে। মেয়েটি রূপসী। তার ভারী গলার মিষ্টি কণ্ঠস্বর আমি জানতাম। ওর ঐ কণ্ঠস্বরে এমন একটা রহস্য, এমন একটা বিক্ষোভ, এমন একটা মহিমান্বিত তেজ ছিল, যা কিছুতেই ভোলা যায় না—তা সে গানই করুক, আর 'কি ভাল তো !' ব'লে সম্ভাষণ জানাক। একটা উষ্ণ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তার ঈষৎ ঘনবর্ণের মুখটাকে